প্রথম সংস্করণ
৭ই আষাঢ়, ১৩৬১

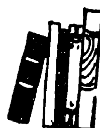
পরিবর্দ্ধিত
২য় সংস্করণ, ২২০০
শ্রাবণ, ১৩৬২

তিন টাকা
চার আনা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
ধীরেন বল

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬



## উৎসর্গ

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ক্রীড়া-সাংবাদিক বন্ধু

শ্রীঅজয় বসু ও শ্রীমুকুল দত্তকে—



## লেখকের কথা

খেলাধুলা শুধু মাত্র মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ধর্ম্মই নয়, মানুষের পক্ষে একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয়।

খেলাধুলার মধ্য দিয়ে যে-কোন মানুষের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সম্ভব বলেই খেলাধুলাকে আজ প্রায় সকল স্বাধীন দেশই শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। পরস্পর বিশ্বাস, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও ভালবাসা শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম পথ, খেলাধুলার উন্নতির জন্যে তাই সকল দেশই আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু আমরা আজও এ-পথে বেশীদূর এগুতে পারিনি।

যে-কোন খেলা শিক্ষার ব্যাপারে সেই বিশেষ খেলার বিবিধ আইন যেমন জানা প্রয়োজন, ঠিক তেমনি সেই খেলার জন্ম ও ক্রমবিকাশের কথা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিভিন্ন তথ্য খেলাধুলার উন্নতি ও আকর্ষণ বৃদ্ধির পক্ষে নিঃসন্দেহে সহায়ক।

ফুটবল, হকি, ক্রিকেট বা কোন একটি বিশেষ খেলা সম্বন্ধে কিছু কিছু বই আমাদের দেশে লিখিত হয়েছে সত্য, কিন্তু ভারতে বিশেষভাবে প্রচলিত বিভিন্ন খেলাগুলির জন্ম ও বিস্তার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যযুক্ত একখানি কোন বিশেষ বই আজও লিখিত হয়নি।

আমি 'খেলাধুলায় জ্ঞানের কথা'তে আমাদের দেশে বিশেষভাবে প্রচলিত খেলাগুলি যথা—ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস, টেবিলটেনিস, ভলিবল, বাস্কেটবল, সাঁতার, বক্সিং, কুস্তি, সাইক্লিং এবং অলিম্পিক প্রভৃতির প্রয়োজনীয় সকল বিষয়গুলিই উল্লেখ করবার চেষ্টা করেছি। উপরোক্ত খেলাগুলি পৃথিবীতে সৃষ্টি থেকে ধীরে ধীরে কি ভাবে উন্নতিলাভ করে বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তার বিবরণ দিয়েছি। খেলাধুলার আন্তর্জাতিক এবং ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ও খ্যাতনামা প্রতিযোগিতাগুলির ইতিহাসও সাধ্যমত দেবার চেষ্টা করেছি। আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে বিভিন্ন খেলাধুলায় ভারতের স্থান কোথায়, সে বিষয়ে জনসাধারণকে সজাগ করবার জন্যে ভারতীয় দলগুলির বিদেশ সফর, আন্তর্জাতিক খেলায় ভারতীয় দলের ফলাফল এবং বিভিন্ন বৈদেশিক দলগুলির ভারত সফরের কথাও সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের দেশে খেলাধুলার বিষয়ে গবেষণা করা যে কত কষ্টসাধ্য তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। প্রামাণিক নথীপত্র অনেক বিষয়ই রক্ষিত হয়নি। এমন কি, অনেক বিষয় আছে যেগুলির বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য বর্ত্তমানের

বিভিন্ন কর্ণধারেরা জানেন না। এ ছাড়াও কোন কোন বিষয়ে নথীপত্রের অভাবে আমাকে বিভিন্ন এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষের মৌখিক বিবৃতির ওপরেও সময়ে সময়ে নির্ভর করতে হয়েছে।

সকল শ্রেণীর পাঠকদের, বিশেষ করে আমাদের দেশের ছাত্রসমাজ—যারা খেলাধুলার ভবিষ্যৎ আশাস্থল, তাদের কাছে সকল বিষয়গুলিকে আকর্ষণীয় করবার জন্যে বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে সহজ ভাষায় সকল বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি।

আমার এ-প্রচেষ্টায় আমি কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছি, সে বিচারের ভার পাঠকসমাজের।

৫।৪।১৯৫৪ **শ্রীখেলোয়াড়**

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'খেলাধুলায় জ্ঞানের কথা' বইটি লেখবার সময়ে আমাকে বিভিন্ন এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষ ও ক্রীড়া-সাংবাদিক বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে হয়েছে। বিভিন্ন এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষ যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন—

ব্যাডমিণ্টন—শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র ( ভারতে ব্যাডমিণ্টন খেলার প্রবর্ত্তক ), টেনিস—শ্রীগণেশ দে ( সাউথ ক্লাবের সম্পাদক ), টেবিলটেনিস—শ্রীমণীশ চ্যাটার্জ্জী ( বাঙ্গালা ও ভারতীয় টেবিলটেনিস ফেডারেশনের প্রাক্তন সম্পাদক ), ভলিবল—শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ( পশ্চিম-বাঙ্গালা ভলিবল ফেডারেশনের সম্পাদক ) ও ডাঃ সন্তোষকুমার ব্যানার্জ্জী ( প্রাক্তন সম্পাদক ), বাস্কেটবল—শ্রীপরিতোষচন্দ্র ব্যানার্জ্জী ( বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশনের যুগ্ম-সম্পাদক ), সাঁতার—ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষ, কুস্তি—গোবরবাবু ও শ্রী বি. বি. রায় ( ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের সম্পাদক ), বক্সিং—শ্রী পি. মিশ্র ( বেঙ্গল এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের সম্পাদক ), সাইক্লিং—শ্রীপরিতোষ বসু।

অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীগোপালদাস মুখার্জ্জী আমাকে বিভিন্ন বই ও নানাবিধ সংবাদ সরবরাহ করে এবং ক্যালকাটা জব প্রিণ্টার্স-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীঅজিত লাহিড়ী অনেক অমূল্য ছবি ও ব্লক দিয়ে সাহায্য করেছেন। যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যেও কয়েকখানি ব্লক এই বই-এ ছাপা হয়েছে।

**লেখক**

## দ্বিতীয় সংস্করণের বক্তব্য

খেলাধুলায় জ্ঞানের কথা বইটি ছাপাতে দেবার পর মনে মনে ভয় ছিল যে জনসাধারণ এ জাতীয় বই গ্রহণ করবে কি না? দীর্ঘদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করলেও সেই পরিশ্রমের স্বার্থকতা কতটুকু হবে এ নিয়ে মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল। আমার প্রকাশক বইটি প্রকাশ করবার সময়ে অকুণ্ঠচিত্তে যেরূপ অর্থব্যয় করেন, তাতে নিজের লজ্জাও ছিল সেই বিশ্বাসের মর্য্যাদা থাকবে কি না?

কিন্তু বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং জনসাধারণ প্রথম প্রামাণ্য খেলাধুলার ইতিহাস বলে বইখানিকে যেরূপ মর্য্যাদা দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে আমার পক্ষে গৌরবের। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ এবং মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ বিশেষ বিজ্ঞপ্তির সাহায্যেও বইটির গুণাগুণ স্বীকার করে নিয়েছেন। এইসব বিভিন্ন কারণে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা এত শীঘ্র সম্ভব হলো।

প্রথম সংস্করণের লেখাগুলির মধ্যে যা কিছু ভুল-ত্রুটি ছিল সেগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের ঘটনাবলী এই সংস্করণে যোগ করা হয়েছে। কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু নূতন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারায় সেগুলিও যথাস্থানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিদেশী ফুটবল দলগুলির ভারত সফরের ফলাফল এবং এশিয়ান গেমস্ নামে দুটি নূতন পরিচ্ছেদ যোগ করা হয়েছে। এগারখানি নূতন মূল্যবান ছবিও এই সংস্করণের অন্যতম আকর্ষণ হিসাবে বিবেচিত হবে বলে আশা করি।

এইসব বিভিন্ন কারণে প্রথম সংস্করণ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণের কলেবর বেড়ে গিয়েছে এবং সেই জন্যেই বইখানির দাম সামান্য বাড়াতে হলো। পাঠক সমাজের কাছে এই পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ অধিকতর আদরণীয় হলে নিজের শ্রম সার্থক বলে বিবেচনা করবো।

**লেখক**

# সূচী

এশিয়ান গেমস্—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অলিম্পিকে ট্রাক ও ফিল্ডে বিজয়ীদের তালিকা—ট্রাক ও ফিল্ডে ভারতের জাতীয় রেকর্ড, এশিয়ান রেকর্ড, অলিম্পিক রেকর্ড এবং বিশ্ব রেকর্ডের তুলনামূলক তালিকা—১৯২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অলিম্পিকে মহিলাদের ট্রাক ও ফিল্ডে বিজয়িনীদের তালিকা।




## *ফুটবল খেলার জন্ম ও বিস্তারের কথা*

এই পৃথিবীতে ফুটবল খেলা যে কবে, কোথায় এবং কি ভাবে জন্মলাভ করেছিল সে বিষয়ে আজও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। 'নানা মুনির নানা মত'-এর মত ফুটবলের জন্ম সম্বন্ধে নানা কথা প্রচলিত রয়েছে।

একদল ঐতিহাসিক বলেন যে চীনদেশে নাকি এই খেলা জন্মলাভ করেছিল এবং ঐ সব ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ হিসেবে চীনদেশের ইতিহাস থেকে এক রাজার লোহার বলে সট্ করবার কথা উল্লেখ করেন। রোমদেশে যুদ্ধের পর পরাজিত যোদ্ধার কাটা মাথা পা দিয়ে লাথি মেরে দূরে ফেলে দেবার কথাও শোনা যায়। আবার একদল ঐতিহাসিক ইংলণ্ডই ফুটবলের জন্মস্থান বলে দাবী করেন।

খৃষ্টজন্মের ৫০০ বছর আগে গ্রীক দেশে **হারপাসটন** নামে ফুটবল খেলার ন্যায় একরকমের খেলা প্রচলিত ছিল। অবশ্য সেই ফুটবল খেলা এবং আজকের ফুটবল খেলায় তফাৎ অনেক। এই খেলায় কোন গোলপোষ্ট থাকতো না। সট্ করে বিপক্ষ দলের গোলের সীমানা পার করে দিতে পারলেই গোল হতো। ডার্ব্বি এবং চেষ্টারে খৃষ্টজন্মের ২১৭ বছর পরে ফুটবল খেলার ন্যায় একরকমের খেলার কথাও পাওয়া যায়। রোম এবং স্পার্টার মধ্যে ফুটবল খেলার কথাও ইতিহাসে লেখা আছে। ফুটবল নামের বদলে **ফলিস** নামে এই খেলা তখন খেলা হতো। খৃষ্টজন্মের ২৮ বছর আগে থেকে খৃষ্টজন্মের ১৪ বছর পর পর্য্যন্ত রোমের তখনকার রাজা সিজার অগাষ্টাস এই খেলা দেশ থেকে বন্ধ করে দেন।

যাহোক, বিভিন্ন বই থেকে যতদূর জানা যায় তাতে একথা বলা চলে যে রোমদেশের লোকেরাই বৃটেনে এই খেলা প্রথম প্রচলিত করেছিলেন। ক্রমশঃ এই খেলা ইংলণ্ডে ছড়িয়ে পড়লো। ১১৫৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১১৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের জনসাধারণ ফুটবল খেলায় এমন পাগল হয়ে উঠলো যে, তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় সব কাজ ফেলে শুধু এই খেলাতেই দিনরাত মেতে থাকতো। দ্বিতীয় হেনরী এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজা। তিনি দেখলেন যে, তীরধনুক চালানো এবং যুদ্ধের জন্যে অন্যান্য যেসব শিক্ষার প্রয়োজন সেগুলিও জনসাধারণ এই খেলার জন্যে ছেড়ে দিচ্ছে। ফলে দেশে যদি কখনো যুদ্ধ বাধে তাহ'লে শিক্ষিত সৈনিক যোগাড় করা খুব কষ্টকর হবে। দেশের বিপদের আশঙ্কায় দ্বিতীয় হেনরী আইন করে ফুটবল খেলা বন্ধ করে দিলেন। দ্বিতীয় হেনরীর এই বিধিনিষেধ হেনরীর মৃত্যুর পরেও ৪০০ বছর পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর আগে পর্য্যন্ত ফুটবল খেলা কোন নিয়মের মধ্যে খেলা হতো না। পাশাপাশি দুই গ্রামের অগণিত লোকেরা এই খেলায় যোগ দিতো। দুই গ্রামের মাঝামাঝি কোন একটা জায়গা থেকে খেলা সুরু হতো। যে গ্রামের লোকেরা এই বলটাকে তাদের বিপক্ষ গ্রামের সীমানা পার করে দিতে পারতো, তারাই জয়ী হতো। বল নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে যখন দুই গ্রামের লোকেরা রাস্তা দিয়ে এগুতে থাকতো, তখন রাস্তার দু'ধারের লোকেরা ভয়ে ঘরবাড়ী এবং দোকানের জানালা দরজা সব আগে থেকেই বন্ধ করে দিতো। ক্রমশঃ এই খেলা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে খেলবার নিয়ম হলো এবং খেলোয়াড়েরা সংখ্যায় ৫০ জনের বেশী যোগ দিতে পারবে না বলে ঠিক হলো।

কিন্তু এ সময়ে এই খেলার নাম ফুটবল ছিল না, **কিকিং দি ডেনস্ হেড** বা **কিকিং দি ব্লাডার** নামে খেলা হতো।

১৬০৩ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম জেমস্ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ইংলণ্ডে বন্দুক চালু হওয়ায় তীরধনুক ছোঁড়া শেখার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে যায়। ফলে এই সময় ফুটবল খেলার সমর্থকেরা জেমস্-এর কাছে ফুটবল খেলা পুনরায় চালু করবার জন্যে প্রার্থনা করেন। জেমস্ ফুটবল খেলা চালু করবার প্রার্থনা আনন্দের সঙ্গেই মঞ্জুর করায় খুব অল্প দিনের মধ্যেই ফুটবল খেলা ইংলণ্ডে সব থেকে প্রিয় খেলা হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম এলিস নামে একজন ছাত্র নিজেদের সহপাঠী ছাত্রদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে খেলতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলটি পা দিয়ে সট্ না করে হাতে করে বলটিকে তুলে নিয়ে দৌড়ে বিপক্ষদলের গোল লাইন পার হয়ে চলে যান। যদিও এটা গোল বলে গ্রাহ্য হয় না, কিন্তু এলিস-এর এই হাতে করে বল নিয়ে দৌড়ে যাবার প্রথা কোন কোন খেলোয়াড়ের খুব ভালো লাগে। ফলে কিছু কিছু ছাত্রেরা এলিস-এর নিয়মে কখনো সট্ করে কখনো হাতে করে বল নিয়ে দৌড়ে বিপক্ষদলের গোল লাইন পার হবার খেলা চালু করেন। এইভাবেই **রাগ্‌বি ফুটবলের** সৃষ্টি হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একমাত্র স্কুল ও কলেজের মধ্যেই রাগ্‌বি ফুটবল প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাগ্‌বি ফুটবল এত তাড়াতাড়ি বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যে রাগ্‌বি ফুটবলের আইন তৈরী করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এদিকে যারা শুধু পা দিয়ে ফুটবল খেলতে চান তারাও ফুটবল খেলাকে শুধু মাত্র পা দিয়ে খেলা হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে জনসাধারণের কাছে আবেদন করতে থাকেন। কিন্তু সে আবেদনে সকলে সাড়া না দেওয়ায় **সকার** ও **রাগ্‌বি ফুটবল** নামে দুইপ্রকারের খেলার প্রচলন হয়। যারা শুধুমাত্র পা দিয়ে এই খেলা খেলতে থাকেন তারা **সকার** নামে এবং যারা হাত ও পায়ের সাহায্যে এই খেলা খেলতে থাকেন তারা **রাগ্‌বি ফুটবল** নামে এই খেলা চালু করেন।

১৮৪৮ কি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে যাঁরা পা দিয়ে ফুটবল খেলার পক্ষপাতী তাঁরা কেম্ব্রিজে একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভায় ইটন, হ্যারো, উইনচেষ্টার, এবং সেরস্‌ব্যারী থেকে বিভিন্ন খেলোয়াড় ও পরিচালকেরা মিলে ফুটবল খেলার একটা খসড়া আইন তৈরী করেন। এই আইনকেই **কেম্ব্রিজ রুল** বলা

হয়। কিন্তু এই আইন কখনো কোন খেলায় মেনে চলা হয়েছিল কিনা বলা কঠিন।

১৮৬২ এবং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আবার কেম্ব্রিজ থেকে ফুটবল খেলার আইন সংশোধন করে প্রচার করা হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যে আইন প্রকাশিত হয়, সেই আইনই আজকের ফুটবল খেলার আইনের গোড়াপত্তন করে। এই আইনগুলি খুব সহজ থাকায় জনসাধারণের মধ্যে আইনগুলি খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে 'অফসাইড' আইনের প্রবর্ত্তন করা হয়।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান দল থেকে খেলোয়াড় ও প্রতিনিধিদের নিয়ে **ফুটবল এসোসিয়েশন** বা **এফ. এ.**-র জন্ম হয়। এই ফুটবল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই এসোসিয়েশনকে একটি 'লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানী'-তে পরিণত করা হয়, যদিও অংশীদার বা পরিচালকদের কোন লাভের অংশ দেওয়া হতো না। এই এসোসিয়েশন ফুটবল খেলাকে ক্রমশঃ একটা শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড এবং ওয়েলস্ থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সমিতি গঠিত হয়।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফুটবল এসোসিয়েশন বাৎসরিক ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেন। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে যে কাপটি দেওয়া হয় তাকেই **এফ. এ. কাপ** বলে। **কোন এসোসিয়েশন দ্বারা পরিচালিত ফুটবল প্রতিযোগিতা হিসেবে এফ. এ. কাপই সর্ব্বপ্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা।** এফ. এ. কাপ-এর খেলা সুরু হবার কিছুদিনের মধ্যে এই কাপ-এর খেলা দেখার জন্যে ইংলণ্ডের জনসাধারণ এমন পাগল হয়ে ওঠে যে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দর্শকদের জায়গা কুলানোর ন্যায় মাঠ ইংলণ্ডে অভাব হয়ে পড়ে। ফলে এই সময় থেকেই ফুটবল খেলায় **জায়গা রিজার্ভ করা** বা **অগ্রিম আসন-সংরক্ষণ করার** ব্যবস্থা চালু হয়।

প্রথম অবস্থায় ফুটবল খেলার সেণ্টার ফরোয়ার্ডেরা যে যতক্ষণ পায়ে বল রাখতে পারতেন ততই দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতেন। এই সময় এমন সব ধুরন্ধর ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন, যাদের মাঠে খেলবার সময়ে বাধা দেওয়া বা তাদের কাছ থেকে বল কেড়ে নেওয়া খুব কষ্টকর ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ফুটবল খেলার সবথেকে বেশী উন্নতি হয় এবং খেলার পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন হয়।

ফুটবল খেলা যে একার খেলা নয় এবং নিজের কৃতিত্ব দেখানো থেকে দলের জয়লাভে সহায়তা করা যে বেশী প্রয়োজনীয়, এ কথাটাও এই সময়কার খেলোয়াড়েরা বুঝতে সুরু করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অর্থাৎ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফুটবল খেলা প্রায় সমস্ত পৃথিবীতেই একরকম বন্ধ থাকে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর যখন আবার খেলা চালু হয় তখন খেলার মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসে। পূর্ব্বে যেমন ফরোয়ার্ডের খেলোয়াড়েরা বেশী সময় বল পায়ে রাখাকে কৃতিত্ব মনে করতেন, এই সময়ে ঠিক তার বিপরীত অবস্থা দেখা দেয়। অর্থাৎ বল পাওয়া মাত্র খেলোয়াড়েরা অন্য খেলোয়াড়দের কাছে বল দিয়ে দায়িত্ব-মুক্ত হতে থাকেন। ফলে ভালো সেণ্টার ফরোয়ার্ড খুঁজে বার করবার জন্যে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে যায়। প্রচুর অর্থ দিয়ে একজন সেণ্টার ফরোয়ার্ডের খেলোয়াড় যোগাড় করা হতে থাকে। এইভাবেই ফুটবল খেলায় **পেশাদারী খেলোয়াড়ের** প্রচলন হয়। ২০শে জুন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আইন অনুযায়ী **পেশাদারী প্রথা** স্বীকার করে নেওয়া হয়।

**ফুটবল লীগ খেলা** ইংলণ্ডে আরম্ভ হয় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ থেকে। মিঃ উইলিয়াম ম্যাকগ্রেগর, যাকে লীগ খেলার জন্মদাতা বা 'ফাদার অফ লীগ' বলা হয়, তিনি প্রথমে ১২টি দল নিয়ে এই খেলা সুরু করেন। কিন্তু ক্রমশঃ লীগ খেলায় এত বেশী দল যোগদান করে যে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বিভাগে ভাগ করে লীগ খেলার পরিচালনা করতে হয়। এই সময় থেকেই লীগ খেলায় দল **ওঠা-নামার** নিয়মও চালু হয়। দল ওঠা-নামা বলতে এই বোঝায় যে, দ্বিতীয় বিভাগে যে দল প্রথম হবে সে দল প্রথম বিভাগে উঠবে, তৃতীয় বিভাগে যে দল প্রথম হবে সে দল দ্বিতীয় বিভাগে উঠবে এবং চতুর্থ বিভাগে যে দল প্রথম হবে সে দল তৃতীয় বিভাগে খেলতে পারবে বলে নিয়ম হয়। ঠিক তেমনি আবার প্রথম বিভাগে যে দল সব চাইতে কম পয়েন্ট পাবে সে দল দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যাবে, দ্বিতীয় বিভাগে যে দল সব চাইতে কম পয়েন্ট পাবে সে দল তৃতীয় বিভাগে এবং তৃতীয় বিভাগের সব চাইতে কম পয়েন্ট পাওয়া দল চতুর্থ বিভাগে নেমে যাবে বলে নিয়ম হয়। এক দল থেকে অন্য দলে খেলোয়াড়দের **দল পরিবর্ত্তন করবার নিয়ম**ও এই সময় থেকে চালু হয়। লীগ খেলার কিছু কিছু আইনের পরিবর্ত্তনও এই সময় করা হয়।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে **এমেচার ফুটবল এসোসিয়েশন** বা **সৌখীন খেলোয়াড়দের ফুটবল প্রতিষ্ঠান** গঠিত হয়। কিন্তু এই এসোসিয়েশন তেমন শক্তিশালী

ছিল না এবং এসোসিয়েশনের পরিচালনায় যে খেলাগুলো হতো সেগুলিও তেমন ভালভাবে পরিচালিত হতো না। ফলে এই এসোসিয়েশন বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই এসোসিয়েশন আবার ফুটবল এসোসিয়েশনের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। এমেচার ফুটবল এসোসিয়েশন খেলা থেকে 'পেনাল্টি কিক্' একেবারে তুলে দেন।

**প্রথম আন্তর্জাতিক খেলা** অনুষ্ঠিত হয় ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে এবং প্রথম খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। একবার ইংলণ্ডে এবং একবার স্কটল্যাণ্ডে এইভাবে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই খেলা বন্ধ হয়ে যায় এবং পুনরায় ১৯২০ খৃষ্টাব্দ থেকে চালু হয়। ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শুধু ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যেই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়, পরে আয়র্ল্যাণ্ড ও ওয়েলস্ যোগদান করে। আয়র্ল্যাণ্ড ও ওয়েলস্ যোগ দেওয়ায় খেলায় নূতন আইন তৈরী হয় এবং প্রত্যেক দলকে প্রত্যেক দলের সঙ্গে খেলতে হবে বলে আইন তৈরী হয়। এই খেলাগুলিতে কোন দল অপর দলের কাছে জয়ী হলে ২ পয়েণ্ট এবং অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করলে ১ পয়েণ্ট পাবে বলে নিয়ম হয়। সব কয়টি খেলা হয়ে যাবার পর যে দল সব থেকে বেশী পয়েণ্ট পাবে সেই দলই জয়ী হবে বলে আইন তৈরী হয়।

**অলিম্পিকে ফুটবল প্রতিযোগিতা** আরম্ভ হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে, এথেন্সে অনুষ্ঠিত বেসরকারী অলিম্পিক থেকে।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সমস্ত পৃথিবীর ফুটবল খেলা পরিচালনার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান **ফেডারেশন অফ ইণ্টারন্যাশন্যাল ডি ফুটবল এসোসিয়েশন** গঠিত হয়। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে **ওয়ার্ল্ড কাপ** বা **জুলেস রিমেট কাপ**-এর খেলা চালু করেন।

ভারতবর্ষে ফুটবল খেলা যে ঠিক কোন সময় থেকে সুরু হয় তা বলা সম্ভব নয়। সঠিক খৃষ্টাব্দ বলা না গেলেও একথা অবশ্য জোর করেই বলা চলে যে ইংরাজেরা আমাদের দেশে এই খেলার প্রথম প্রচলন করেছিলেন।

বিভিন্ন কাগজপত্র থেকে যতদূর জানা যায় তা থেকে দেখা যায় যে, **ভারতবর্ষে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা** হয় বোম্বাইয়ের 'মিলিটারী' এবং 'আইল্যাণ্ড অফ বোম্বাই' দল তুটির মধ্যে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এলাহাবাদ ভারতের ফুটবল খেলার পীঠস্থান ছিল। ভারতের বিভিন্ন শক্তিশালী ফুটবল দল প্রতি বছর এলাহাবাদে মিলিত হতো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্যে।

কলকাতায় প্রথম ফুটবল ম্যাচ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ফুটবল খেলা হয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে 'ইটোনিয়ান্স' ও 'রেষ্ট' দল দুটির মধ্যে।

**ভারতে সর্ব্বপ্রথম ফুটবল ক্লাব** প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতায়। এই ক্লাবের নাম হলো 'ডালহৌসী ক্লাব'।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে **ভারতে প্রথম ফুটবল এসোসিয়েশন**-এর সৃষ্টি হয়; 'ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন' নামে। এই এসোসিয়েশন শুধু ভারতে নয়, এশিয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ফুটবল এসোসিয়েশন।

## *ফেডারেশন অফ ইণ্টারন্যাশন্যাল ডি ফুটবল এসোসিয়েশন ( এফ. আই. এফ. এ. )*

সারা বিশ্বের ফুটবল খেলা পরিচালনার দায়িত্ব যে প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত, তার নাম হলো, 'ফেডারেশন অফ ইণ্টারন্যাশন্যাল ডি ফুটবল এসোসিয়েশন' ( এফ. আই. এফ. এ. ), ইংরেজীতে চলতি ভাষায় যাকে 'ফি. ফা.' বলা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয় ফুটবল এসোসিয়েশনের সভ্যদের নিয়ে গঠিত এই এসোসিয়েশন আজ বিশ্বের ফুটবল খেলা পরিচালনার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে 'হেগ ফুটবল ক্লাব' এবং 'নেদারল্যাণ্ড জাতীয় ফুটবল এসোসিয়েশনের' সভাপতি সি. এ. ডব্লিউ. হির্চ্চম্যান ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন বা এফ. এ.-র কাছে একটা আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিষ্ঠান গঠন করার জন্যে লিখিতভাবে অনুরোধ করেন। হির্চ্চম্যানের উদ্দেশ্য ছিল যে, একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হলে বিভিন্ন দেশের জাতীয় ফুটবল প্রতিষ্ঠানগুলি আরও বেশী অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে এবং বিশেষ করে বৃটিশ ফুটবল খেলোয়াড় এবং বৃটিশ ফুটবল এসোসিয়েশনগুলির সম্মান ও মর্য্যাদা আরও বেড়ে যাবে। কিন্তু ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ অবধি ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন হির্চ্চম্যানের প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন গুরুত্ব দেন না।

ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের নীরবতা দেখে রবার্ট গুইরেন-এর নেতৃত্বে ফরাসী জাতীয় ফুটবল প্রতিষ্ঠান (The Union des Societes Francaises de Sports Athletiques) এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন দেশের একটি মিলিত সভা আহ্বানের চেষ্টা করতে থাকেন। রবার্ট গুইরেন এই উদ্দেশ্যে লণ্ডনে এসে ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের তখনকার সম্পাদক এফ. জি. ওয়াল-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওয়াল-এর কাছ থেকে এ বিষয়ে বিশেষ কোন উৎসাহ না

পেয়ে গুইরেন প্যারিসে, নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, ইটালী এবং সুইডেনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে, ২২শে এবং ২৩শে মে এই সভা হয়। এই সভাতেই 'ফেডারেশন অফ ইণ্টারন্যাশনাল ডি ফুটবল এসোসিয়েশন' গঠন করা হয়। রবার্ট গুইরেন এই এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই এসোসিয়েশনের সঙ্গে ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন যোগদান করে। ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ফেডারেশন ইণ্টারন্যাশন্যাল ডি ফুটবল এসোসিয়েশনের নূতন আইন তৈরী হয়।

## ফুটবল এসোসিয়েশন ( এফ. এ. )

পৃথিবীতে খুব কম দেশই আছে যেখানে আজ ফুটবল খেলা হয় না। কিন্তু একদিনেই এই খেলা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েনি। বহু বাধা বিপত্তি পার হয়ে ফুটবল খেলা আজ বিশ্বের অন্যতম প্রিয় খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফুটবল খেলাকে পৃথিবীতে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার সব থেকে বেশী কৃতিত্ব ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের। এই এসোসিয়েশনকেই ফুটবল এসোসিয়েশন বা এফ. এ. বলা হয়। খেলার বিভিন্ন আইন প্রথম তৈরী করে এবং প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন করে এই এসোসিয়েশন ফুটবল খেলার আকর্ষণ ও মর্য্যাদা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম ফুটবল এসোসিয়েশন হিসেবেও ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রাগ্‌বি ফুটবল খেলা প্রচলিত হবার পর ইংলণ্ডে ফুটবল খেলার সমর্থকেরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে পড়েন। একদল ফুটবল খেলাকে শুধুমাত্র পায়ের খেলা হিসেবে এবং অন্য দল হাত ও পায়ের সাহায্যে রাগ্‌বি প্রথায় খেলাটাকে প্রচলিত করবার জন্যে চেষ্টা করতে থাকেন। শুধু মাত্র পা দিয়ে ফুটবল খেলার যারা পক্ষপাতী তারা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ২৬শে অক্টোবর লণ্ডনের গ্রেট কুইন স্ট্রীটের 'ফ্রিমেসনস্ টেভার্ণে' এই উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক সভায় মিলিত হন। ক্রুসেভার্স, বার্ণেস এবং সামরিক দলের ন্যায় তখনকার দিনের খ্যাতনামা ফুটবল ক্লাবের প্রতিনিধি এবং খেলোয়াড়েরা এই সভায় যোগ দেন। একমাত্র শেফিল্ড ক্লাব নিজেদের মধ্যে দলাদলির জন্যে এই সভায় যোগ দিতে পারে না। এই ঐতিহাসিক সভাতেই ফুটবলকে একমাত্র পায়ের খেলা হিসবে গ্রহণ করে খেলার আইন তৈরী করা হয় এবং এই সভাতেই ইংলণ্ড ফুটবল এসোসিয়েশন বা এফ. এ. গঠিত হয়। ক্রমশঃ

এই এসোসিয়েশন শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সমস্ত ফুটবল এসোসিয়েশনগুলি এই এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সৌখীন ফুটবল দলগুলি এই এসোসিয়েশন ত্যাগ করে 'এমেচার ফুটবল এসোসিয়েশন' নামে নূতন আর একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে। কিন্তু এই এমেচার ফুটবল এসোসিয়েশন তেমন শক্তিশালী না থাকায় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ফুটবল এসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হয়।

## অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন
## ( এ. আই. এফ. এফ. )

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ফুটবল খেলার সকল দায়িত্ব এবং পরিচালনার সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃত্ব অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন-এর উপর ন্যস্ত। কিন্তু এই ফেডারেশন খুব বেশীদিন পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ভারতে ফুটবল খেলার উন্নতি ও প্রসারের যে-সব চেষ্টা হয়েছে তার বেশীর ভাগ দায়িত্ব বহন করেছেন ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন। এই ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন-এর সাহায্য এবং চেষ্টাতেই অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন-এর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে কোন ফুটবল প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনই প্রকারান্তরে ভারতীয় ফুটবল খেলা পরিচালনা করতেন। অবশ্য ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন ছাড়া আরও দু-একটি প্রাদেশিক এসোসিয়েশন ছিলো, যারা দু-একটা উল্লেখযোগ্য ফুটবল প্রতিযোগিতা পরিচালনা করছিলেন।

ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন বা আই. এফ. এ. সৃষ্টি হবার পর ক্রমে ক্রমে পশ্চিম ভারতীয় ফুটবল এসোসিয়েশন ( ওয়াই. আই. এফ. এ. ), মহীশূর রাজ্য ফুটবল এসোসিয়েশন এবং পাঞ্জাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় ফুটবল এসোসিয়েশন ( এন. ডব্লিউ. এফ. এ. ) গঠিত হওয়ায় আই. এফ. এ.-র পরিচালকমণ্ডলী স্থির করলেন যে এখন সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজন।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে আই. এফ. এ.-র এক সভা আহ্বান করা হয়। সভায় স্থির হয় যে, আই এফ. এ-কেই ভারতীয় ফুটবল খেলা পরিচালনার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত করা হবে এবং ভারতের বিভিন্ন ফুটবল প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেবার জন্যে আই. এফ. এ.-কে দুটি ভাগে ভাগ করা হবে বলেও এই সভাতেই স্থির হয়। একটি বিভাগে কলকাতার ফুটবল

খেলা ও তার পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে এবং অন্য বিভাগটিকে 'ফেডারেল কাউন্সিল' নাম দিয়ে সারা ভারতের ফুটবল খেলা পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে।

এই উদ্দেশ্যে আই. এফ. এ. সমস্ত প্রাদেশিক এসোসিয়েশনগুলিকে এক সভায় মিলিত হবার জন্যে আহ্বান করেন। সভাটি দ্বারভাঙ্গায় সন্তোষের মহারাজার ( তখনকার আই. এফ. এ.-র সভাপতি ) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই সভায় উপস্থিত অন্যান্য প্রাদেশিক এসোসিয়েশনের সভ্যেরা আই. এফ. এ.-কে সমস্ত প্রাদেশিক এসোসিয়েশনগুলির পরিচালক হিসেবে স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করেন। ফলে আই. এফ. এ.-র সদস্যের সঙ্গে অন্যান্য প্রাদেশিক এসোসিয়েশনের সভ্যদের মতের মিল না হওয়ায় আই. এফ. এ.-র নির্ব্বাচিত যে দুজন সদস্য এই সভায় যোগদান করেছিলেন তাঁরা সভা ত্যাগ করে চলে আসেন। যাহোক আই এফ. এ.-র সভ্যদের ছাড়াই উপস্থিত অন্যান্য প্রাদেশিক এসোসিয়েশনের সভ্যদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ঐ কমিটির সভাপতি এবং রায়বাহাদুর জে. পি. সিনহা সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। এইভাবে জোড়াতালি দিয়ে একটা এ. আই. এফ. এফ. কমিটি গঠিত হয়।

আই. এফ. এ. আগে থেকেই ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন এবং তাঁরা নিজেদের আগের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকলেন। কিন্তু মুস্কিল দেখা দিল ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ে লণ্ডনের ইসলিংটন করিনথিয়ান্স দল ভারত সফরের জন্যে আই. এফ. এ.-র সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাতে থাকায় এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। আই. এফ. এ.-কেই আবার এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য উদ্যোগী হতে হয়।

এই সময়কার আই. এফ. এ.-র সম্পাদক পঙ্কজ গুপ্ত আর্ম্মি স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার ভি. এইচ. বি. ম্যাজেণ্ডির সঙ্গে আলোচনা করে ঐ অচল অবস্থা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করতে থাকেন। ব্রিগেডিয়ার ম্যাজেণ্ডি আই. এফ. এ. এবং এ. আই. এফ. এফ. এ.-র মধ্যে মীমাংসা করবার জন্যে একটা যুগ্মসভা আহ্বান করেন। আই. এফ. এ. এবং এ. আই. এফ. এফ. এ.-র তরফ থেকে তিনজন করে সদস্য এই সভায় উপস্থিত হন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ২৭শে মার্চ্চ তারিখে দিল্লীর সামরিক দপ্তরের প্রধান কার্য্যালয়ে ব্রিগেডিয়ার ম্যাজেণ্ডির সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। আই. এফ. এ.-র তরফ থেকে এস. এন. ব্যানার্জী ( নেতা ), এইচ. এন. নিকলস্ এবং পঙ্কজ গুপ্ত ও এ. আই.

এফ. এফ. এ.-র তরফ থেকে বোম্বায়ের এইচ. ই. ব্রাগুন, দিল্লীর বদরুল ইসলাম এবং তখনকার এ. আই. এফ. এফ. এ.-র সম্পাদক রায়বাহাদুর জে. পি. সিনহা সভায় উপস্থিত হন।

এই সভায় ঠিক হয় যে, এখন থেকে সমস্ত প্রাদেশিক এসোসিয়েশনগুলিকে এ. আই. এফ. এফ. এ.-র অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। আই. এফ. এ. ও সার্ভিসেস স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ডের দুজন করে সভ্য নিয়ে এবং অন্যান্য প্রাদেশিক এসোসিয়েশনগুলি থেকে একজন করে সভ্য নিয়ে এ. আই. এফ. এফ. এ.-র মূল কমিটি গঠিত হবে বলে সভায় স্থির হয়। এই সভায় এইচ. ই. ব্রাগুন ও পঙ্কজ গুপ্তকে ফেডারেশনের আইন তৈরী করবার জন্যে মনোনীত করা হয় এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে সিমলায় এ. আই. এফ. এফ. এ.-র প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে ব্রিগেডিয়ার ম্যাজেণ্ডির সভাপতিত্বে সরকারীভাবে সিমলায় এ. আই. এফ. এফ. এ.-র প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিগেডিয়ার ভি. এইচ. বি. ম্যাজেণ্ডি সভাপতি, মেজর এ. সি. উইলসন সম্পাদক এবং পঙ্কজ গুপ্ত কোষাধ্যক্ষ হিসাবে এই সভায় নির্ব্বাচিত হন। এইচ. ই. ব্রাগুন ও পঙ্কজ গুপ্ত ফেডারেশনের জন্যে যে আইনের খসড়া করেছিলেন সেগুলিও এই সভায় গৃহীত হয়। এইভাবে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন সরকারীভাবে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন বা এ. আই. এফ. এফ. জন্মলাভ করে।

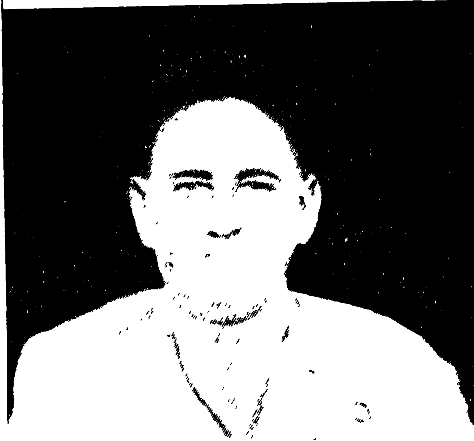
## ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন
## ( আই. এফ. এ. )

ফুটবল খেলা বিদেশী হলেও ভারতের জনসাধারণ এই খেলাকে জাতীয় খেলা হিসেবে গ্রহণ করেছে। আজ বোধ হয় ভারতে এমন কোন শহর বা গ্রাম নেই যেখানে ফুটবল খেলা হয় না। শহরে বা গ্রামে যেখানেই খেলা হোক্ না কেন, এই খেলার মাঝে এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত উদ্দীপনা দেখা যায়। ভারতের আকাশে বাতাসে ফুটবল খেলার আকর্ষণ যেন মিশে রয়েছে। এই খেলাকে এমনি ভাবে ভারতের মাঝে ছড়িয়ে দিলো কারা—এ প্রশ্ন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তাহ'লে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের নামই প্রথম বলতে হবে। ভারতে ফুটবল খেলার প্রথম এসোসিয়েশন হলো ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন। সেই কারণেই ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনকে ভারতের বিভিন্ন ফুটবল খেলার প্রতিষ্ঠানের 'জনক' বলা হয়।

ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন বা আই. এফ. এ.-র সৃষ্টি হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের সৃষ্টির সঙ্গে 'ট্রেডস কাপ' প্রতিযোগিতার সম্পর্ক খুব নিকটতম। ট্রেডস কাপ প্রতিযোগিতা প্রচলিত হবার পর এই প্রতিযোগিতা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইউরোপীয়, সামরিক, বেসামরিক, ভারতীয়, আর্মেনিয়ান্স এবং কলেজ দলগুলি এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে থাকায় একটা শক্তিশালী এসোসিয়েশনের হাতে ট্রেডস কাপ পরিচালনার ভার দেওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই কারণেই ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আই. এফ. এ.-র সৃষ্টি হয়।

খেলাধুলা মহলে কোন কোন বিশেষজ্ঞেরা দাবী করেন যে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন ট্রেডস কাপ প্রতিযোগিতা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এই কমিটি, ট্রেডস কাপ পরিচালনা কমিটি হিসাবেই পরিচিত ছিল। বিভিন্ন তথ্য থেকে যতদূর জানা যায় তাতে দেখা যায় যে, প্রথম প্রথম ট্রেডস কাপ পরিচালনা কমিটি এবং আই. এফ. এ. কমিটি একই সভ্যদের নিয়ে গঠিত হতো।

যা হোক আই. এফ. এ. শীল্ড খেলা সুরু হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। এই কারণেই ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দকেই আই. এফ. এ.-র জন্ম সাল বলে ধরা হয়।



সন্তোষের মহারাজা

আই. এফ. এ. শীল্ড খেলা প্রচলিত হবার প্রথম বছরেই অর্থাৎ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শীল্ড খেলা পরিচালনার জন্যে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি

অবশ্য তখন বেশীর ভাগ ইউরোপীয় সদস্যদের নিয়েই গঠিত হতো, কারণ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একমাত্র ইউরোপীয় ক্লাবের প্রতিনিধিদের আই. এফ. এ.-র সভ্যশ্রেণীভুক্ত হবার অধিকার ছিল। কিন্তু এতে অসন্তোষের সৃষ্টি হওয়ায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারতীয় ক্লাবের প্রতিনিধিরাও আই. এফ. এ.-র সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হবার অধিকার পান।

ফুটবল খেলা ক্রমশঃই ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং অনেকগুলি শক্তিশালী ফুটবল ক্লাবের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ক্লাবের সৃষ্টি হতে থাকায় আই. এফ. এ.-র সভ্যসংখ্যাও বাড়তে থাকে এবং আই. এফ. এ.-ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ থেকে আই. এফ. এ. রেজিষ্ট্রেশন প্রথা চালু করেন।

আই. এফ. এ.-র প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে নির্ব্বাচিত হন যথাক্রমে মাননীয় বিচারপতি উইলিয়ামস্ ম্যাকফিয়ারর্সন এবং এ. আর. ব্রাউন।

ভারতীয় হিসেবে প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হবার গৌরব লাভ করেন সন্তোষের মহারাজা ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে। প্রথম ভারতীয় যুগ্ম-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন মন্মথনাথ গাঙ্গুলী।

## *অলিম্পিকে ফুটবল খেলা*

অলিম্পিক সুরু হবার গোড়া থেকে ফুটবল খেলা কিন্তু অলিম্পিকের প্রতি-যোগিতার মধ্যে ছিল না। ক্রমশঃ এই খেলা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ায় এবং বিভিন্ন দেশেব মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে থাকায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এথেন্সে যে বেসরকারী অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয় সেই অলিম্পিকে ফুটবল খেলাকে প্রথম অলিম্পিকের প্রতিযোগিতার মধ্যে গ্রহণ করা হয়। এথেন্সের এই প্রতিযোগিতায় ডেনমার্ক বেলজিয়ামকে ২-০ গোলে পরাজিত করে প্রথম ফুটবল খেলায় অলিম্পিক বিজয়ী হবার গৌরব লাভ করে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যে চতুর্থ অলিম্পিক হয় তাতে গ্রেটবৃটেন ডেনমার্ককে ২-০ গোলে পরাজিত করে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম অলিম্পিকেও গ্রেটবৃটেন আবার ডেনমার্ককে ৪-০ গোলে হারিয়ে পর পর দুবার অলিম্পিক বিজয়ী হবার কৃতিত্ব লাভ করে।

সপ্তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় এন্টিওয়ার্পে। এই অলিম্পিকে বেলজিয়াম চেকোশ্লোভাকিয়াকে ৫-০ গোলে পরাজিত করে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে অষ্টম অলিম্পিক হয় প্যারিসে এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে নবম অলিম্পিক হয় আমষ্টার্ডামে। এই দুটো অলিম্পিকেই উরুগুয়ে সুইজারল্যাণ্ডকে ৩-০ এবং আর্জেন্টিনাকে ২-১ গোলে হারিয়ে পরপর দুবার জয়লাভ করে।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে লস্ এঞ্জেল্স্-এ যখন দশম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় তখন ফুটবলকে আবার অলিম্পিক প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই জনপ্রিয় খেলাকে বেশীদিন অলিম্পিক প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দিয়ে রাখা সম্ভব হয় না।

বার্লিনে যখন একাদশ অলিম্পিক হয় তখন ফুটবলকে আবার অলিম্পিক প্রতিযোগিতার মধ্যে রাখা হয়। এই বার্লিন অলিম্পিকে ইটালী অষ্ট্রিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে দেয়। এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে কোন অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় না।

যুদ্ধ থেমে যাবার পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে আবার নূতন উদ্যমে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা সুরু হয়। লণ্ডন অলিম্পিকে সুইডেন যুগোশ্লোভিয়াকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে। ভারত এই অলিম্পিকে প্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। প্রথম রাউণ্ডের খেলায় নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতকে অবশ্য ফ্রান্সের কাছে ২-১ গোলে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

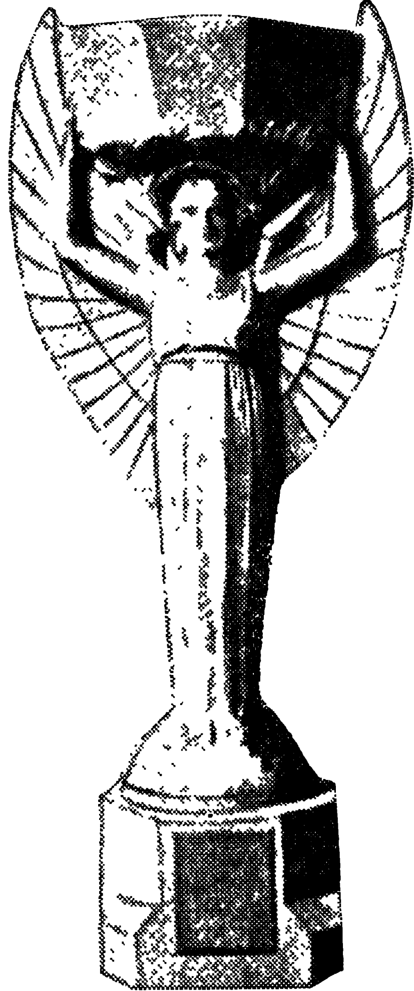
১৯৫২ খৃষ্টাব্দের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় হেলসিঙ্কিতে। হাঙ্গেরী এই অলিম্পিকে যুগোশ্লোভিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েদেয়। ভারত এই অলিম্পিকেও যোগদান করে কিন্তু প্রিলিমিনারী রাউণ্ডের খেলাতেই যুগোশ্লোভিয়ার কাছে শোচনীয় ভাবে ১০-১ গোলে পরাজিত হয়।

## *বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা বা জুলেস রিমেট কাপ*

জুলেস রিমেট কাপ বা ওয়ার্ল্ড কাপ বর্ত্তমান পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতা, এমন কি এক হিসাবে এই প্রতিযোগিতা অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতা থেকেও বড়। কারণ অলিম্পিকে যে ফুটবল প্রতিযোগিতা হয় সেই প্রতিযোগিতায় একমাত্র অপেশাদার খেলোয়াড়েরাই খেলতে পারেন, কিন্তু এই জুলেস রিমেট কাপ সম্পর্কে কোন সম্প্রদায়ের খেলোয়াড়ের উপর

কোন বিশেষ বাধানিষেধ দেই। অর্থাৎ পেশাদার ও অপেশাদার সব শ্রেণীর খেলোয়াড়েরাই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

ফেডারেশন অফ ইন্টারন্যাশন্যাল ডি ফুটবল এসোসিয়েশনের বিদায়ী সভাপতি এম. জুলেস রিমেটের নাম অনুযায়ী এই প্রতিযোগিতার বিজয়ী দলকে যে কাপটি দেওয়া হয় তাকে জুলেস রিমেট কাপ বলে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ফেডারেশন অফ ইন্টারন্যাশন্যাল ডি ফুটবল এসোসিয়েশনের যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সভায় এই প্রতিযোগিতা চালানো হবে বলে স্থির হয়। প্রত্যেক চার বৎসর অন্তর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বলে আইন তৈরী হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে জুলেস রিমেট কাপের খেলা স্বরু হয়।



জুলেস রিমেট কাপ

যে কোন জাতীয় ফুটবল এসোসিয়েশন, যারা ফেডারেশন অফ ইন্টারন্যাশন্যাল ডি ফুটবল এসোসিয়েশনের সভ্য, তারাই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারে। যে কোন জাতীয় ফুটবল দল তিন বছর (পর পর না হলেও) জুলেস রিমেট কাপ-এ জয়লাভ করতে পারলে চিরকালের ন্যায় এই কাপ লাভ করতে পারে।

ক্রমশঃ এই জুলেস রিমেট কাপ-এ জয়লাভ করবার জন্যে বিশ্বের সকল জাতি উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। ফলে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দলের

সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, মূল প্রতিযোগিতার আগেই ১৬টি দলকে প্রথমে 'কোয়ালিফাইং' প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। এ ছাড়া বাকী অন্য দলগুলিকে ১৪টি ভাগে ভাগ করে খেলানো হয়। ১৪টি ভাগে দলগুলিকে ভাগ করে নেবার পর প্রত্যেক ভাগে যে দলগুলি থাকে তারা প্রত্যেকে অপর দলের সঙ্গে লীগ প্রথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রত্যেক দলকে অপর দলের সঙ্গে দুবার করে খেলতে হয়। এক একটি খেলায় জয়ী হলে ২ পয়েন্ট এবং অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করলে ১ পয়েন্ট পাওয়া যায়। এই ভাবে প্রত্যেকটি ভাগে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে খেলা হয়ে যাবার পর ১৪টি ভাগে যে ১৪টি দল সব থেকে বেশী পয়েন্ট লাভ করে তারা বিজয়ী হয়। এই ১৪টি বিজয়ী দলকে, যে দেশে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সেই দেশের দলকে এবং যে দল আগেকার বিজয়ী থাকে সেই দলটিকে নিয়ে মোট ১৬টি দলের মধ্যে তখন মূল প্রতিযোগিতা সুরু হয়।

এই ১৬টি দল থেকে প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটি যে-কোন চারটি দলকে বেছে নেন। বাকী ১২টি দলকে ৩টি ৩টি করে চারভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রথমে যে ৪টি দলকে বেছে রাখা হয়েছিল সেই দল ৪টি-কে একটি একটি করে এক-একটি ভাগের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ফলে প্রত্যেক ভাগেই শেষ পর্য্যন্ত ৪টি করে দল হয়। প্রত্যেক ভাগের প্রত্যেক দলকে সেই বিভাগের অপর ৩টি দলের সঙ্গে ঠিক আগের মত দুবার করে আবার লীগ প্রথায় খেলতে হয়।

এই ভাবে ঐ চারটি ভাগে যে ৪টি দল সব থেকে বেশী পয়েন্ট লাভ করে তারা বিভাগীয় বিজয়ী দল হিসেবে সাব্যস্ত হয়। তখন এই চারটি বিজয়ী দলের মধ্যে সর্ব্বশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। প্রত্যেক দলকে অপর দলের সঙ্গে দুবার করে লীগ প্রথায় খেলতে হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক দলকেই ৬টি করে খেলতে হয়। প্রত্যেক দলের ৬টি করে খেলা হয়ে যাবার পর যে দল সব থেকে বেশী পয়েন্ট লাভ করে তারাই জুলেস রিমেট কাপ বা ওয়ার্ল্ড কাপ-এ বিজয়ী হবার গৌরব লাভ করে। আবার কখনো ঐ ৪টি বিভাগ থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দলগুলিকে নিয়ে মোট ৮টি দলের নকআউট প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে জুলেস রিমেট কাপ খেলার জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়। এই বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে এক হিসেবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবল দল হিসেবেও গণ্য করা হয়।

মূল প্রতিযোগিতায় যে দলগুলি পৌছিতে পারে সেই দলগুলির প্রত্যেক

খেলোয়াড় একটা করে রৌপ্য পদক লাভ করে। জুলেস রিমেট কাপ-বিজয়ী দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে একটা করে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে উরুগুয়েতে প্রথম জুলেস রিমেট কাপ-এর খেলা হয়। প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় মোট ১৩টি দেশ যোগদান করে। উরুগুয়ে আর্জেন্টিনাকে ৪-২ গোলে পরাজিত করে প্রথম জুলেস রিমেট কাপ-এ জয়লাভের গৌরব লাভ করে।

## এফ. এ. কাপ

ফুটবল এসোসিয়েশন সৃষ্টি হবার পর ইংলণ্ডে ফুটবল খেলা খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অনেক শক্তিশালী ফুটবল দলেরও সৃষ্টি হয়। এই সব ফুটবল দলগুলি তখন নিজেদের শক্তি যাচাই করবার জন্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে



রাজা ষষ্ঠ জর্জ আর্সেনাল দলের অধিনায়ককে এফ. এ. কাপ উপহার দিচ্ছেন

সুরু করে। কিন্তু এই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার আকর্ষণ ক্রমশঃই বেড়ে যেতে থাকে। ফুটবল এসোসিয়েশন এই অবস্থা বুঝতে পেরে নিজেদের সভ্যদের কাছ থেকে ২৫ পাউণ্ড চাঁদা তুলে একটা সুদৃশ্য কাপ তৈরী করে ১৮৭১-৭২ খৃষ্টাব্দ

থেকে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা সুরু করেন। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী-দলকে যে কাপটি দেওয়া হয়, সেই কাপটিকেই এফ. এ. কাপ বলা হয়।

এফ. এ. কাপই বিশ্বের সর্ব্বপ্রাচীন ফুটবল প্রতিযোগিতা। এফ. এ. কাপের খেলা প্রতি বছরই ইংলণ্ডে হয়। ফুটবল এসোসিয়েশন এটা পরিচালনা করেন। এফ. এ. কাপের খেলা আজ শুধু ইংলণ্ডের দলগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বের সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফুটবল দলই এই প্রতিযোগিতায় বর্ত্তমানে যোগদান করে থাকে।

প্রথমে নিয়ম ছিল, যে-দল পর পর তিনবার এফ. এ. কাপ-এ জয়লাভ করতে পারবে সেই দল চিরকালের মত এই কাপটি লাভ করবে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ওয়াণ্ডারার্স দল পর পর তিন বছর এফ. এ. কাপ বিজয়ী হয়ে কাপটিকে চিরকালের মত লাভ করে। কিন্তু ওয়াণ্ডারার্স দল খেলোয়াড়োচিত মনোভাব নিয়ে এই কাপটিকে আবার ফেরত দিয়ে দেয়। তবে তারা এই কাপটিকে ফেরত দেবার সময় একটি সর্ত্ত করে নেয় যে—যে দলই এখন থেকে এফ. এ. কাপ পর পর তিন বছর বিজয়ী হোক না কেন, তারা এই কাপটি চিরকালের মত কখনো লাভ করতে পারবে না। ফুটবল এসোসিয়েশন ওয়াণ্ডারার্স দলের এই সর্ত্তে রাজী হন। ফলে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের পর থেকে নিয়ম হয়—যতবার যে দলই এফ. এ. কাপ বিজয়ী হোক না কেন, এফ. এ. কাপ কখনো কোন দল চিরকালের মত লাভ করতে পারবে না।

প্রথমে যে এফ. এ. কাপটি দিয়ে খেলা সুরু হয়েছিল সেই কাপটি বার্মিংহামের একটা দোকান থেকে চুরি হয়ে যায় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। তখন আবার একটি নূতন কাপ তৈরী করা হয়। কিন্তু এই কাপটিও ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি লর্ড ফিনার্ডকে ফুটবল খেলার উন্নতির জন্য তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার চিহ্ন স্বরূপ উপহার দেওয়া হয়। সুতরাং এখন যে এফ. এ. কাপটি খেলা হয় এটা তৃতীয়বারের তৈরী।

প্রথম বছরের এফ. এ. কাপের প্রতিযোগিতায় মোট ১৫টি দল যোগ দেয়। ওয়াণ্ডারার্স দল ১-০ গোলে রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স দলকে পরাজিত করে এফ. এ. কাপ-এ জয়লাভ করে।

ইংলণ্ডের বাইরের দল হিসাবে এফ. এ. কাপ-এ প্রথম বিজয়ী হয় 'কার্ডিফ সিটি' ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে।

## প্রথম এশিয়ান গেমস্‌-এ ভারতীয় ফুটবল দলের সাফল্য

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ থেকে ১১ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত দিল্লীতে এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রথম এশিয়ান গেমস্‌ অনুষ্ঠিত হয়। এই এশিয়ান গেমস্‌-এর বিভিন্ন প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইরাণ, বার্ম্মা, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান, জাপান এবং ভারত এই ছয়টি রাষ্ট্র ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ৫ই, ৭ই এবং ১০ই মার্চ্চ এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় দলের জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের নির্ব্বাচিত করা হয়ঃ—

গোল—বি. এণ্টনি (বাঙ্গলা) ও ভরদ্বাজ (মহীশূর)। ব্যাক—এস. মান্না (বাঙ্গলা—অধিনায়ক) ও আজিজ (হায়দ্রাবাদ), এম. প্যাপেন (বোম্বাই) ও এস. চ্যাটার্জ্জী (বাঙ্গলা)। হাফব্যাক—এ. লতিফ (বাঙ্গলা), চন্দন সিং (বাঙ্গলা) ও এ. ঘোষ (বাঙ্গলা), লেঃ জোনস্‌ (সার্ভিসেস) ও টি. সম্মুখম (মহীশূর)। ফরোয়ার্ড—পি. ভেঙ্কটেশ (বাঙ্গলা), আর. গুহঠাকুরতা (বাঙ্গলা), মেওয়ালাল (বাঙ্গলা), আমেদ খাঁন (বাঙ্গলা), এস. নন্দী (বাঙ্গলা), এম. এ. সাত্তার (বাঙ্গলা), পি. বি. এ. সালে (বাঙ্গলা), নূর (হায়দ্রাবাদ), লায়েক (হায়দ্রাবাদ), লোগোনাথন (মাদ্রাজ) ও বেচন (উড়িষ্যা)।

ভারত প্রথম রাউণ্ডে ইন্দোনেশিয়াকে ৩-০ গোলে, সেমিফাইন্যালে আফগানিস্তানকে ৩-০ গোলে এবং ফাইন্যালে ইরাণকে ১-০ গোলে পরাজিত করে ফুটবল খেলায় এশিয়ার মধ্যে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।

## কলম্বো কাপ বা কোয়াড্র্যাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতা

কলম্বো কাপ বা কোয়াড্র্যাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতা, যাকে বাঙ্গলায় চতুর্দ্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা বলা হয়, সুরু হয় ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে কলম্বোতে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে কলম্বোতে যে বিরাট প্রদর্শনী হয়, সেই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা ভারত, সিংহল, পাকিস্তান এবং বার্ম্মার মধ্যে ঐ প্রদর্শনীর এক বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে এক প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করেন। এই প্রদর্শনী খেলা সুরু হয়ে যাবার পর যোগদানকারী ঐ চারটি দলের কর্ম্মকর্ত্তারা বসে স্থির করেন যে, এই

প্রদর্শনী খেলাটি বাৎসরিক প্রতিযোগিতা হিসাবে খেলা হলে, একদিকে যেমন চারটি দেশের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে, অন্যদিকে বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়েরা পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেদের খেলার মান আরও উন্নত করতে পারবেন। ফলে এই প্রতিযোগিতা প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। যোগদানকারী চারটি দেশের মধ্যে পর পর এক এক বছর, এক এক দেশে খেলা হবে বলে প্রতিনিধিরা স্থির করেন।

বিজয়ী দলকে যে কাপটি দেওয়া হয় সেটি সিংহল ফুটবল এসোসিয়েশন দান করেন। কলম্বোতে প্রথমে খেলা হয় বলেই কাপটির নাম 'কলম্বো কাপ' বলা হয় এবং চারটি দেশের মধ্যে খেলাটি সীমাবদ্ধ বলে এর অপর এক নাম, কোয়াড্র্যাঙ্গুলার বা চতুর্দ্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা।



প্রথম কোয়াড্র্যাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ভারতীয় দল

ভারত, পাকিস্তান, বার্ম্মা এবং সিংহলের মধ্যে লীগ প্রথায় প্রতিযোগিতাটি পরিচালিত হয়। প্রত্যেক দলকে অপর দলের সঙ্গে একবার করে খেলতে হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক দলকেই তিনটি করে খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। জয়ী হলে ২ পয়েন্ট এবং অমীমাংসিত ভাবে শেষ হলে ১ পয়েন্ট পাওয়া যায়। এই ভাবে যে দল সব থেকে বেশী পয়েন্ট লাভ করে সেই দল জয়ী হয়। যদি একাধিক দল সমান পয়েন্ট লাভ করে শীর্ষস্থান অধিকার করে, তাহলে সেই দলগুলি যুগ্মভাবে জয়ী বলে সাব্যস্ত হয়।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে কলম্বোতে প্রথম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় দল গঠন করা হয় নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের নিয়ে ঃ—

গোল—বি. এণ্টনি ( বাঙ্গলা ) ও ভরদ্বাজ ( মহীশূর )। ব্যাক—এস. মান্না ( অধিনায়ক ), বি. বসু ( বাঙ্গলা ) ও আজিজ ( হায়দ্রাবাদ )। হাফব্যাক—চন্দন সিং, লতিফ, এস. সর্ব্বাধিকারী, এস. রায় ( বাঙ্গলা ) ও নূর ( হায়দ্রাবাদ )। ফরোয়ার্ড—ভেঙ্কটেশ, আর. গুহঠাকুরতা, সাত্তার, মেওয়ালাল, জে. এণ্টনি ( বাঙ্গলা ), মঈন ও লায়েক ( হায়দ্রাবাদ )।

ভারত সিংহল ও বার্ম্মাকে পরাজিত করলেও পাকিস্তানের সঙ্গে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করায় পাকিস্তান ও ভারত উভয় দলই ৫ পয়েণ্ট লাভ করে যুগ্মভাবে বিজয়ী হয়।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বছরের প্রতিযোগিতা হয় রেঙ্গুনে। ভারতীয় দল গঠিত হয় ঃ—

গোল—সঞ্জীব ( বোম্বাই ) ও ভরদ্বাজ ( বাঙ্গলা )। ব্যাক—এস. মান্না ( অধিনায়ক—বাঙ্গলা ), কে. এস. মনি ( বিহার ) ও আজিজ ( হায়দ্রাবাদ )। হাফব্যাক—চন্দন সিং, এ. দত্ত, গোকুল ( বাঙ্গলা ), জি. মুথু ( মহীশূর ) ও এ. প্যাট্রিক ( হায়দ্রাবাদ )। ফরোয়ার্ড—ভেঙ্কটেশ, সাত্তার, আমেদ ( বাঙ্গলা ), শঙ্কর, পেরেরা, এন. ডি' সুজা ( বোম্বাই ), থঙ্গরাজ ( মহীশূর ) ও জয়রাম ( সার্ভিসেস )।

ভারত বার্ম্মাকে ৪-২ গোলে, সিংহলকে ২-০ গোলে এবং পাকিস্তানকে ১-০ গোলে পরাজিত করে পুরোপুরি ৬ পয়েণ্ট লাভ করে পর পর দুবছর কলম্বো কাপ-এ জয়লাভ করবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করে।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় বছরের প্রতিযোগিতা হয় কলকাতায়। ১৮ই ডিসেম্বর থেকে ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ক্যালকাটা মাঠে খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ঃ—

গোল—এস. শেঠ ( বাঙ্গলা )। ব্যাক—আজিজ ( হায়দ্রাবাদ ) ও এস. মান্না ( অধিনায়ক—বাঙ্গলা )। হাফব্যাক—পার্ল ( সার্ভিসেস ), চন্দন সিং ( বাঙ্গলা ), নূর ও সালাম ( হায়দ্রাবাদ )। ফরোয়ার্ড—ভেঙ্কটেশ, সাত্তার, আমেদ ( বাঙ্গলা ), জগন্নাথন, পুরনবাহাদুর ( সার্ভিসেস ), মঘিন, লায়েক ( হায়দ্রাবাদ ) নেভিল ডি' সুজা ( বোম্বাই ) ও এণ্টনি ( মহীশূর )।

ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে, বার্ম্মার বিরুদ্ধে ২-১ গোলে এবং সিংহলের সঙ্গে ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ ক'রে মোট ৫ পয়েণ্ট

লাভ করে এবং উপর্য্যুপরি তিন বছর অপরাজিত অবস্থায় কলম্বো কাপ জয়লাভ করবার গৌরব লাভ করে।

## আন্তঃরাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতা বা সন্তোষ ট্রফি

ভারতের বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে আন্তঃরাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতা বা সন্তোষ ট্রফির খেলাই বর্ত্তমানে সব থেকে আকর্ষণীয়। বিভিন্ন রাজ্যদল অর্থাৎ বিভিন্ন রাজ্যের বাছাই করা শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত দলগুলির মধ্যেই সাধারণতঃ এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ভারত ভাগ হবার আগে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশন সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা সুরু করবার জন্যে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কাছে প্রস্তাব করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশন, কিভাবে এই প্রতিযোগিতা চালানো হবে, তার একটা পরিকল্পনাও পেশ করেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ১৪ই এপ্রিল অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের যে চতুর্থ বার্ষিক সভা হয়, তাতে ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের প্রস্তাব আলোচনা করা হয়, কিন্তু এই সভায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী বোম্বাইয়ে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের পঞ্চম বার্ষিক সভায় ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের প্রস্তাব ও পরিকল্পনাকে আন্তঃরাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতা নাম দিয়ে গ্রহণ করা হয়।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দেই আন্তঃরাজ্য খেলা সুরু হয়ে যায়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই প্রতিযোগিতার খেলাগুলি বিভিন্ন ভাগে ( 'জোন'-এ ) ভাগ করে খেলা হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চ অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সভায় ঠিক হয় যে, এখন থেকে আন্তঃরাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতার সব খেলাগুলিই কোন একটা বিশেষ রাজ্যেই অনুষ্ঠিত হবে। যে রাজ্যে এই প্রতিযোগিতা হয় সেই রাজ্য-ফুটবল-এসোসিয়েশনকে প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচ বহন করবার দায়িত্ব নিতে হয়।

আন্তঃরাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে যে কাপটি দেওয়া হয়, সেই দেড় হাজার টাকা মূল্যের সুদৃশ্য কাপটি ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের দান। ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি স্বর্গীয় সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরীর স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এই কাপটি দেওয়া

হয়। সেই কারণে আন্তঃরাজ্য এই প্রতিযোগিতাটি 'সন্তোষ ট্রফি' নামেও প্রচলিত



সন্তোষ ট্রফি

এই প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে বিজিত দলটিকে যে কাপটি দেওয়া হয় সেটির নাম 'কমলা গুপ্তা কাপ'। আই. এফ. এ.-র প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ এস্. কে. গুপ্ত তাঁর স্বর্গীয়া পত্নীর স্মৃতিরক্ষার জন্য এই কাপটি দান করেন।

প্রতি বছর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে প্রথম বছরের প্রতিযোগিতা হয় কলকাতায় এবং বাঙ্গলা দল প্রথম বছরেই সন্তোষ ট্রফিতে জয়লাভ করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য ১৯৪২ ও ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকার পর, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ থেকে আবার প্রতিবছরই সন্তোষ ট্রফির খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

## ডুরাণ্ড কাপ

বর্ত্তমানে ভারতে যে ক'টি শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আছে, তার মধ্যে ডুরাণ্ড কাপ অন্যতম। কিন্তু ভারতের সর্ব্বপ্রথম বিখ্যাত ফুটবল প্রতিযোগিতা হিসাবে ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতা অন্যান্য শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতাগুলি থেকে আরও বেশী স্মরণীয়।

উচ্চপদস্থ সুদক্ষ বৃটিশ কর্ম্মচারী স্যার হেনরী মার্টিমার ডুরাণ্ড এই প্রতি-যোগিতার প্রথম সূত্রপাত করেন ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে। স্যার হেনরী ভারতের বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী, এবং বৃটিশরাজ্যের রাষ্ট্রদূত হিসাবে পারস্য, মাদ্রিদ ও ওয়াশিংটনে চাকুরী করেছিলেন।



স্যার হেনরী মার্টিমার ডুরাণ্ড

স্যার মার্টিমার প্রথমে যে কাপটি দান করেছিলেন সেটি ছিল এবোনি ধাতু দিয়ে তৈরী দণ্ডের উপর স্থাপিত একটা সুদৃশ্য রৌপ্য বল। ঐ বলটার

উপরে বিজয়ীদল এবং বিজয়ীদলের খেলোয়াড়দের নাম খোদাই করে রাখা হতো।

এই সময়ে নিয়ম ছিল, যে-দল পর পর তিন বার এই কাপটি-তে জয়লাভ করতে পারবে তারা চিরকালের মত কাপটি লাভ করবে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পর পর তিন বছর 'হাইল্যাণ্ড ইনফ্যান্টি' দল ডুরাণ্ড কাপ-এ জয়লাভ করে চিরকালের মত কাপটি লাভ করে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্যার মার্টিমার ঠিক আগের স্থায় আবার আর একটি কাপ দান করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'ব্লাকওয়াচ' দল আবার পর পর তিন বছর জয়লাভ করে এই দ্বিতীয় কাপটিও চিরকালের মত লাভ করে।



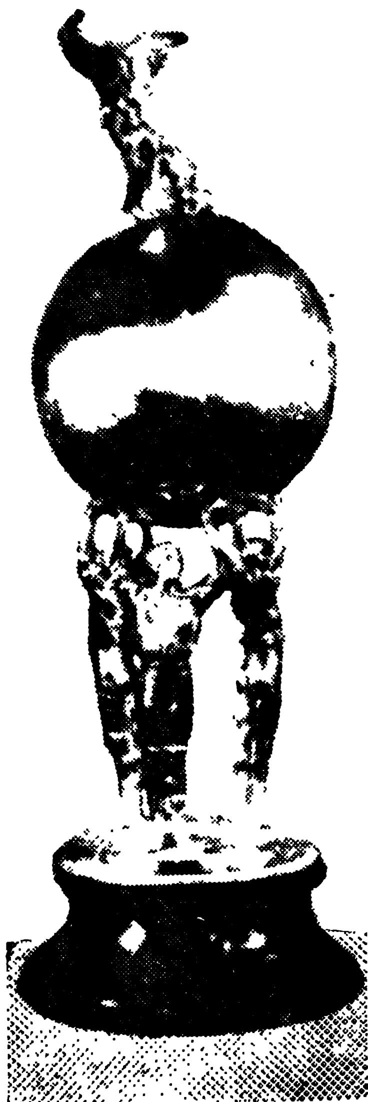
ডুরাণ্ড কাপ

স্যার মার্টিমার মহানুভবতার সঙ্গে তৃতীয়বারও আর একটি কাপ উপহার দেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করেন যে, এখন থেকে এই কাপটি 'চ্যালেঞ্জ কাপ' হিসাবে প্রচলিত থাকবে। অর্থাৎ এখন থেকে যে দল পর পর যতবারই ডুরাণ্ড কাপ-এ জয়লাভ করুক না কেন, এই কাপটি আর চিরকালের মত লাভ করতে পারবে না। কিন্তু যদি কোন দল পর পর তিন বছর জয়লাভ করে তবে তারা ডুরাণ্ড কাপের স্থায় একটা ছোট কাপ চিরকালের মত লাভ করবে।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের কর্ম্মচারীরা এবং সিমলার জনসাধারণ মিলে 'সিমলা ট্রফি' নাম দিয়ে একটা কাপ উপহার দেন। 'সিমলা ট্রফি' ডুরাণ্ড কাপের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তোলে। যে দল পর পর তিন বছর ডুরাণ্ড কাপ-এ জয়লাভ করবে তারা সিমলা ট্রফিটি চিরকালের মত লাভ করবে বলে আইন করা হয়।

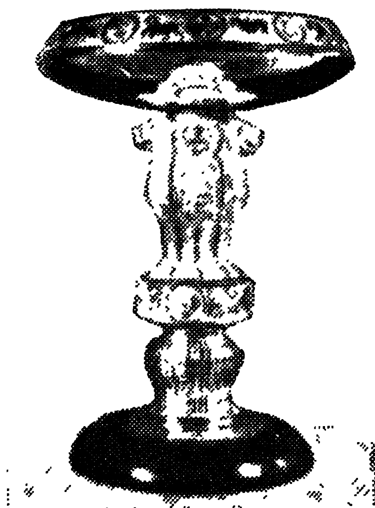
ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতা সুরু হবার পর প্রথম দিকে শুধু মাত্র সামরিক দলগুলিই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারতো। পরে অবশ্য ভারতের প্রথম শ্রেণীর সকল ফুটবল দলকেই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে দেওয়া হলেও

ডুরাণ্ড কাপ পরিচালনা কমিটি সেই সব দলের শক্তি সম্বন্ধে আগে থেকে জেনে নিয়ে তবে যোগদান করবার অনুমতি দিতেন।



. ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ডুরাণ্ড কাপ সুরু হওয়া থেকে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিমলার 'এনানডেল' (Anandale) মাঠে ডুরাণ্ড কাপের খেলা হতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোন খেলা হয় না।

দীর্ঘ ১০ বছর পর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সময়োচিত সাহায্যে এই প্রতিযোগিতা সিমলার পরিবর্ত্তে দিল্লীতে আবার আরম্ভ হয়েছে।



সিমলা ট্রফি

রাষ্ট্রপতি কাপ

১৯৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে যে দল প্রতিবছর ডুরাণ্ড কাপ-এ জয়লাভ করে তারা রাষ্ট্রপতির দেওয়া একটি সুদৃশ্য রৌপ্য কাপ চিরকালের মত লাভ করে থাকে।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দ থেকে 'রবার্ট হজ্ চ্যালেঞ্জ কাপ' নামে আরও একটি কাপ 'ডুরাণ্ড কাপ' প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবার্ট ই. হজ্ তাঁর লোকান্তরিত পিতা রবার্ট হজের নামে এই সুদৃশ্য কাপটি দান করেছেন। সেমি-ফাইন্যালে পরাজিত দল-গুলির মধ্যে রবার্ট হজ্ চ্যালেঞ্জ কাপের খেলা হয়। এই খেলায় যে দল জয়লাভ করে তারাই ঐ কাপটি লাভ করে।


রবার্ট হজ্ চ্যালেঞ্জ কাপ

ডুরাণ্ড কাপ-এ সর্ব্বপ্রথম জয়লাভ করবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করে 'রয়্যাল স্কটস্ ফুসিলার্স' দল।

প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড়-দের নিয়ে গঠিত ভারতীয় এবং অসামরিক দল হিসাবে 'মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব' ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ডুরাণ্ড কাপ-এ জয়লাভ করে।

## রোভার্স কাপ

রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা-গুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। রোভার্স কাপের খেলা ডুরাণ্ড কাপের পর সুরু হলেও আই. এফ. এ. শীল্ড খেলার আগেই সুরু হয়েছে। আই. এফ. এ. শীল্ড প্রতিযোগিতা সুরু হবার দুবছর আগে অর্থাৎ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে রোভার্স কাপের খেলা আরম্ভ হয়।

বোম্বাইয়ের রোভার্স ক্লাবের উৎসাহ এবং চেষ্টাতেই রোভার্স কাপের সৃষ্টি। কিন্তু রোভার্স ক্লাব যে-কাপটি দান করেছিলেন তার কোন অস্তিত্ব বর্ত্তমানে নেই। এখন যে রোভার্স কাপটির খেলা হয় সেটি পার্সি ব্রাডলীর পরিকল্পনায় তৈরী। ফুট ১৮ ইঞ্চি ব্যাসের কারুকার্য্যখচিত এই কাপটিকে কেন্দ্র করে বোম্বাইয়ের ফুটবল মরসুম সরগরম হয়ে ওঠে। পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিয়েশনের রোভার্স কাপ-ই সর্ব্বপ্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতা।

রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতা সুরু হবার পর প্রথম কয়েক বছর শুধু মাত্র সামরিক দলগুলির মধ্যেই খেলা সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য একমাত্র সামরিক

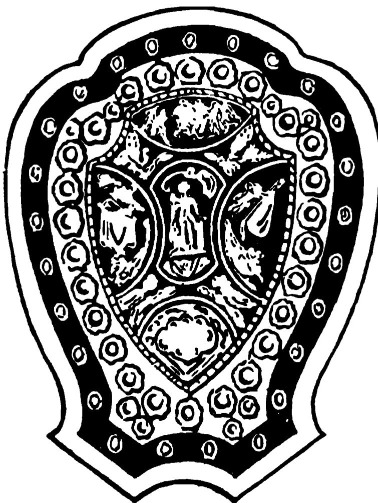
দলগুলিই শুধু খেলবে, তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ থেকে বিভিন্ন প্রদেশের শক্তিশালী ফুটবল দলগুলিকে প্রথম এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার জন্যে আহ্বান করা হয়।

রোভার্স কাপ-এ সর্ব্বপ্রথম বিজয়ী হবার গৌরব লাভ করে প্রথম ব্যাটেলিয়ান উরসেষ্টার রেজিমেণ্ট দল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সামরিক দল রোভার্স কাপ বিজয়ী হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতীয় ও অসামরিক দল হিসাবে বাঙ্গালোর মুসলিম দল রোভার্স কাপ বিজয়ী হবার কৃতিত্ব লাভ করে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হায়দ্রাবাদ সিটি পুলিশ দল পর পর পাঁচ বছর রোভার্স কাপ-এ জয়লাভ করে ভারতীয় দল হিসাবে এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করে।

রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতা সুরু হওয়া থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের জন্যে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকে এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে একবার ফাইন্যাল খেলা অসমাপ্ত থাকে। এ ছাড়া রোভার্স কাপ-এর খেলা প্রতিবছরই বোম্বাইয়ে সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

## আই. এফ. এ. শীল্ড

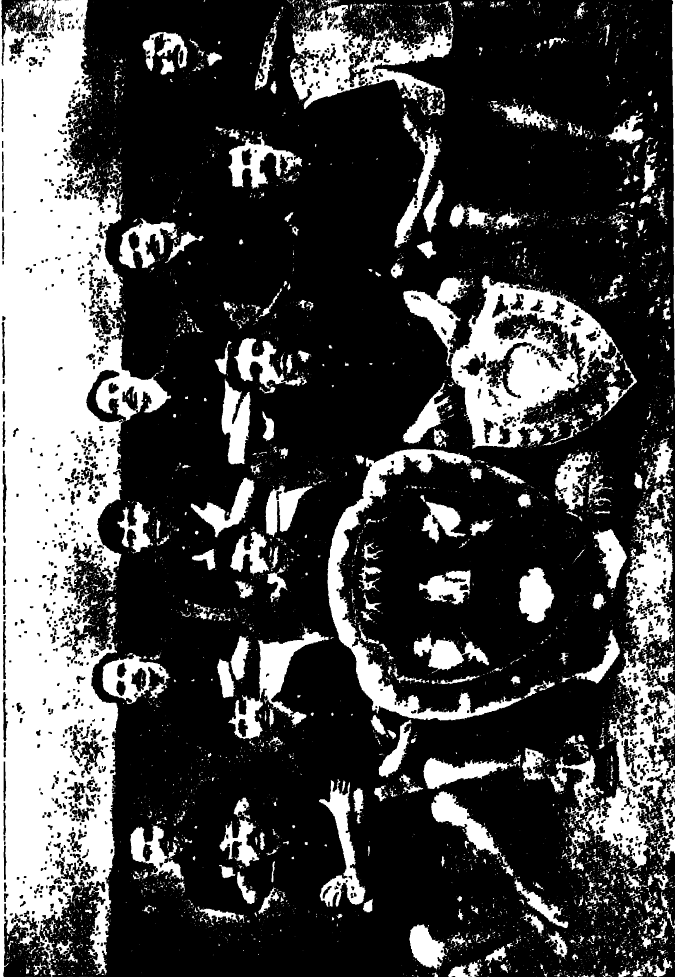
ভারতের বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে আই. এফ. এ. শীল্ড যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারতের ফুটবল ইতিহাসে আই. এফ. এ. শীল্ড অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। ভারতের সকল প্রান্তের এবং ভারতের বাইরের বিভিন্ন শক্তিশালী সামরিক, বেসামরিক, ভারতীয় ও অভারতীয় ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত দলগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যে দল আই. এফ. এ. শীল্ড জয়লাভ করে, তারা আজও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল দল হিসাবে স্বীকৃত হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আই. এফ. এ. শীল্ড খেলা সুরু হয়



আই. এফ. এ. শীল্ড

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে

ডালহৌসী ক্লাবের সম্পাদক এ. আর. ব্রডিন, ডালহৌসী ক্লাবের দক্ষ খেলোয়াড় বি. আর. সি. লিণ্ডসে, ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ওয়াটসন এবং শোভাবাজার ক্লাবের এন. সর্ব্বাধিকারী এক সভায় মিলিত হয়ে স্থির করেন যে, তাঁরা



অবিস্মরণীয় কীর্তির অধিকারী—১৯১১ সালের আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দল

'ট্রেডস কাপ' থেকে বড়ো এমন একটা ফুটবল প্রতিযোগিতা স্থুরু করবেন যাতে স্থানীয় ক্লাবগুলি ছাড়াও ভারতের সকল শক্তিশালী দলগুলি এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারে। তাঁরা আরও মনে করলেন যে,

এ জাতীয় প্রতিযোগিতা হলে খেলারও উন্নতি হবে এবং জনসাধারণ ভালো খেলা দেখতে পেয়ে ফুটবল খেলার দিকে আরও বেশী আকৃষ্ট হবে।

এই মহৎ উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্য করেন কুচবিহার ও পাতিয়ালার মহারাজা, স্যার এ. এ. আপকার এবং ডালহৌসী ক্লাবের জনৈক সভ্য।

জে. সুদারল্যাণ্ড নামে একজন উৎসাহী ভদ্রলোক লণ্ডনের মেসার্স এলকিংটন এ্যাণ্ড কোম্পানীর কাছ থেকে তাঁদের কলকাতার প্রতিনিধি মেসার্স ওয়াল্টার লক্ এ্যাণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করে আই. এফ. এ. শীল্ড তৈরী করেন।

আই. এফ. এ. শীল্ড খেলার প্রথম বছর অর্থাৎ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিযোগিতা দুইভাগে ভাগ করে খেলানো হয়। একটি বিভাগের খেলা লক্ষ্ণৌতে এবং অপর বিভাগের খেলা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। সবসমেত ১৩টি দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। লক্ষ্ণৌ বিভাগে রয়্যাল আইরিশ রাইফেল্‌স এবং কলিকাতা বিভাগে ফিফ্‌থ ওয়েষ্টার্ণ ডিভিসন আর. এ. জয়লাভ করে কলকাতার ডালহৌসী মাঠে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই খেলায় রয়্যাল আইরিশ রাইফেল্‌স দল জয়লাভ করে সর্ব্বপ্রথম আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী হয়। প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় একমাত্র ভারতীয় ক্লাব হিসাবে শোভাবাজার ক্লাব যোগদান করে।

এর পর থেকে আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলা কলকাতায় প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের পরিচালনায় এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মোহনবাগান দল আই. এফ. এ. শীল্ড-এ জয়লাভ করে ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করে।

## ফুটবল লীগ খেলা

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৮টি দল নিয়ে যে ফুটবল লীগ খেলা কলকাতায় সুরু হয়েছিল, বর্ত্তমানে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন দ্বারা পরিচালিত সেই ফুটবল লীগ খেলা শুধু ভারতে নয়, সমস্ত এশিয়ার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ববৃহৎ লীগ প্রতিযোগিতা হিসাবে স্বীকৃত।

কলকাতায় ফুটবল লীগ খেলা সৃষ্টি হবার আগে আই. এফ. এ. পরিচালিত আই. এফ. এ. শীল্ড., ট্রেডস কাপ এবং ইলিয়ট শীল্ড—এই তিনটি মাত্র প্রতিযোগিতা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ফুটবল ক্লাবের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে

যাওয়ায় এবং প্রতিষ্ঠিত ক্লাবগুলি আরও বেশী ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে ইচ্ছুক হওয়ায়, ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন ফুটবল লীগ খেলার প্রবর্ত্তন করেন। ডালহৌসী ক্লাব, ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব, রেঞ্জার্স ক্লাব, হাওড়া ইউনাইটেড ক্লাব এবং ওয়াই. এম. সি. এ. ক্লাবের উদ্যোগ এবং চেষ্টাতেই কলকাতায় ফুটবল লীগ খেলা প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয়।

মেসার্স ওয়াল্টার লক্ এ্যাণ্ড কোম্পানী সহৃদয়তার সঙ্গে ফুটবল লীগ কাপটি দান করেন। প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় মাত্র ৫টি বেসামরিক ও ৩টি সামরিক দল যোগদান করে।



ফুটবল লীগ কাপ

লীগ খেলা সুরু হবার প্রথম থেকেই এই খেলা পরিচালনা করবার দায়িত্ব ছিল যোগদানকারী ক্লাবগুলি থেকে এক এক জন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি কমিটির ওপর। এই কমিটি নিজেদের মধ্যে থেকেই একজন সম্পাদক নির্ব্বাচিত করে নিতেন। আই. এফ. এ.-র এই লীগ খেলার জন্যে সরকারীভাবে কোন দায়িত্ব না থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে আই. এফ. এ.-ই অনেকাংশে লীগ খেলা পরিচালনার ব্যবস্থা করেতেন।

ফুটবল লীগ খেলার একটা উল্লেখযোগ্য সংবাদ হলো যে, খেলাধুলা পরিচালনার জন্যে যে রেফারীর প্রয়োজন হতো সেই রেফারী ঠিক করে দিতেন যে দল-দুটির মধ্যে খেলা হতো তাঁরাই। যদি কখনো রেফারী নির্ব্বাচন বিষয়ে দুই দলের মধ্যে মতের অমিল হতো, তখন লীগ কমিটির সম্পাদকের উপর রেফারী নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া হতো।

লীগ খেলা সৃষ্টি হবার সময়-থেকে একমাত্র ইউরোপীয় দলগুলিরই প্রথম বিভাগীয় লীগ প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার অধিকার ছিল। প্রত্যেক দলকে দুবার করে অন্যদলগুলির সঙ্গে খেলতে হতো।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে মোহনবাগান ক্লাব প্রথম

বিভাগীয় লীগ প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার অধিকার লাভ করে। ফলে লীগ প্রতিযোগিতার আইন পরিবর্ত্তন করা হয়। এই সময় থেকে আইন হয় যে, দুটি করে ভারতীয় দল প্রথম বিভাগীয় লীগে খেলতে পারবে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ফুটবল লীগ খেলায় এক যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন হয়। এই বছর থেকে যে-কোন সংখ্যক ভারতীয় ফুটবল দল প্রথম বিভাগীয় লীগে খেলার যোগ্যতা লাভ করলেই খেলতে পারবে বলে নূতন আইন তৈরী হয়। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের চেষ্টা ও উদ্যমেই এই পরিবর্ত্তন অনেকাংশে সম্ভব হয়েছিল, একথা বলা যেতে পারে।

এ ছাড়াও ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয়, যেমন দ্বিতীয় বিভাগের যোগদানকারী দলগুলি থেকে দুজন প্রতিনিধিকে লীগ কমিটির সভ্য করে নেওয়া হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের আগে দ্বিতীয় বিভাগীয় দলের সভ্যদের লীগ কমিটির সভ্য হবার অধিকার ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগীয় লীগ প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছিল ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। দ্বিতীয় বিভাগীয় লীগ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে যে কাপটি দেওয়া হয় সেটি মেসার্স গ্রামোফোন কোম্পানী দান করেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় বিভাগের এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ বিভাগের লীগ খেলা আরম্ভ হয়। তৃতীয় বিভাগের লীগ কাপটিকে 'মিত্র কাপ' এবং চতুর্থ বিভাগের লীগ কাপটিকে 'রাধানাথ কাপ' বলা হয়।

আন্তঃ-অফিস লীগ খেলা সুরু হয় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে কলকাতা ফুটবল লীগ খেলার পরিচালনা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন গ্রহণ করেন।

প্রথম বিভাগীয় লীগ খেলার প্রথম বছর অর্থাৎ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে গ্লসেষ্টার দল ২৪ পয়েন্ট লাভ করে লীগ বিজয়ী হয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে মহমেডান স্পোর্টিং দল লীগ বিজয়ী হবার গৌরব লাভ করে। মহমেডান স্পোর্টিং দল ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পর পর পাঁচ বছর লীগ বিজয়ী হয়ে যে অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করে, সেই গৌরব আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন দল লাভ করতে পারেনি।

## ভারতীয় ফুটবল দলের বিদেশ সফর

ভারতীয় ফুটবল দলকে ভারতের বাইরে পাঠানোর সকল কৃতিত্বই ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসনের। ভারতীয় খেলোয়াড়দের এবং ভারতীয়

ফুটবল খেলার মর্য্যাদাকে ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশের কাছে প্রতিষ্ঠিত করবার পথপ্রদর্শক ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আই. এফ. এ. 'বেঙ্গল জিমখানা' নামে কলকাতার বিভিন্ন দল থেকে বাছাই-করা বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের একটি দলকে জাভায় পাঠান।



১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জাভা সফরকারী প্রথম সম্মিলিত বাঙ্গালী ফুটবল দল

এই দল একটি খেলাতেও পরাজিত না হয়ে দেশে ফিরে আসে। এ. বি রসার এই দলের ম্যানেজার, পঙ্কজ গুপ্ত সহকারী ম্যানেজার এবং মোহনবাগান ক্লাবের মণি দাশ এই দলের অধিনায়ক হয়ে যান। দলের অন্যান্য খেলো-

য়াড়েরা ছিলেন ঃ—গোল—পূর্ণ দাশ ( ইষ্টবেঙ্গল ) ; ব্যাক—প্রফুল্ল চ্যাটার্জ্জী ( ইষ্টবেঙ্গল ) এবং দীনেশ গুহ ( ঢাকা উয়াড়ী ) ; হাফব্যাক—ফণী মিত্র ( ভবানীপুর ), বি. ডি. চ্যাটার্জ্জী এবং মণি দাশ ( মোহনবাগান ) ; ফরোয়ার্ড —হেমাঙ্গ বসু ( ইষ্টবেঙ্গল ), রবি গাঙ্গুলী, মনা দত্ত, এফ. রহমান ( মোহন-বাগান ) এবং সামাদ ( ই. বি. রেলওয়ে )। রিজার্ভ—পি. চ্যাটার্জ্জী ( টাউন ক্লাব ) এবং এম. দত্ত রায় ( স্পোর্টিং ইউনিয়ান )।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এ. বি. রসার একটি এংলো-ইণ্ডিয়ান বাছাই-করা দল নিয়ে জাভা ভ্রমণে যান। জো গ্যালব্রেথ এই দলের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এ. সামাদের নেতৃত্বে আবার একটি বাছাই-করা খেলোয়াড়ের দল জাভা ভ্রমণে যায়।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সরকারী ভাবে আই. এফ. এ. প্রথম সিংহলে দল পাঠায়। পঙ্কজ গুপ্ত ম্যানেজার এবং গোষ্ঠ পাল অধিনায়ক হিসাবে দলের সঙ্গে যান। এই দল অপরাজিত অবস্থায় দেশে ফিরে আসে। ৫টি খেলার মধ্যে ৪টিতে জয় ও ১টি খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। এই দলের খেলোয়াড়েরা ছিলেন ঃ—গোল—জে. সি. গুহ ( স্পোর্টিং ইউনিয়ান ) ও পি. ব্যানার্জ্জী ( হাওড়া ইউনিয়ান ) ; ব্যাক—জি. পাল ( মোহনবাগান ), এস. মজুমদার ( এরিয়ান্স ) এবং ডি. ঘোষ ( হাওড়া ইউনিয়ান ) ; হাফব্যাক—কে. নাসিম ( স্পোর্টিং ইউনিয়ন ), নূর মহম্মদ ( মহঃ স্পোর্টিং ), কে. গাঙ্গুলী ( ইষ্টবেঙ্গল ) এবং শিশির চক্রবর্ত্তী ( এরিয়ান্স ) ; ফরোয়ার্ড—এস. গুইন ( ভবানীপুর ), কে. ভট্টাচার্য্য ( মোহনবাগান ), এ. মজিদ ( ইষ্টবেঙ্গল ), এ. সামাদ (মোহনবাগান ) এবং এ. গাঙ্গুলী ( এরিয়ান্স )।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের চেষ্টায় এবং সাহায্যে প্রথম সমস্ত ভারতের বাছাই-করা খেলোয়াড়ের একটি দল দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণে যায়। মোহনবাগান ক্লাবের সন্মথ দত্ত এই দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হন। পি. কে. মুখার্জ্জী ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত হন। এই দলটি ১৯টি খেলায় যোগদান করে ১৮টিতে জয়লাভ করে ও মাত্র ১টি খেলায় পরাজিত হয়। দলের খেলোয়াড়েরা ছিলেন ঃ—গোল—পি. ব্যানার্জ্জী ( বাঙ্গলা ) ও মির হোসেন ( এন. ডব্লিউ. এফ. পি. ) ; ব্যাক—সন্মথ দত্ত, এস. মজুমদার ( বাঙ্গলা ) এবং মহম্মদ হোসেন ( দিল্লী ) ; হাফব্যাক—এস. চক্রবর্ত্তী, এন. গুহ, কে. নাসিম ( বাঙ্গলা ) এবং অখিল আমেদ ( দিল্লী ) ; ফরোয়ার্ড—এন ঘোষ, এ. গাঙ্গুলী, কে. ভট্টাচার্য্য ( বাঙ্গলা ), এস. লক্ষ্মীনারায়ণ এবং এম. রমানা ( মহীশূর )।



প্রথম সারা ভারতের বাছাই-করা খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকারী ভারতীয় ফুটবল দল

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া ফুটবল এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে আই. এফ. এ. কলকাতার বাছাই-করা খেলোয়াড়দের একটি দল অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণে পাঠায়। পঙ্কজ গুপ্ত ম্যানেজার হিসাবে এবং এম. দত্ত রায় অখেলোয়াড় অধিনায়ক



১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া সফরকারী আই. এফ. এ. দল

হিসাবে দলের সঙ্গে যান। মোহনবাগান ক্লাবের করুণা ভট্টাচার্য্যের উপর প্রকৃতপক্ষে দলের অধিনায়কের ভার দেওয়া হয়। এই সফরে আই. এফ. এ. দল ১৬টি খেলায় যোগ দিয়ে ৭টিতে জয়লাভ করে, ১টি খেলা অমীমাংসিতভাবে

শেষ হয় এবং বাকী ৮টি খেলায় পরাজিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যে ৫টি টেষ্ট খেলা হয় তার মধ্যে আই. এফ. এ. ১টি খেলায় জয়লাভ করে, ১টি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় এবং বাকী ৩টি টেষ্টে পরাজিত হয়। এই সফরের দলটি গঠিত হয় নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের নিয়ে:—গোল—কে. দত্ত (মোহনবাগান) ও আর রোজারিও (ই. বি. রেলওয়ে); ব্যাক—পি. দাশগুপ্ত (ইষ্টবেঙ্গল), জুম্মা খাঁন (মহঃ স্পোর্টিং) এবং সি. ম্যাক্‌গুইরি (কাষ্টমস); হ্যাফব্যাক—এ. নন্দী, বি. সেন (ইষ্টবেঙ্গল), সি. রেবেলো (কাষ্টমস), প্রেমলাল এবং বি. মুখার্জ্জী (মোহনবাগান); ফরোয়ার্ড—নূর মহম্মদ, এ. রহিম (মহঃ স্পোর্টিং), আর. ল্যামসডেন (রেঞ্জার্স), এস. জোসেফ (কালীঘাট), কে. ভট্টাচার্য্য ও এস. চৌধুরী (মোহনবাগান) এবং কে. প্রসাদ (এরিয়ান্স)।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে সরকারীভাবে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের পরিচালনায় ভারতীয় দল প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ভারতীয় দলের জন্যে যেসব খেলোয়াড়েরা নির্ব্বাচিত হন তাঁরা হলেন:—গোল—কে. ভি. ভরদ্বাজ (মহীশূর) এবং সঞ্জীব কে. উচিল (বোম্বাই); ব্যাক—এস. মান্না, তাজ মহম্মদ (বাঙ্গলা) এবং প্যাপেন (বোম্বাই); হাফব্যাক—এস. এ. বসীর (মহীশূর), টি. আও (অধিনায়ক), মহাবীর প্রসাদ, এ. নন্দী এবং এস. এম. কাইজার (বাঙ্গলা); ফরোয়ার্ড—বি. এন. বজ্রভেলু, এম. আমেদ খাঁন, এস. রমন, কে. পি. ধনরাজ (মহীশূর), পি. পরাব (বোম্বাই), এস. মেওয়ালাল, এস. নন্দী এবং রবি দাস (বাঙ্গলা)। এম. দত্ত রায় ম্যানেজার, রামস্বামী আয়ার সহকারী ম্যানেজার এব বি. ডি. চ্যাটার্জ্জী শিক্ষক হিসাবে দলের সঙ্গে যান।

অলিম্পিকের খেলায় ভারত দুর্ভাগ্যবশতঃ ফ্রান্সের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হয়। এই সফরে ভারতীয় দল সবসমেত ১৪টি খেলায় যোগ দিয়ে ৯টিতে জয়ী হয়, ২টি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় এবং ৩টি খেলায় পরাজিত হয়।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে আফগান সরকারের আমন্ত্রণে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন বেশীর ভাগ ছাত্রদের নিয়ে গঠিত একটি দলকে কাবুল সফরে পাঠান। এই দলের খেলোয়াড়েরা ছিলেন:—গোল—এম. সরকার (বাঙ্গলা), সঞ্জীব কে. উচিল (বোম্বাই); ব্যাক—আজিজ (হায়দ্রাবাদ) এবং চণ্ডোলা (দিল্লী); হাফব্যাক—লতিফ, এস. রায় (বাঙ্গলা), টি. সম্মুখম, এস. এ. বসীর (মহীশূর);

ফরোয়ার্ড—এস. ঘোষ, আবিদ হোসেন (অধিনায়ক), এস. মেওয়ালাল (বাঙ্গলা), বি. কাঞ্জিলাল (বিহার) এবং পূরণ বাহাদুর (সার্ভিসেস)। ম্যানেজার—রায় সাহেব বি. আর. কে. ট্যাণ্ডন।

এই দল তিনটি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২টিতে জয়ী হয় এবং ১টি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ভারতের বাছাই-করা খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত ১টি দলকে দূরপ্রাচ্য সফরে পাঠান। ভারতীয় দল রেঙ্গুন, হংকং ও ব্যাঙ্কক-এ সবসমেত ৮টি খেলায় যোগ দিয়ে অপরাজিত অবস্থায় স্বদেশে ফিরে আসে। ৮টি খেলার মধ্যে ৬টিতে জয় হয় এবং ২টি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। এম. দত্ত রায় ম্যানেজার হিসাবে এবং মোহন-বাগান দলের শৈলেন মান্না অধিনায়ক হিসাবে নির্ব্বাচিত হন।

ভারতীয় দল গঠিত হয় নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের নিয়ে:—গোল—কে. ভরদ্বাজ ও বি. এণ্টনি; ব্যাক—এস. মান্না, সুনীল চ্যাটার্জ্জী ও এম. প্যাপেন; হাফব্যাক—এম. ইউসুফ, লতিফ, এস. বসীর, চন্দন সিং ও টি. সম্মুখম; ফরোয়ার্ড—ভেঙ্কটেশ, আর. গুহঠাকুরতা, এস. মেওয়ালাল, এ. সত্তার, এম. আমেদ খাঁন, এস. নন্দী, পি. বি. এ. সালে এবং মঈন।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আর একটি ভারতীয় দলকে দূরপ্রাচ্য সফরে পাঠান। এই ভারতীয় দলটি সফরে ৯টি খেলায় যোগ দিয়ে ৫টি খেলায় জয়ী হয়, ২টি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় এবং ২টি খেলায় পরাজিত হয়।

এই ভারতীয় দলে নির্ব্বাচিত হন:—গোল—এম. ঘটক ও গুরুপ্রসাদ; ব্যাক—এম. প্যাপেন, বি. বসু ও এস. আজিজ; হাফব্যাক—টি. আও (অধিনায়ক), এস. সর্ব্বাধিকারী, নিক্কম ও নূর; ফরোয়ার্ড—ভেঙ্কটেশ, লায়েক, ধন বাহাদুর, পূরণ বাহাদুর, এ. সত্তার, জে. এণ্টনি, মঈন এবং এইচ. রাও।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে পুনরায় অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ভারতীয় দল পাঠান। ভারতীয় দলের জন্মে নির্ব্বাচিত হন:—গোল—কে. ভি. ভরদ্বাজ (মহীশূর) ও বি. এণ্টনি (বাঙ্গলা); ব্যাক—এস. মান্না (অধি-নায়ক), বি. বসু (বাঙ্গলা) এবং এস. কে আজিজুদ্দিন (হায়দ্রাবাদ); হাফব্যাক—এ. লতিফ, চন্দন সিং, এস. সর্ব্বাধিকারী, এস. রায় (বাঙ্গলা) এবং নূর (হায়দ্রাবাদ); ফরোয়ার্ড—ভেঙ্কটেশ, আর. গুহঠাকুরতা, এস. মেওয়ালাল, এ. সত্তার, এম. আমেদ খাঁন, পি. বি. এ. সালে, জে. এণ্টনি (বাঙ্গলা) এবং



১৯৫২ খৃষ্টাব্দে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যোগদানকারী ভারতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড় ও কর্ম্মকর্ত্তাগণ

কে. মঈন (হায়দ্রাবাদ)। এম. দত্ত রায় ম্যানেজার, বি. আর. কে. ট্যাণ্ডন কোষাধ্যক্ষ এবং এস. এ. রহিম শিক্ষক হিসাবে দলের সঙ্গে যান।

: ভারতীয় দল অলিম্পিকে প্রথম খেলাতেই যুগোশ্লাভিয়ার কাছে ১০-১ গোলে পরাজিত হয়। এ ছাড়া এই সফরে ভারতীয় দল আরও ১১টি খেলায় যোগদান করে ৮টি খেলায় পরাজিত হয়; ১টি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে এবং ২টি খেলায় জয়ী হয়। :

:১৯৫২ খৃষ্টাব্দেই ভারতীয় ফুটবল দল চতুর্দ্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বা কলম্বো কাপে যোগদান করে যুগ্মভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে জয়ী হয়। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত চতুর্দ্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত দ্বিতীয়-বার যোগদান করে ও বিজয়ী হয়।

এ ছাড়াও বেসরকারী ভাবে কয়েকটি ক্লাব ভারতের বাইরে কয়েকবার সফরে যায়, কিন্তু সেইসব সফরে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন বা অল ইণ্ডিয়া ফুটবল এসোসিয়েশনের কোন দায়িত্ব না থাকায় সে সফরগুলিকে কোন সরকারী সফর হিসাবে গণ্য করা হয় না।

## *বিদেশী ফুটবল দলের ভারত সফর*

ভারতীয় ফুটবল দলকে ভারতের বাইরে প্রথম পাঠানোর সকল কৃতিত্বই যেমন ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের, ঠিক তেমনি আবার ভারতের বাইরের ফুটবল দলগুলিকে ভারত সফরের ব্যবস্থা করানোর অধিকাংশ কৃতিত্বই ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের।

**সাউথ আফ্রিকান ইণ্ডিয়ান দল ঃ** ভারতের বাইরের প্রথম ফুটবল দল হিসাবে ১৯২২ সালে জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে সাউথ আফ্রিকান ইণ্ডিয়ান দল ভারত সফরে এসে কলকাতায় ৪টি প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করে। খেলার ফলাফল হয়—

| | | | |
|---|---|---|---|
| মোহনবাগান | (১) | এস. এ. ইণ্ডিয়ানস | (০) |
| ইউরোপীয়ান একাদশ | (০) | ঐ | (০) |
| ভারতীয় একাদশ | (৩) | ঐ | (০) |
| বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ | (৪) | ঐ | (০) |

**চীনা অলিম্পিক দল ঃ** ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে যোগদান করবার পথে চীনা অলিম্পিক ফুটবল দল ভারত সফরে আসে। কলকাতার

খেলাগুলিতে অংশ গ্রহণ করার আগে তারা বোম্বাইতেও একটি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। খেলাগুলির ফলাফল হলো ঃ—

| | | | |
|---|---|---|---|
| চীনা অলিম্পিক দল | (১) | ভারতীয় দল | (১) |
| ঐ | (২) | সিভিল ও মিলিটারী একাদশ | (১) |
| বোম্বাইতে ঐ | (৩) | বোম্বাই একাদশ | (৩) |

**ইসলিংটন করিনথিয়ান্স দল ঃ** ১৯৩৭ সালে আই. এফ. এর. চেষ্টায় লণ্ডনের বিখ্যাত ফুটবল দল ইসলিংটন করিনথিয়ান্স ভারতে খেলতে আসে। ভারতে অবস্থানকালে তারা ৩২টি খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই খেলাগুলির মধ্যে ২৭টি জয়, ৪টি ড্র ও একমাত্র ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের নিকট তারা ১—০ গোলে পরাজিত হয়।

**বার্ম্মা ফুটবল দল ঃ** ১৯৩৮ সালে এবং ১৯৪৮ সালে বার্ম্মা ফুটবল দল ভারতে খেলতে আসে এবং ঐ দুই সফরের খেলার ফলাফল হলো—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৩৮ সালে— | আই. এফ. এ. | (১) | বার্ম্মা | (০) |
| | বার্ম্মা | (৩) | মোহনবাগান | (২) |
| | বার্ম্মা | (১) | ভারতীয় একাদশ | (১) |
| ১৯৪৮ সালে— | আই. এফ. এ. | (১) | বার্ম্মা | (১) |
| | বার্ম্মা | (২) | আই. এফ. এ. | (১) |
| | আই. এফ. এ. | (১) | বার্ম্মা | (১) |
| | ঐ | (১) | ঐ | (১) |
| | বার্ম্মা | (২) | ইষ্টবেঙ্গল | (০) |

**চীনা অলিম্পিক দল ঃ** ১৯৪৮ সালে চীনা অলিম্পিক ফুটবল দল পুনরায় ভারত সফরে এসে কলকাতায় ৪টি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। খেলাগুলির ফলাফল হলো—

| | | | |
|---|---|---|---|
| চীনা অলিম্পিক দল | (৩) | মহমেডান স্পোর্টিং | (১) |
| ইষ্টবেঙ্গল | (২) | চীনা অলিম্পিক দল | (০) |
| মোহনবাগান | (০) | ঐ | (০) |
| আই. এফ. এ. | (১) | ঐ | (০) |

**হেলসিংবর্গ ফুটবল দল ঃ** ১৯৪৯ সালে সুইডেনের হেলসিংবর্গ ফুটবল দল মোহনবাগান ক্লাবের হীরক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ভারতে খেলতে আসে।

ভারতে অবস্থানকালে কলকাতায় তারা ৪টি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। খেলাগুলির ফলাফল হলো—

| | | | |
|---|---|---|---|
| হেলসিংবর্গ ফুটবল দল | (০) | মোহনবাগান | (০) |
| ঐ | (২) | ইষ্টবেঙ্গল | (০) |
| ঐ | (১) | আই. এফ. এ. | (০) |

**গোটেবার্গ ফুটবল দল:** ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে সুইডেনের গোটেবার্গ ফুটবল দল ভারতে খেলতে আসে। ৩টি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দলটি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। খেলাগুলির ফলাফল হলো—

| | | | |
|---|---|---|---|
| গোটেবার্গ | (২) | মোহনবাগান | (০) |
| ইষ্টবেঙ্গল | (১) | গোটেবার্গ | (০) |
| আই. এফ. এ. | (২) | গোটেবার্গ | (০) |

**বার্ম্মা ফুটবল দল:** ১৯৫২ সালে বার্ম্মা ফুটবল দল পুনরায় খেলতে আসে। এই সফরে তারা মাত্র একটি খেলায় অংশ গ্রহণ করে। খেলার ফলাফল হলো—আই. এফ. এ. (৪) বার্ম্মা (১)

**লিনজ্ এ্যাথলেটিক ক্লাব:** ১৯৫৩ সালে শীতকালে অষ্ট্রিয়ার লিনজ্ এ্যাথলেটিক ক্লাব ভারতে খেলতে আসে। ৩টি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দলটি অপরাজিত অবস্থায় দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। খেলার ফলাফল হলো—

| | | | |
|---|---|---|---|
| লিনজ্ এ্যাথলেটিক ক্লাব | (০) | মোহনবাগান | (০) |
| ঐ | (২) | আই. এফ. এ | (০) |
| ঐ | (৪) | এ. আই. এফ. এফ. | (০) |

**অফেনবেক ফুটবল ক্লাব:** ১৯৫৩ সালে জার্ম্মানীর অফেনবেক ফুটবল ক্লাব ভারতে খেলতে আসে। দুটি খেলায় অংশ গ্রহণ করে তারা দুটিতেই জয়ী হয়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| অফেনবেক ফুটবল ক্লাব | (২) | মোহনবাগান | (০) |
| ঐ | (১) | ইষ্টবেঙ্গল | (০) |

**গ্রেজার এ্যাথলেটিক ক্লাব:** ১৯৫৪ সালে জুলাই মাসে অষ্ট্রিয়ার গ্রেজার এ্যাথলেটিক ক্লাব ভারত সফরে আসে। মোট দুটি খেলায় তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং কোন খেলাতেই জয়লাভ করতে পারে না।

| | | | |
|---|---|---|---|
| মোহনবাগান | (২) | গ্রেজার এ্যাথলেটিক ক্লাব | (১) |
| আই. এফ. এ. | (১) | ঐ | (১) |

**আলমাম্না ইদ্‌রটস্‌ ক্লাবেন (এ. আই. কে.)ঃ** ১৯৫৪ সালে ডিসেম্বর মাসে সুইডেনের আলমাম্না ইদ্‌রটস্‌ ক্লাবেন দল খেলতে আসে। তিনটি খেলায় যোগদান করে ৩টি খেলাতেই তারা জয়লাভ করে। খেলার ফলাফল হলো—

| | | | |
|---|---|---|---|
| এ. আই. কে. | (৩) | মোহনবাগান | (১) |
| ঐ | (৩) | এ. আই. এফ. এফ. | (১) |
| ঐ | (১) | আই. এফ. এ. | (০) |

**রাশিয়ান ফুটবল দলঃ** ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাস ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯২২ সাল থেকে বহু বিদেশী দল একে একে ভারত সফরে এলেও ১৯৫৫ সালের আগে ভারতের মাটিতে কোন জাতীয় ফুটবল দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের কোন আন্তর্জাতিক খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫৫ সালে জানুয়ারী মাসে রাশিয়ার ফুটবল দল প্রায় দেড় মাসব্যাপী ভারত সফরে এসে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তিনটি আন্তর্জাতিক খেলাসহ মোট ১১টি খেলায় অংশ গ্রহণ করে এবং এই ১১টি খেলাতেই তারা বিজয়ী হয়। এই সফরে তারা ভারতের বিভিন্ন দলগুলির বিপক্ষে মোট ১০০টি গোল করে এবং তাদের স্বপক্ষে মাত্র ৪টি গোল হয়। রাশিয়ার ফুটবল খেলোয়াড়দের উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখে ভারতের সকল প্রান্তের দর্শকেরাই একবাক্যে স্বীকার করে নেন যে আজ পর্য্যন্ত যত বিদেশী দল ভারত সফরে এসেছে তাদের মধ্যে এই দলের শক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং খেলবার কৌশলও সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। খেলাগুলির ফলাফল হলো—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (১) | রাশিয়ান ফুটবল দল | (৭) এ. আই. এফ. এফ. প্রেসিডেন্টস একাদশ | (০) | হাজারীবাগ |
| (২) | ঐ | (৪) ঐ | (০) | বেনারস |
| (৩) | ঐ | (৯) ইউ. পি. বাছাই একাদশ | (০) | লক্ষ্ণৌ |
| (৪) | ঐ | (৪) ভারতীয় প্রধান সেনাপতির একাদশ | (০) | দিল্লী |
| (৫) | ঐ | (৯) চীফ কমিশনার্স একাদশ | (০) | ঐ |
| (৬) | ঐ | (৪) **প্রথম আন্তর্জাতিক খেলা** | (০) | ঐ |
| (৭) | ঐ | (৫) মধ্যপ্রদেশ প্রধান মন্ত্রীর একাদশ | (২) | জব্বলপুর |
| (৮) | ঐ | (৬) মাদ্রাজ একাদশ | (১) | মাদ্রাজ |
| (৯) | ঐ | (৮) ভারতীয় একাদশ | (০) | ঐ |
| (১০) | ঐ | (১১) ঐ | (০) | ত্রিবেন্দ্রাম |
| (১১) | ঐ | (৭) মহীশূর একাদশ | (১) | বাঙ্গালোর |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (১২) | রাশিয়ান ফুটবল দল | (২) ভারতীয় একাদশ | (০) বাঙ্গালোর |
| (১৩) | ঐ | (৫) হায়দ্রাবাদ একাদশ | (০) হায়দ্রাবাদ |
| (১৪) | ঐ | (৬) ভারতীয় একাদশ | (০) ঐ |
| (১৫) | ঐ | (১) বোম্বাই একাদশ | (০) বোম্বাই |
| (১৬) | ঐ | (৩) **দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক খেলা** | (০) ঐ |
| (১৭) | ঐ | (৩) মোহনবাগান | (০) কলকাতা |
| (১৮) | ঐ | (৩) ইষ্টবেঙ্গল | (০) ঐ |
| (১৯) | ঐ | (৩) **তৃতীয় আন্তর্জাতিক খেলা** | (০) ঐ |




## *ক্রিকেট খেলার জন্ম ও বিস্তার*

ফুটবল খেলার জন্ম-রহস্যের ন্যায় ক্রিকেট খেলার জন্মও যে কি ভাবে এবং কোথায় হয়েছিল, সে কথা আজও কেউ ঠিকভাবে বলতে পারেন নি। বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিকেরা তাঁদের নিজের দেশকেই ক্রিকেট খেলার জন্মস্থান বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এই খেলার জন্ম সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, ছোটদের খেলা হিসাবেই ক্রিকেট খেলা সুরু হয়েছিল এবং ক্রমে ক্রমে বয়স্ক লোকেরা খেলাটিকে গ্রহণ করেছিলেন।

যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয়, ইংলণ্ডই ক্রিকেট খেলার জন্মস্থান। কেউ কেউ বলেন যে এই খেলাটির নাকি **ফ্রান্সের 'কর্কেট' খেলা থেকে সৃষ্টি**। স্রাট্ নামে একজন বিশেষজ্ঞ এই খেলার জন্ম সম্বন্ধে গবেষণা করে বলেন যে, প্রাচীনকালে যে **ক্লাব বল** খেলা ছিল তা থেকেই ক্রিকেট খেলার

সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই ক্লাব বল খেলা যে কি নিয়মে হতো, সেটা ঠিক জানা যায় না। লণ্ডনের কিংস লাইব্রেরীতে ক্রিকেট খেলার ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দের একটা ছবি দেখা যায়। এই ছবি থেকেই ইংলণ্ডের ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দের আগে থেকেই ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলা প্রচলিত ছিল।

ক্রমশঃ খেলাটি ইংলণ্ডে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, সকলেই এই খেলা খেলবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। তারা সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলে দিনরাত ক্রিকেট খেলায় মেতে থাকতে সুরু করে। খেলার নেশায় তীরধনুক ছোঁড়া পর্য্যন্ত তারা ছেড়ে দেয়। কিন্তু এই সময়ে বন্দুকের আবিষ্কার না হওয়ায় তীরধনুকই ছিল যুদ্ধের একমাত্র অস্ত্র। ইংলণ্ডের রাজারা দেখলেন ক্রিকেট খেলার নেশায় এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, যদি কোন যুদ্ধ বাধে তাহলে ইংলণ্ডে ভালো তীরধনুক-ছোঁড়া-জানা লোক পাওয়াই কষ্টকর হয়ে উঠবে। দেশের অমঙ্গলের ভয়ে ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দ থেকেই ইংলণ্ডের রাজারা এই খেলাটিকে বন্ধ করার চেষ্টা করতে থাকেন। ১৪৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ এডওয়ার্ড যখন ইংলণ্ডের রাজা, তখন তিনি আইন করে ক্রিকেট খেলাকে দেশ থেকে তুলে দিলেন। চতুর্থ এডওয়ার্ড আইন করেন, যে লোক এই খেলা খেলবে তাকে ৫০ শিলিং জরিমানা ও দুবছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং যার জমিতে এই খেলা হবে তাকে ১০০ শিলিং জরিমানা ও তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। এই আইন এডওয়ার্ডের রাজত্বকাল শেষ হবার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে বলবৎ ছিল।

ক্রমশঃ বিভিন্ন রাজার রাজত্বকালে এই আইনের কঠোরতা কমতে কমতে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে আবার ক্রিকেট খেলা ইংলণ্ডের জনসাধারণ আনন্দের সঙ্গেই খেলতে সুরু করে। কিন্তু ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্রিকেট খেলার তাড়াতাড়ি তেমন উন্নতি বা প্রসার হয় না। কেবল রবিবারে ছুটির দিনে কিছু কিছু যুবকেরা খেলাটি খেলতে থাকে।

**ক্রিকেট খেলার যখন প্রথম সৃষ্টি হয় তখন এই খেলার কোন উইকেট পুঁতে খেলা হতো না।** যেখানে খেলা হতো সেখানে গোল করে গর্ত্ত খুঁড়ে নেওয়া হতো এবং ঐ গর্ত্তের ধারে একজন খেলোয়াড় ব্যাট হাতে নিয়ে দাঁড়াতো। ঐ গর্ত্তের কিছুদূরে থেকে একজন খেলোয়াড় বলটাকে গর্ত্তের দিকে গড়িয়ে দিতো। ব্যাট নিয়ে যে খেলোয়াড় খেলছে সে যদি বলটাকে গর্ত্তের মধ্যে পড়ার আগে ব্যাট দিয়ে মেরে সরিয়ে দিতে না পারতো, তাহলে আউট

হয়ে যেতো। **১৭০০ খৃষ্টাব্দ থেকে উইকেট পুঁতে খেলার সৃষ্টি হয়** এবং ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ থেকে তিনটি ষ্টাম্প পুঁতে খেলার নিয়ম চালু হয়।

**প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা সুরু হয় ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে কেণ্ট এবং সারের মধ্যে।** ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন ক্রিকেট ক্লাব ক্রিকেট খেলার কিছু নূতন আইন প্রচলন করেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্রিকেট খেলার যে ষ্টাম্প-গুলি ব্যবহার হতো তার মাপ ছিল ২২" ইঞ্চি × ৬" ইঞ্চি। এই মাপকে বাড়িয়ে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে করা হয় ২৪" ইঞ্চি × ৭" ইঞ্চি। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে এই মাপকে আবার পরিবর্ত্তন করে করা হয় ২৬" ইঞ্চি × ৭" ইঞ্চি এবং **১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ২৭" ইঞ্চি × ৮" ইঞ্চি করে উইকেটে দুটো বেল লাগানোর নিয়ম চালু হয়।**

ক্রিকেট খেলাকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির ব্যাপারে ইংলণ্ডের মেরিলীবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাবের দান সর্ব্বাধিক। মেরিলীবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাবই বর্ত্তমানে সমস্ত পৃথিবীর ক্রিকেট খেলার সর্ব্বোচ্চ আদালত। এই মোরিলীবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাবের প্রথম নাম ছিল **আর্টিলারী গ্রাউণ্ড ক্লাব।** ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে আর্টিলারী গ্রাউণ্ড ক্লাব নাম পরিবর্ত্তন করে রাখা হয় **হোয়াইট কনডুইট ক্রিকেট ক্লাব** এবং ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ থেকে 'হোয়াইট কনডুইট ক্রিকেট ক্লাব' নাম তুলে দিয়ে **মেরিলীবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাব** নাম রাখা হয়।

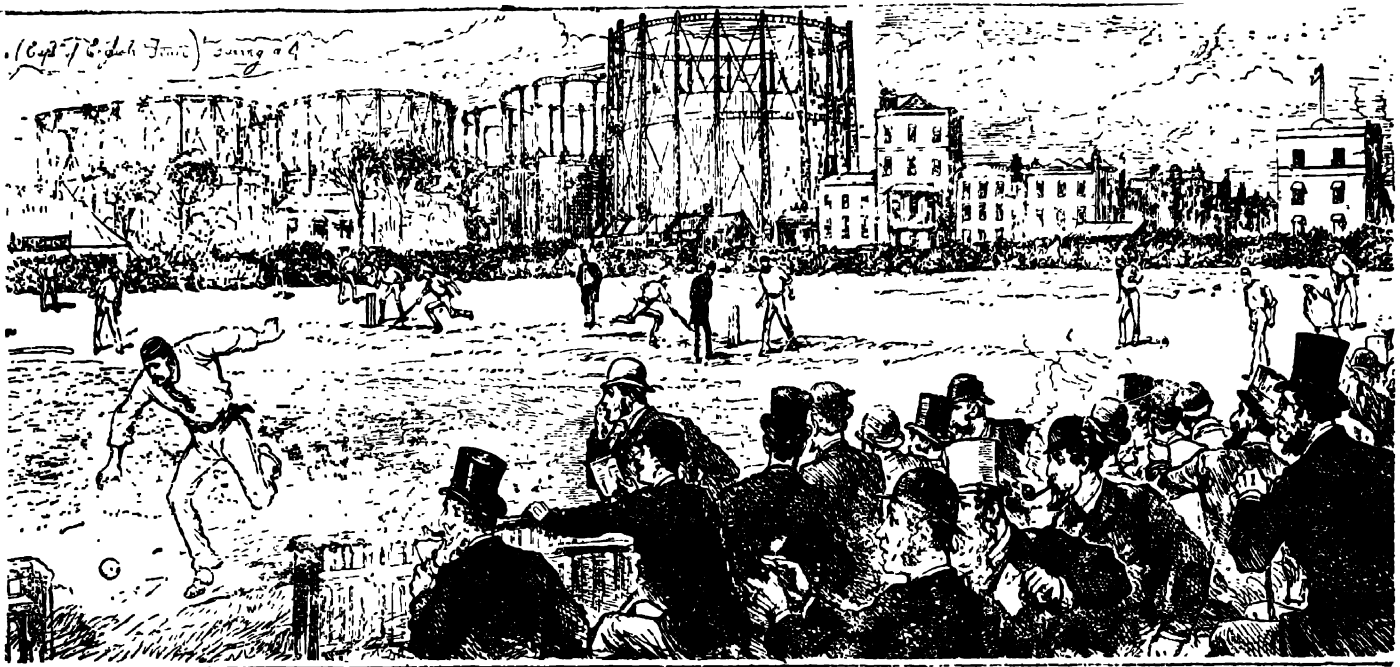
১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে আবার ক্রিকেট খেলার পুরানো আইনকে বাতিল করে দিয়ে নূতন আইন তৈরী হয়। **১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে মেরিলীবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাব ক্রিকেট খেলার যে নূতন আইন তৈরী করেন, সেই আইনেই বর্ত্তমানের ক্রিকেট খেলা পরিচালিত হয়।**

**১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ক্রিকেট খেলার বলের ওজন ৫½ আউন্স থেকে ৫¾ আউন্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় এবং খেলার ব্যাট ৪¼" ইঞ্চির বেশী চওড়া হবে না বলে স্থির হয়। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ক্রিকেট খেলার পিচ ২২ গজ লম্বা হবে বলে আইন তৈরী হয়।**

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম সৌখীন ও পেশাদারী ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে 'জেণ্টলম্যান' এবং 'প্লেয়ার' নামে খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম খেলা হয় ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে।

**১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লর্ডস মাঠে প্রথম ক্রিকেট স্কোরবোর্ড ব্যবহৃত হয়।** ক্রিকেট অনুশীলনীর সময় যে নেট্ বা জাল ব্যবহার করা হয়, সেই জাল প্রথম ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লর্ডস মাঠে দেখা যায়।



ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলার দৃশ্য

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে **কাউন্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা** আরম্ভ হয়।

**ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই মার্চ্চ মেলবোর্ণ মাঠে।** অষ্ট্রেলিয়ার একাদশ ও ইংলণ্ডের মধ্যে এই খেলাটি হলেও এই খেলাটিকেই প্রথম টেষ্ট খেলা হিসাবে ধরা হয়।

## ভারতে ক্রিকেট খেলার প্রচলন ও প্রসার

ভারতে ক্রিকেট খেলা প্রথম প্রচলন করেন ইংরেজেরা। ভারতে প্রথম ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তাতে দেখা যায় যে, ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম খেলা হয় তখনকার ইংরেজ সৈনিক ও ভারতে নিযুক্ত অন্যান্য ইংরেজ কর্ম্মচারীদের মধ্যে। কলকাতায় ক্রিকেট খেলা সুরু হয় ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। কলকাতাতে প্রথম ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয় বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট হাউসের সামনে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা' এবং 'জেণ্টলম্যান অফ ব্যারাকপুর ও দমদম'-এর মধ্যে। বোম্বাইয়ে প্রথম ক্রিকেট খেলা হয় ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে 'মিলিটারী' ও 'আইল্যাণ্ড অফ বম্বে' নামে দুটো দলের মধ্যে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে 'ইটোনিয়ান্স' ও 'ক্যালকাটা'র মধ্যে আবার একটি খেলা হয়। এই খেলায় ইটোনিয়ান্স দল ১ ইনিংস ও ১৪২ রানে জয়লাভ করে। পিটার ভ্যান্সিটার্ট, যিনি একসময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক ছিলেন, তিনি এই খেলায় সেঞ্চুরী বা শত রান করেন।

ভারতের মধ্যে কলকাতায় প্রথম ক্রিকেট খেলা সুরু হলেও এই খেলাকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে বোম্বাই। ইংরেজদের কাছ থেকে পার্শীরা খেলাটি শিখে নিজেদের মধ্যে খেলা সুরু করে দেয়। ক্রমশঃ পার্শীরা ক্রিকেট খেলায় ভীষণ উৎসাহী হয়ে পড়ে এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে পার্শীদের 'ওরিয়েণ্টাল ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 'বম্বে ইউনিয়ন হিন্দু ক্লাব'-এর প্রতিষ্ঠা হয়।

পার্শীরা এই খেলায় এত বেশী উৎসাহী হয়ে পড়ে যে তারা শিক্ষক রেখে খেলা শিখতে থাকে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ জন পার্শী যুবকের একটি দল ভারত ত্যাগ করে ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলার জন্যে যাত্রা করে। প্রথম ভারতীয় ক্রিকেট দল হিসাবে পার্শীদের এই যাত্রা খুব আশাপ্রদ হয় না। ছয়মাসব্যাপী সফরে ২৮টি খেলায় যোগ দিয়ে পার্শীরা মাত্র ১টি খেলায় জয়ী হয় এবং ৮টি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় বাকী অন্য সব খেলাগুলিতে পার্শীরা পরাজয় বরণ করে। দুবছর পর স্যার দোরাব জে. টাটা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আবার একটি

পার্শীদলকে নিয়ে ইংলণ্ড সফরে যান। এই সফর প্রথম সফর থেকে অনেক আশাপ্রদ হয়। ৩১টি খেলার মধ্যে পার্শীদল ৮টি খেলায় জয়ী হয় এবং ১১টি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। পার্শীদের এই দ্বিতীয় সফরের পর ভারতে ক্রিকেট খেলার উৎসাহ আরও বেড়ে যায়।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দ থেকে পার্শীদল এবং বোম্বায়ের ইংরেজদের দল যাকে প্রেসিডেন্সী দল বলা হয়, এই দুই দলের মধ্যে 'প্রেসিডেন্সী' ম্যাচ সুরু হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রণজিৎসিংজী ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলায় আলোড়নের সৃষ্টি করেন। রণজিৎসিংজী ভারতীয় হিসাবে প্রথম কেম্ব্রিজের 'ব্লু' লাভ করেন এবং ইংলণ্ড দলের হয়ে খেলার কৃতিত্ব লাভ করে ভারতীয়দের মধ্যে ক্রিকেট খেলার উৎসাহ ও আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তোলেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী ম্যাচে হিন্দুদল যোগ দেওয়ায় প্রেসিডেন্সী ম্যাচের নাম 'ট্রায়াঙ্গুলার প্রতিযোগিতা' হয়। এই ট্রায়াঙ্গুলার প্রতিযোগিতায় মুসলিম ও রেষ্ট দল যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'কোয়াড্র্যাঙ্গুলার' এবং 'পেন্টাঙ্গুলার' প্রতিযোগিতা নামে খেলা হতে থাকে। আজ ক্রিকেট খেলায় অভিজ্ঞ লোক মাত্রেই অকুণ্ঠচিত্তে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, ভারতে ক্রিকেট খেলার উন্নতির সবথেকে বেশী সাহায্য হয়েছে এই পেন্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার কাছ থেকে।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জি. এফ. ভার্ণনের দল, লর্ড হকের দল এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি অথেনটিকস্ নামে তিনটি দল ভারত-ভ্রমণে এসে ক্রিকেট খেলার উৎসাহ আরও বাড়িয়ে তোলে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালার মহারাজার নেতৃত্বে ভারতের বাছাই-করা একটি ক্রিকেট দল ইংলণ্ড সফরে যায়। ভারতীয় দল এই সফরে ২৩টি খেলায় যোগ দিয়ে ৬টি খেলায় জয়ী হয়, ২টি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে এবং ১৫টি খেলায় পরাজিত হয়।

এই সফর থেকেই বর্ত্তমানের ক্রিকেট যুগ সুরু হয়। এর পর থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে রাজা-মহারাজাদের সাহায্যে এবং উৎসাহে বিভিন্ন ক্রিকেট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে সরকারীভাবে এম. সি. সি. দল ভারতভ্রমণে আসার আগে ভারত 'ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স'-এর সভ্য হয়।

ক্রমশঃ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সৃষ্টি হতে থাকে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে 'ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং

ভারতের ক্রিকেট খেলা একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া পরিচালিত হতে থাকে।

সরকারীভাবে ভারত প্রথম টেষ্ট খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে এম. সি. সি. দলের বিরুদ্ধে। সরকারীভাবে ভারতীয় দল ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড সফরে যায়।

## ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড

বর্ত্তমানে ভারতে ক্রিকেট খেলা পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড-এর। এই বোর্ডের মহান্ দায়িত্বগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো ঃ (ক) ভারতীয় ক্রিকেট খেলার মানকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, (খ) বিদেশী ক্রিকেট দলগুলির ভারত-সফরের ব্যবস্থা করা এবং ভারতীয় ক্রিকেট দলগুলিকে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা, (গ) ভারতের বিভিন্ন ক্রিকেট প্রতিযোগিতাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা, (ঘ) বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন এসোসিয়েশনগুলির মধ্যে কোন মতের অমিল হলে সেটা সমাধান করা এবং (ঙ) প্রয়োজনমত ক্রিকেট আইনকে সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করা।

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড যে কবে, কোথায় এবং কি ভাবে সৃষ্ট হয়েছিল সে-কথা বলা খুব কষ্টকর। কারণ, বোর্ড স্থাপিত হবার সময়ে যে সভা হয়েছিল সেই সভার কাগজ-পত্র কিছুই আজও পাওয়া যায়নি। ফলে কেউ কেউ দাবী করেন যে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দিল্লীতে ক্রিকেট বোর্ড স্থাপিত হয়েছিল, আবার কেউ কেউ বলেন যে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বোম্বাইতে ক্রিকেট বোর্ড জন্মলাভ করেছিল।

কে এবং কারা যে এই ক্রিকেট বোর্ড-এর প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন, সে বিষয়েও মতভেদ আছে। তবে একথা বলা যায় যে, এই ক্রিকেট বোর্ড প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের দানই সবথেকে বেশী।

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড সম্বন্ধে আর একটা মজার ইতিহাস হলো এই যে, এই বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই ভারত, পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ ক্রিকেট পরিচালনার প্রতিষ্ঠান যাকে 'ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স' বলা হয়, তার সদস্য ছিল। অথচ আইনতঃ কোন দেশের ক্রিকেট বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হবার আগে সেই দেশ ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স-এর সভ্য হতে পারে না। এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের চেষ্টাতেই। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে যখন ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব এম. সি. সি. দলকে ভারত-

ভ্রমণে আনার জন্যে চেষ্টা করতে থাকেন, তখন এম. সি. সি. থেকে প্রস্তাব করা হয় যে, ভারতে সরকারীভাবে এম. সি. সি. দলকে নিয়ে যেতে হলে ভারতকে আগেই ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সভ্য হতে হবে। এই কারণেই খুব সম্ভব ভারতে ক্রিকেট বোর্ড প্রতিষ্ঠা হবার আগেই ভারত ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সভ্য হবার গৌরব লাভ করেছিল। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবই সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে সরকারীভাবে এম. সি. সি. দলকে ভারতভ্রমণে এনে এবং ভারতকে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সভ্য করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড প্রতিষ্ঠার ভিত তৈরী করেন।

১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের চেষ্টায় আর্থার গিলিগ্যানের নেতৃত্বে এম. সি. সি. দল ভারত সফরে আসে। গিলিগ্যান ভারত সফরের সময়ে বিভিন্ন ক্রিকেট খেলার কেন্দ্রে, বিশেষ করে দিল্লী এবং কলকাতায় ভারতে ক্রিকেট বোর্ড প্রতিষ্ঠা করার কথা বার বার বলেন।

এম. সি. সি. দল দিল্লী থাকার সময়ে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর আর. ই. গ্রাণ্ট গোভান ক্রিকেট বোর্ড প্রতিষ্ঠার জন্যে দিল্লীর রোসেনারা ক্লাবে এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় সিন্ধু, পাঞ্জাব, পাতিয়ালা, দিল্লী, বাঙ্গলা, উত্তরপ্রদেশ, রাজপুতানা, আলোয়ার, ভূপাল, গোয়ালিয়র, বরোদা, মধ্যভারত এবং কাথিওয়াড়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকেন। এই সভাতেই ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রাণ্ট গোভান বোর্ডের প্রথম সভাপতি এবং এ. এস. ডি. মেলো প্রথম সম্পাদক হিসাবে নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে বোম্বাই জিমখানা ক্লাবে বোর্ডের যে পরবর্ত্তী সভা হয়, সেই সভাতে বোর্ড-পরিচালনার বিভিন্ন আইন তৈরী হয়।

এই সময়ে ভারতে কোন প্রাদেশিক ক্রিকেট এসোসিয়েশন না থাকায় সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির একজন করে সভ্য নিয়ে এক অস্থায়ী বোর্ড গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল: ১। বোম্বাই, মাদ্রাজ, সি. পি. এবং পাঞ্জাবের কোয়াড্র্যাঙ্গুলার কমিটি; ২। করাচীর পেণ্টাঙ্গুলার কমিটি; ৩। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব; ৪। পাতিয়ালার রাজেন্দ্র জিমখানা ক্লাব; ৫। দিল্লীর রোসেনারা ক্লাব; এবং ৬। কাথিওয়াড় রাজ্য।

এই বোর্ডকে বোম্বাই, বাঙ্গলা, আসাম, মাদ্রাজ, দক্ষিণভারত, সি. পি., ইউ. পি., পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বিহার, উড়িষ্যা, আর্ম্মি স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ড, রাজপুতানা রাজ্য, মধ্যভারত রাজ্য, পাতিয়ালা রাজ্য এবং দিল্লীর ক্রিকেট এসোসিয়েশনগুলি গঠনের জন্য উৎসাহিত করতে অনুরোধ

করা হয়। সভায় আরও ঠিক হয় যে, বাঙ্গলা এবং আসামকে একসঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে, মাদ্রাজ সমস্ত দক্ষিণভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং বিহার ও উড়িষ্যা মিলিয়ে একটি এসোসিয়েশন গঠিত হবে।



ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের প্রথম সভাপতি আর. ই. গ্রাণ্ট গোভান

আটটি প্রাদেশিক এসোসিয়েশন গঠিত হওয়া এবং সেই এসোসিয়েশনগুলি বোর্ডের সভ্য হওয়া পর্যন্ত এই অস্থায়ী বোর্ড কাজ চালিয়ে যাবে বলে স্থির হয়।

## ট্রায়াঙ্গুলার, কোয়াড্র্যাঙ্গুলার এবং পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

ভারত ক্রিকেট খেলায় আজ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ভারতের রণজিৎ সিংজী, সি. কে. নাইডু, বিজয় মার্চেন্ট এবং ভিন্নু মানকড় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন। সরকারী টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারত 'রাবার' লাভ করতে না পারলেও ভারতীয় ক্রিকেটের শক্তি আজ অবেহেলার সামগ্রী নয়।

ভারতীয় ক্রিকেট একদিনেই এ মর্য্যাদা লাভ করেনি। দীর্ঘ দিনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ সাফল্য সম্ভব হয়েছে। তার মধ্যে ট্রায়াঙ্গুলার, কোয়াড্র্যাঙ্গুলার এবং পেন্টাঙ্গুলার ক্রিকেটই ভারতীয় ক্রিকেট খেলার মানকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবথেকে বেশী সাহায্য করেছে।

এই পেন্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই আমরা সি. কে. নাইডু ডি. বি. দেওধর, অমর সিং, অমরনাথ, রামজী, মার্চ্চেন্ট এবং হাজারের ন্যায় খেলোয়াড়ের প্রতিভার বিকাশ দেখেছি। দেখেছি ওয়াজির আলী, নাজির আলী, দিলওয়ার হোসেন, নিসার, আমির ইলাহি, বাকা জিলানী, মুস্তাক আলী, আব্দুল হাফিজ এবং গুলমহম্মদের ন্যায় খেলোয়াড়কে, যাঁরা ভারতীয় ক্রিকেট খেলার মানকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

যে কোন খেলার উন্নতি করতে হলে প্রতিযোগিতার প্রয়োজন। প্রতি-যোগিতা ছাড়া কোন খেলোয়াড়ের প্রতিভা বা শক্তি সঠিকভাবে বোঝা যায় না। কিন্তু ভারতে ক্রিকেট খেলা যখন শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা প্রথম প্রচলিত করেছিলেন, তখন ভারতে ক্রিকেট খেলার প্রতিষ্ঠান সঙ্গে সঙ্গে জন্মায়নি। ;এই খেলাকে ভারতীয় জনসাধারণ গ্রহণ করেছিল অনেক পরে। অবশ্য এ কথাও সত্য, ভারতে ক্রিকেট খেলা আজ বহুল প্রচলিত হলেও, আজও ভারতীয় জনসাধারণ জাতীয় খেলা হিসাবে এ খেলা গ্রহণ করেনি। তার প্রথম কারণ হলো, এই খেলার মাঠ ও সরঞ্জামের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ এই খেলার ধৈর্য্য, সহনশীলতা বা টেক্‌নিকের প্রতি অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোকদের আকর্ষণ না থাকা। সেই কারণেই বলা চলে, ভারতে ক্রিকেট খেলা প্রচলনের প্রথম দিকে সবথেকে বেশী সাহায্য করেছিলেন ভারতের রাজা-মহারাজারা।

যাই হোক, বোম্বাইতে ইংরেজরা 'বম্বে প্রেসিডেন্সী টিম' নাম দিয়ে প্রথম ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। পার্শীরা ইংরেজদের খেলা দেখে খেলতে সুরু করেন। ফলে পার্শীদের মধ্যে কয়েকজন ভালো ভালো খেলোয়াড় দেখা দিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে উভয় দল নিজেদের শক্তি যাচাই করার জন্যে পরস্পর শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। |১৮৯২ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রেসিডেন্সী দল এবং পার্শী দলের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা সুরু হয়, তাকেই বলা হয় 'প্রেসিডেন্সী ম্যাচ'। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এক বছর পুনাতে এবং এক বছর বোম্বাইতে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। তিন বছর পর এই প্রতিযোগিতা বাৎসরিক প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়ায়।,

ক্রমশঃ ক্রিকেট খেলা ভারতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং ভারতের

হিন্দু ও মুসলমানেরা ক্রিকেট খেলতে সুরু করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুরা 'হিন্দু দল' নাম দিয়ে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ায় দুটো দলের বদলে তিনটে দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে, ফলে এই প্রতিযোগিতার নাম প্রেসিডেন্সী ম্যাচের পরিবর্ত্তে 'ট্রায়াঙ্গুলার প্রতিযোগিতা' হয়।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের একটি দল যোগ দেওয়ায় তিনটি দলের বদলে চারটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু হয়। ফলে ট্রায়াঙ্গুলার প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে 'কোয়াড্র্যাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা' নাম হয়।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে 'রেষ্ট দল' নামে আর একটি দল বেড়ে যাওয়ায় পাঁচটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতে থাকে এবং সেই কারণেই কোয়াড্র্যাঙ্গুলার নাম পরিবর্ত্তন করে 'পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা' নাম দেওয়া হয়।

হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ভাব বেড়ে যাওয়ায় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এই সাম্প্রদায়িকতার ভাব চরমে উঠে যাওয়ায় ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ থেকে এই পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা চিরদিন ক্রিকেট-উৎসাহী লোকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

## রন্‌জি ট্রফি বা আন্তঃরাজ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

ভারতের বিভিন্ন ক্রিকেট প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে রন্‌জি ট্রফি বা আন্তঃরাজ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতাই সর্ব্বপ্রধান। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে অনুষ্ঠিত এই বাৎসরিক প্রতিযোগিতা ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সিমলায় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভায় 'রন্‌জি ট্রফি' জন্মলাভ করে। এই সভায় সভপতিত্ব করেন তখনকার ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি স্যার সিকেন্দার হায়াৎ খাঁন। এ. এস. ডি. মেলো এই সভায় প্রস্তাব করেন যে, অষ্ট্রেলিয়ায় যেমন 'শেফিল্ড শীল্ড' প্রতিযোগিতা হয়, সাউথ আফ্রিকায় যেমন 'কুরী কাপ' খেলা হয়, নিউজিল্যাণ্ডে যেমন 'প্লাকেট শীল্ড' খেলা হয় এবং ইংলণ্ডে যেমন 'কাউন্টি ক্রিকেট' খেলা হয় তেমনি ভারতবর্ষেও একটি প্রতিযোগিতার প্রচলন করা উচিত। এ. এস. ডি. মেলোর এই প্রস্তাব সভায় গ্রহণ করা হয়। এই প্রতিযোগিতার জন্যে যে কাপটি তৈরী হবে তার একটা ছবিও মেলো সভায় পেশ করেন।

পাতিয়ালার মহারাজা ভূপেন্দ্র সিংজী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, এই প্রতিযোগিতায় যে কাপটি দেওয়া হবে বলে স্থির হচ্ছে সেটির নাম ভারতের অমর ক্রিকেট খেলোয়াড় রনজিৎ সিংজীর নামে রাখা হউক এবং সভায় এই প্রস্তাব সকলে গ্রহণ করায় কাপটির নাম 'রন্‌জি ট্রফি' হয়।



রন্‌জি ট্রফি

ভূপেন্দ্র সিংজী নিজে ৫০০ পাউণ্ড মূল্যের এই স্বর্ণ-কাপটি উপহার দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রতিবছর যে রাজ্যদল এই কাপ জয়লাভ করতে পারবে, তাদের চিরকালের জন্যে তিনি একটি ছোট কাপও প্রতিবছর উপহার দেবেন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ থেকে এই রন্‌জি ট্রফির প্রতিযোগিতা কয়েকটি ভাগে (জোন-এ) ভাগ করে খেলা সুরু হয়। বিভিন্ন ভাগে জয়ী দলগুলি তখন আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মূল প্রতিযোগিতার সেমিফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলার সম্মুখীন হয়।

১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় বোম্বাই দল উত্তর-ভারতীয় দলকে পরাজিত করে রন্‌জি ট্রফিতে জয়লাভ করে।

## রোহিণ্টন বেরিয়া ট্রফি ও কুচবিহার ট্রফি

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতি-যোগিতায় বিজয়ী দলকে যে কাপটি দেওয়া হয়, তাকে রোহিণ্টন বেরিয়া ট্রফি বলে।

রোহিণ্টন বেরিয়া নামে একজন ভারতীয় ছাত্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হবার সময়ে মারা যাওয়ায় তাঁর পিতা রোহিণ্টন বেরিয়ার স্মৃতির জন্যে এই কাপটি উপহার দেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এই প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন করেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পরিচালনায় এই প্রতিযোগিতা

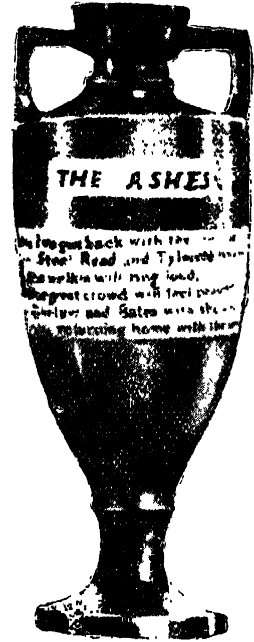
অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট বোর্ডের হাতে এই প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে দেন।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য-স্কুল দলের মধ্যে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে যে কাপটি দেওয়া হয়, তাকে 'কুচবিহার ট্রফি' বলে।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড এই প্রতিযোগিতার প্রচলন করেন এবং সেই সময় থেকেই প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

## এ্যাসেজ

এ্যাসেজ কথাটি ছোট। এ্যাসেজ কথার অর্থ ছাই। কিন্তু এই ছোট্ট কথাটি ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলায় জাতীয় সম্মানের প্রতীক। ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে সরকারীভাবে যে ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয়, সেই ৫টি টেষ্টের মধ্যে যে দল বেশীসংখ্যক টেষ্ট খেলায় জয়লাভ করে, তারা বিজয়ীর সম্মান হিসাবে 'এ্যাসেজ' লাভ করে।



এ্যাসেজ

এই এ্যাসেজ কথাটির উৎপত্তি হয়েছিল ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের কথা, ইংলণ্ডের বিখ্যাত ওভ্যাল মাঠে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেষ্ট খেলা হচ্ছে। টস্-এ জিতে অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথম ব্যাট করতে এসে ৬৩ রানে সকলে আউট হয়ে যায়। এর পর ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে সুরু ক'রে অষ্ট্রেলিয়া থেকে ৩৮ রান বেশী করে অর্থাৎ ১০১ রানে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে। দ্বিতীয় ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়া দল ১২২ রান মাত্র সংগ্রহ করে। সুতরাং ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৮৫ রান করতে পারলেই জয়লাভ করতে পারে, এই অবস্থার স্বষ্টি হয়। ইংলণ্ডের খেলোয়াড়েরা এবং মাঠে উপস্থিত দর্শকেরা ইংলণ্ডের জয়লাভ একরূপ নিশ্চিত বলেই মনে করতে থাকেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ডের ২ উইকেটে ৫০ রান উঠবার পর জয়লাভ অবধারিত বলে মনে হয়। মাত্র ৩৫ রান তুলতে পারলেই হয়, অথচ হাতে ৮টি

উইকেট তখনো বাকী। ইংলণ্ডের অনেক সমর্থকেরা জয় নিশ্চিত জেনে মাঠ ছেড়ে চলে যান।

কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার বোলার স্পোফোর্থ এমন মারাত্মকভাবে বল করতে আরম্ভ করেন যে, তাঁর সেই বলের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের ব্যাটস্‌ম্যানেরা রান তুলতে ভীত হয়ে পড়েন। অপরদিক থেকে বয়েলের বলও খুব ভালো হতে থাকে, ফলে রানও খুব ধীরে ধীরে উঠতে থাকে।

ইংলণ্ডের তখনো ৫ জন খেলোয়াড় আউট হতে বাকী এবং মাত্র ১৯ রান করতে পারলে জয়লাভ, এই অবস্থায় এসে পৌঁছায়। স্পোফোর্থের মারাত্মক বলে আরও তিনটি উইকেট পড়ে যায় ৯ রানের মধ্যে। সুতরাং ১০ রান করতে পারলেই হয় এবং ২ জন খেলোয়াড় আউট হতে বাকী, এই অবস্থায় বার্ণেস খেলতে আসেন কিন্তু তিনি ২ রান করেই আউট হয়ে যান। মাঠে তখন এমন উত্তেজনা যে একজন লোক ভীড়ের মধ্যে ওপর থেকে পড়ে যায়, তাকে আর জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। কয়েকজন লোক চকোলেট মনে করে হাতের ছাতার বাট চিবুতে থাকেন। যাঁরা স্কোর লিখছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন স্কোর লেখার খাতায় 'geese' লিখে ফেলেন।

সি. টি. ষ্টাডের সঙ্গে যখন ইংলণ্ডের শেষ খেলোয়াড় পীট্ খেলতে আসেন তখনো ইংলণ্ডের ৮ রান বাকী। কিন্তু স্পোফোর্থ এই শেষ জুটীকে ১ রানের বেশী আর করতে দেন না। ইংলণ্ডের মাটিতে অষ্ট্রেলিয়া ৭ রানে ইংলণ্ডকে প্রথম পরাজিত করে।

ইংলণ্ড ক্রিকেট খেলায় এতদিন যে গর্ব্ব করতো সেই গর্ব্ব ভেঙ্গে যায়। এই পরাজয় ইংলণ্ডের জনসাধারণের কাছে যে কতখানি বেদনাদায়ক হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তার পরের দিনে খবরের কাগজের পাতায়। তখনকার দিনে ইংলণ্ডের বিখ্যাত পত্রিকা স্পোর্টিং টাইমস্-এ কালো বর্ডার দিয়ে ছাপা হয়—

**"In affectionate remembrance**
**of**
**English Cricket**
**Which died at the Oval**
**on**
**29th August, 1882.**
**Deeply lamented by a large**
**Circle of sorrowing friends and**
**acquaintances.**
**R. I. P.**

**N.B. The body will be cremated and**
**The Ashes taken to Australia."**

পরের বছর আইভো ব্লাই (যিনি পরে লর্ড ডার্ণলে হয়েছিলেন) অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে ইংলণ্ড দলকে অষ্ট্রেলিয়ায় খেলতে নিয়ে যান।

প্রথম টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া দল ৯ উইকেটে জয়লাভ করলেও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে ইংলণ্ড দল জয়লাভ করে 'রাবার' লাভ করে। তৃতীয় চেষ্ট ম্যাচ শেষ হবার পর একদল অষ্ট্রেলিয়ান মহিলা, ক্রিকেট খেলার ষ্টাম্প পুড়িয়ে আইভো ব্লাইকে সেই ছাই-ভর্ত্তি পাত্রটি উপহার দেন এবং ঐ ছাই-ভর্ত্তি পাত্রটিকে ইংলণ্ডে নিয়ে যাবার জন্যেও মহিলারা অনুরোধ করেন। ঐ ছাই-ভর্ত্তি পাত্রটির নীচে লিখে দেওয়া হয়—

"When Ivon goes back with the Urn
    the urn
Studds, Steel, Read and Tylecote, return,
    return,
The Welkin will ring loud,
The great crowd will feel proud,
Seeing Barlow and Bates with the urn,
    the urn,
And the rest coming home with the urn."

লর্ড ডার্ণলে এই ছাই-ভর্ত্তি পাত্রটিকে দেশে নিয়ে যান এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যত্নের সঙ্গে নিজের কাছে রাখেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মেরিলীবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাবকে এই পাত্রটি দিয়ে দেওয়া হয় এবং আজও মেরিলীবোর্ণ ক্লাবে সযত্নে ঐ পাত্রটি রাখা আছে।

ইংলণ্ড বা অষ্ট্রেলিয়া যে দলই জয়লাভ করুক না কেন, তারা সত্য সত্যই কিন্তু এই এ্যাসেজ-সুদ্ধ পাত্রটি পায় না। এ্যাসেজ পাওয়াটা একটা চলতি সম্মানের কথা ছাড়া কিছুই নয়।

## কোন্ কোন্ দেশের মধ্যে সরকারীভাবে ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয়

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম সরকারীভাবে টেষ্ট ম্যাচ খেলা সুরু হয়। ক্রমশঃ বিভিন্ন কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে ক্রিকেট খেলার উৎসাহ বেড়ে যেতে থাকে, ফলে ঐ সব দেশগুলি ক্রিকেট খেলায় দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। বিভিন্ন দেশে ক্রিকেট খেলায় কুশলী খেলোয়াড়ের সৃষ্টি হওয়ায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা কববার স্বাভাবিক ইচ্ছা দেখা যায়।

; বর্ত্তমানে সরকারীভাবে নিম্নলিখিত দেশগুলির মধ্যে ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ খেলা অনুষ্ঠিত হয় ঃ—অষ্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, ভারত, নিউজিল্যাণ্ড, সাউথ আফ্রিকা এবং পাকিস্তান। )

কোন্ দল কোন্ খৃষ্টাব্দে কার সঙ্গে খেলবে সেগুলি বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা করবার পর ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সে তাদের খেলবার তালিকা অনুমোদন করিয়ে নেয়।

## *ভারতীয় ক্রিকেট দলগুলির বিদেশ সফর*

### ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে—পার্শী ক্রিকেট দলের ইংলণ্ড সফর

এই দলে ছিলেন—ডাঃ ডি. এইচ. প্যাটেল (অধিনায়ক), পি. দস্তুর, এ. মেজর, জে. মরেনাস, এস. ভেদর, ডি. খাম্বাটা, এম. ফ্রেমজী, এস. বেজেঞ্জী, বি. বেরিয়া, বি. ভাল্লা, এম. ব্যানারী, এ. লিবারওয়ালা, জে. পোয়েখান্না, পি. সি. মেজর, এস. হার্ভার এবং এ. আর. লিণ্ডোয়ালা।

ফলাফল—১টি জয়, ৮টি ড্র, ১৯টি পরাজয়।

### ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে—পার্শী ক্রিকেট দলের দ্বিতীয় বার ইংলণ্ড সফর

এই দলে ছিলেন—পি ডি. কাঙ্গা (অধিনায়ক), আর. ডি. কুপার, ডি. এফ. ডুবাস, এন. সি. বাপসোলা, এম. ই. পাভ্রী, জে. এন. মরেনাস, এম. ডি. কাঙ্গা, এস. হার্ভার, এ. ডিভেচা, কে. আর. ইরানী, ডি. এস. মেহতা, ডি. সি. প্যানডোলে, বি. ডি. মোদি, ডি. এন. রাইটার এবং জে. এম. ডিভেচা।

ফলাফল—৮টি জয়, ১২টি ড্র, ১১টি পরাজয়।

### ১৯১১ খৃষ্টাব্দে—ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফর

এই দলে ছিলেন—পাতিয়ালার মহারাজা (অধিনায়ক), মেজর কে. এম, মিস্ত্রী, ডাঃ এইচ. ডি. কাঙ্গা, পি. বালু, জে. এস. ওয়ার্ডেন, এম. পাই, এইচ, এফ. মুল্লা, কে. শেসাচারী, এ. সালামুদ্দিন, সাফকোয়াত হোসেন, সৈয়দ হোসেন, এম. ডি. বুলসরা, আর. পি. মেহেরমজী, বি. জয়ারাম, পি. শিবরাম, শিবাজী রাও এবং এম. পি. বজানা।

ফলাফল—৬টি জয়, ২টি ড্র, ১৫টি পরাজয়।

## ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে—ভারতীয় দলের সরকারীভাবে প্রথম ইংলণ্ড সফর

এই দলে ছিলেন—পোরবন্দরের মহারাজা ( অধিনায়ক ), কে. এস. ঘনশ্যাম সিংজী, সি. কে. নাইডু, ওয়াজীর আলী, নাজির আলী, জে. নাওমল, এন. ডি. মার্শাল, এস. এইচ. এম. কোলা, অমর সিং, পি. ই. পালিয়া, লাল সিং,



১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল

জাহাঙ্গীর খাঁন, জে. জি. ন্যাভেল, যোগেন্দ্র সিং, বি. ই. কাপাদিয়া, গোলাম মহম্মদ, এস. আর. গোদাম্বে এবং মহম্মদ নিসার।

ফলাফল—১৩টি জয়, ১৪টি ড্র, ৯টি পরাজয়।

## ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে—ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফর

এই দলে ছিলেন—ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমার ( অধিনায়ক ), সি. কে. নাইডু, ওয়াজীর আলী, মহম্মদ নিসার, পি. ই. পালিয়া, এল. অমরনাথ, সুঁটে ব্যানার্জ্জী, আমির ইলাহী, এম. জে. গোপালন, ডি. ডি. হিণ্ডেলকার, বাকা জিলানী, এল. পি. পাই, মহম্মদ হোসেন, কে. পি. মেহেরমজী, ভি. এম. মার্চ্চেণ্ট, এস. মুস্তাক আলী, সি. রামস্বামী, সি. এস. নাইডু, অমর সিং, জাহাঙ্গীর খাঁন, দিলওয়ার হোসেন এবং এস. এম. মোদি।

ফলাফল—৪টি জয়, ১২টি ড্র, ১২টি পরাজয়।

## ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে—রাজপুতানা দলের ইংলণ্ড সফর

এই দলে ছিলেন—কে. বসু, আব্বাস খাঁন, দীপচাঁদ, রামপ্রকাশ, সি. এইচ. ব্যাঙ্কার, ভি. এস. হাজারে, এম. গোপাল দাস, কে. ভট্টাচার্য্য, এন. কেসারী, বি. ডি. শঙ্কর, আসাদ ওহায়েব, টি. হোসেন, এল. রামজী, আজিম খাঁন, গুলাব সিং, ডব্লিউ. ডি. বেগ্, ডানী রাম, চোপরা, জি. কে. কুরেশী, আলিক হোসেন, সুলতান আব্বাস এবং ঝালওয়ারের মহারাজা।

ফলাফল—২টি জয়, ৫টি ড্র, ১টি পরাজয়।

## ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে—ভারতীয় দলের সিংহল সফর

সিংহল ক্রিকেট এসোসিয়েশনের অনুরোধে বিজয় মার্চ্চেণ্টের নেতৃত্বে এই দলটি পাঠান হয়। অমরনাথ ছাড়া অন্য কোন খেলোয়াড় বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারে না। একটি বেসরকারী টেষ্ট খেলা হয় এবং সেটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

## ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে—ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফর

এই দলে ছিলেন—পাতৌদির নবাব ( অধিনায়ক ), ভি. এম. মার্চ্চেণ্ট, ভি. এস. হাজারে, এল. অমরনাথ, ভিন্নু মানকড়, আর. এস. মোদি, মুস্তাক আলী, সুঁটে ব্যানার্জ্জী, সি. এস. নাইডু, গুল মহম্মদ, এস. ডব্লিউ. সোহানী, ডি. ডি.



১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল

হিণ্ডেলকার, সি. টি. সারভাতে, এ. এইচ. কারদার, আর. বি. নিম্বলকার এবং এস. জি. সিন্দে।

ফলাফল—১৩টি জয়, ১৬টি ড্র, ৪টি পরাজয়।

## ১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে—ভারতীয় দলের অষ্ট্রেলিয়া সফর

এই দলে ছিলেন—এল, অমরনাথ ( অধিনায়ক ), ভি. এস. হাজারে, ভিন্নু মানকড়, এইচ. আর. অধিকারী, সি. টি. সারভাতে, গুলমহম্মদ, জি. কিষেনচাঁদ, কে. এম, রঙ্গেনকার, এস. ডব্লিউ. সোহানী, সি. এস. নাইডু, জে. কে. ইরানী, ডি. জি. ফাদকার, আমির ইলাহী, পি. সেন, রাম সিং এবং সি. রঙ্গচারী।

ফলাফল—৫টি জয়, ৮টি ড্র, ৭টি পরাজয়।

## ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে—হোলকার দলের সিংহল সফর

ফলাফল—২টি জয় ও ২টি ড্র।

## ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে—ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফর

এই দলে ছিলেন—ভি. এস. হাজারে ( অধিনায়ক ), এইচ. আর. অধিকারী, এন. চৌধুরী, আর. ডিভেচা, ডি. কে. গাইকোয়াড়, এইচ. জি. গাইকোয়াড়, গোলাম আমেদ, সি. ডি. গোপীনাথ, ভি. এল. মঞ্জেরেকার, এম. কে. মন্ত্রী, ডি. জি, ফাদকার, জি. এস. রামচাঁদ, পঙ্কজ রায়, সি. টি. সারভাতে, পি. সেন, এস. জি. সিন্দে, পি. আর. উমরিগর এবং ভিন্নু মানকড়।

ফলাফল—৬টি জয়, ২৪টি ড্র, ৫টি পরাজয়।

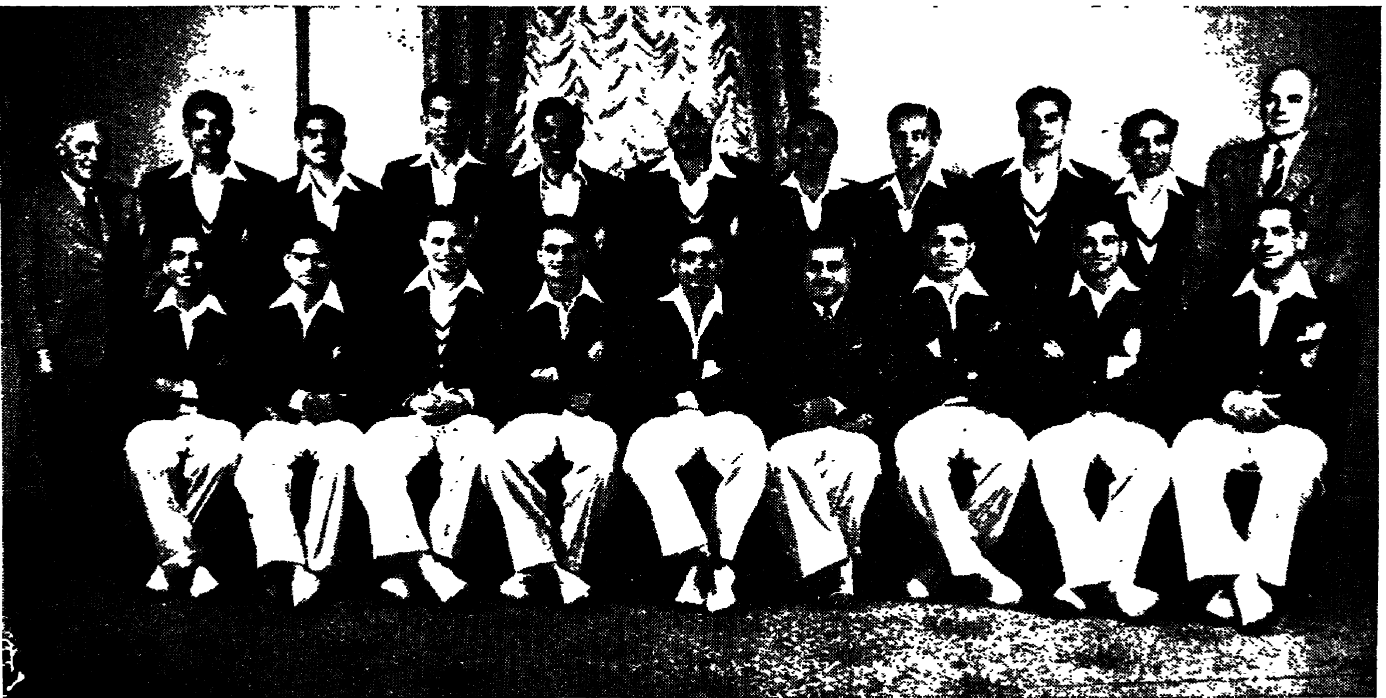
## ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে—ভারতীয় দলের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফর

এই দলে ছিলেন—ভি. এস. হাজারে ( অধিনায়ক ), ভিন্নু মানকড়, এম. এল. আপ্তে, ডি. কে. গাইকোয়াড়, সি. গাদকারী, জি. ঘোরপাড়ে, এস. পি. গুপ্তে, পি. জি. যোশী, এন. কানাইয়ারাম, ই. মাকা, ভি. এম. মঞ্জেরেকার, ডি. জি. ফাদকার, পঙ্কজ রায়, জি. এস. রামচাঁদ, দীপক সোধন এবং পি. আর. উমরিগর।

ফলাফল—২টি জয়, ৮টি ড্র, ১টি পরাজয়।

## ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে—ভারতীয় দলের পাকিস্তান সফর

এই দলে ছিলেন—ভিন্নু মানকড় ( অধিনায়ক ), পি. আর. উমরিগর, ডি. জি. ফাদকার, জি. এস. রামচাঁদ, এস. পি. গুপ্তে, ভি. এল. মঞ্জেরেকার,



১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল

গোলাম আমেদ, এম. কে. মন্ত্রী, পঙ্কজ রায়, সি. ডি. গোপীনাথ, সি. ভি. গাদকারী, জেস্থ প্যাটেল, এন. এস. তামানে, এইচ. টি. দানী, পি. পাঞ্জাবী, সি. জি. বোরদে ও প্রকাশ ভাণ্ডারী।

ফলাফল—৫টি জয়, ৯টি ড্র।

চারদিন ব্যাপী ৫টি টেষ্ট ম্যাচই অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় ক্রিকেট ইতিহাসে এক নূতন রেকর্ডের সৃষ্টি হয়।

## *বিদেশী ক্রিকেট দলগুলির ভারত সফর*

### ১৮৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে—জি. এফ. ভার্ণনের দল

এই দলে ছিলেন—জি. এফ. ভার্ণন (অধিনায়ক), লর্ড হক, জি. জে. ওয়াকার, মেজর ভ্যানডেনপ, এইচ. ফিলিপসন, এফ. এল. স্থাণ্ড, এ. এল. কার্জ্জন, ই. আর. ডি. লিটিল, ই. এম. লসন স্মিথ, এ. এফ. লেথাম, এ. ই. গিবসন, জে. এইচ. জে. হর্ণস্‌বি, জি. এইচ. গোল্ডান এবং টি. কে. ষ্ট্যাপলিং।

খেলার ফলাফল—১০টি জয়, ১টি ড্র এবং ১টি পরাজয়।

### ১৮৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে—লর্ড হকের একাদশ

এই দলে ছিলেন—লর্ড হক (অধিনায়ক), এ. জে. এল. হিল, সি. ডব্লিউ. রাইট, এ. ই. গিবসন, এইচ. ডব্লিউ. রাইট, জে. এইচ. হর্ণস্‌বি, জি. এস. ফোলজাম্বে, জে. এস. রবিনসন, ম্যাকলিন, হ্যাসেলটাইন, জি. ভার্ণন এবং এফ. এস. জ্যাকসন।

খেলার ফলাফল—১৫টি জয়, ৬টি ড্র, ২টি পরাজয়।

### ১৯০২-৩ খৃষ্টাব্দে—অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি অথেনটিক্স দল

এই দলে ছিলেন—কে. জে. কি (অধিনায়ক), জে. এন. রিড্‌লি, জে. এ. এ্যাসপিনল, এইচ. সি. জন, সিম্পসন হেওয়ার্ড, এফ. এইচ. হালনস্‌, এ. এইচ. হর্ণস্‌বি, চিনিরী, আর. এ. পয়েজকেক, হেডল্যাম এবং মিল্‌নি।

খেলার ফলাফল—১২টি জয়, ৫টি ড্র, ২টি পরাজয়।

### ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে—এম. সি. সি. দল

এই দলে ছিলেন—আর্থার গিলিগ্যান (অধিনায়ক), মেজর আর. সি. চিচেষ্টার, কনষ্টেবল, আর. ই. এস. ওয়াট, এম. এল. হিল, পি. টি. ইকার্সলে, জি.

এফ. আর্ল, এ. স্যাণ্ডহ্যাম, জে. এইচ. পার্সনস্, এম. ডব্লিউ. টেট, জি. গিয়ারী, ডব্লিউ. ই. এ্যাস্ট্রিল, জি. ব্রাউন, জি. এস. বোয়েস এবং জে মার্কার।

খেলার ফলাফল—১১টি জয়, ২৩টি ড্র।

## ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে—সিংহল দল

এই দলে ছিলেন—ডাঃ সি. এইচ. গুণশেখর (অধিনায়ক), এম. কে. এ্যালবার্ট, কে. কেলার্ট, এল. ডি. এস. গুণশেখর, ভি. চোখান, এন. এস. জোসেফ, এন. এন. ডি. ইজুশেখর, এম. কেলাট, বি. এস. পেরেরা, এল. ই. ব্যাকেলম্যান, সি. ভ্যাণ্ডারষ্ট্রাটেন, এইচ. পোলিয়ার, জি. এস. হুবার্ট, টি. এইচ. কেলার্ট এবং এস. এস. জয়বিক্রম।

খেলার ফলাফল—২টি জয়, ৭টি ড্র, ১টি পরাজয়।

## ১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে—এম. সি. সি. দল

এই দলে ছিলেন—ডি. আর. জার্ডিন (অধিনায়ক), সি. এফ. ওয়াল্টার্স, ডব্লিউ. এইচ. ভি. লেভেট, বি. এইচ. ভ্যালেন্টিন, জে. এইচ. হিউম্যান, সি. এস. ম্যারিয়ট, সি. জে. বার্ণেট, এল. এফ. টাউন্সেণ্ড, জে. ল্যাংরিজ, এ. এইচ. বেকওয়েল, এ. মিচেল, এইচ. ভেরিটি, এইচ. ইলিয়ট, আর. জে. গ্রেগরী, এম. এস. নিকলস্ এবং ই. ডব্লিউ. ক্লার্ক।

খেলার ফলাফল—১৭টি জয়, ১৬টি ড্র, ১টি পরাজয়।

## ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে—জ্যাক রাইডারের অষ্ট্রেলিয়ান দল

এই দলে ছিলেন—জ্যাক রাইডার (অধিনায়ক), সি. জি. ম্যাকার্টিনি, এইচ. এইচ. আলেকজেণ্ডার, এ. এইচ. এলম্প, ও. ডব্লিউ. বিল, এফ. জে. ব্রায়েন্ট, জে. এল. এলিস, এইচ. এল. হেনড্রি, এইচ. আয়রনমঙ্গার, টি. ডব্লিউ. লেদার, এইচ. এস. লাভ, এফ. মেয়ার, আর. ও. মরস্‌বি, এল. ই. ন্যাগেল এবং আর. কে. অক্সেনহ্যাম।

ফলাফল—১১টি জয়, ৯টি ড্র, ৩টি পরাজয়।

## ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে—লর্ড টেনিসনের একাদশ

এই দলে ছিলেন—লর্ড টেনিসন (অধিনায়ক), ডব্লিউ. এডরিচ, টি. এস. ওয়ার্দ্দিংটন, এন. ডব্লিউ. ডি. ইয়ার্ডলে, জে. হার্ডষ্টাফ, জে. ল্যাংরিজ, জি. এইচ.

পোপ, এ. ডব্লিউ. ওয়েলার্ড, এইচ. পার্কস, এন. ম্যাককরকেল, পি. এ. গিব, টি. এ. আর. পিবিলস্, এ. আর. গোভার, পি. স্মিথ এবং টি. ও. জেমিসন।

ফলাফল—৮টি জয়, ১১টি ড্র, ৫টি পরাজয়।



জাহাজ থেকে নামবার পর বোম্বাই বন্দরে লর্ড টেনিসনের দল

**১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে—সিংহল দল**

এই দলে ছিলেন—এস. এস. জয়বিক্রম (অধিনায়ক), এম. কেলার্ট, এ. এইচ. গুণরত্নে, ডি. এস. জয়সুন্দর, আর. এ. কে. সোলোমনস, এইচ. এস. রবার্টস,

এফ. ডব্লিউ. পরিট, এম. ও. গুণরত্নে, ডি. এন. জিলা, জন পুল, জি. গুণরত্নে, এম. এ. ওহায়েদ, বি. নবরত্নে, আই. এইচ. ওয়ালবিয়ফ এবং ডব্লিউ. এল. মোণ্ডস।

ফলাফল—১টি জয়, ৩টি ড্র, ১টি পরাজয়।

## ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে—অষ্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দল

এই দলে ছিলেন—এ. এল. হ্যাসেট (অধিনায়ক), কে. আর. মিলার, ডি. আর. কারমডি, সি. জি. পেপার, .জে. পেটিফোর্ড, আর. এম. ষ্ট্যাণ্ডোর্ড, আর. এস. হুইটিংটন, সি. ডি. ব্রেমনার, এ. ডব্লিউ. রাইপার, জে. ওয়ার্কম্যান, আর. এস. এলিস, এস. জি. সিসমে, সি. এফ. প্রাইস, ডি. আর. ক্রিষ্টোফ্যানি এবং ই. এ. উইলিয়ামসন।

ফলাফল—১টি·জয়, ৬টি ড্র, ২টি পরাজয়।

## ১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল

এই দলে ছিলেন—জে. ডি. গডার্ড (অধিনায়ক), জে. বি. ষ্টলমেয়ার, ডি. এ্যাটকিনসন, এফ. জে. ক্যামেরন, জি. কেরু, আর. জে. ক্রিশ্চিয়ানী, ডব্লিউ. ফার্গুসন, সি. ই. গোমেজ, জি. হেডলী, পি. জোনস্, সি. এ. ম্যাকওয়াট, এ. এফ. রে, কে. রিকার্ড, জে. ট্রিম, সি. এল. ওয়ালকট এবং ই. ডি. উইকস্।

ফলাফল—৫টি জয়, ১১টি ড্র, ১টি পরাজয়।

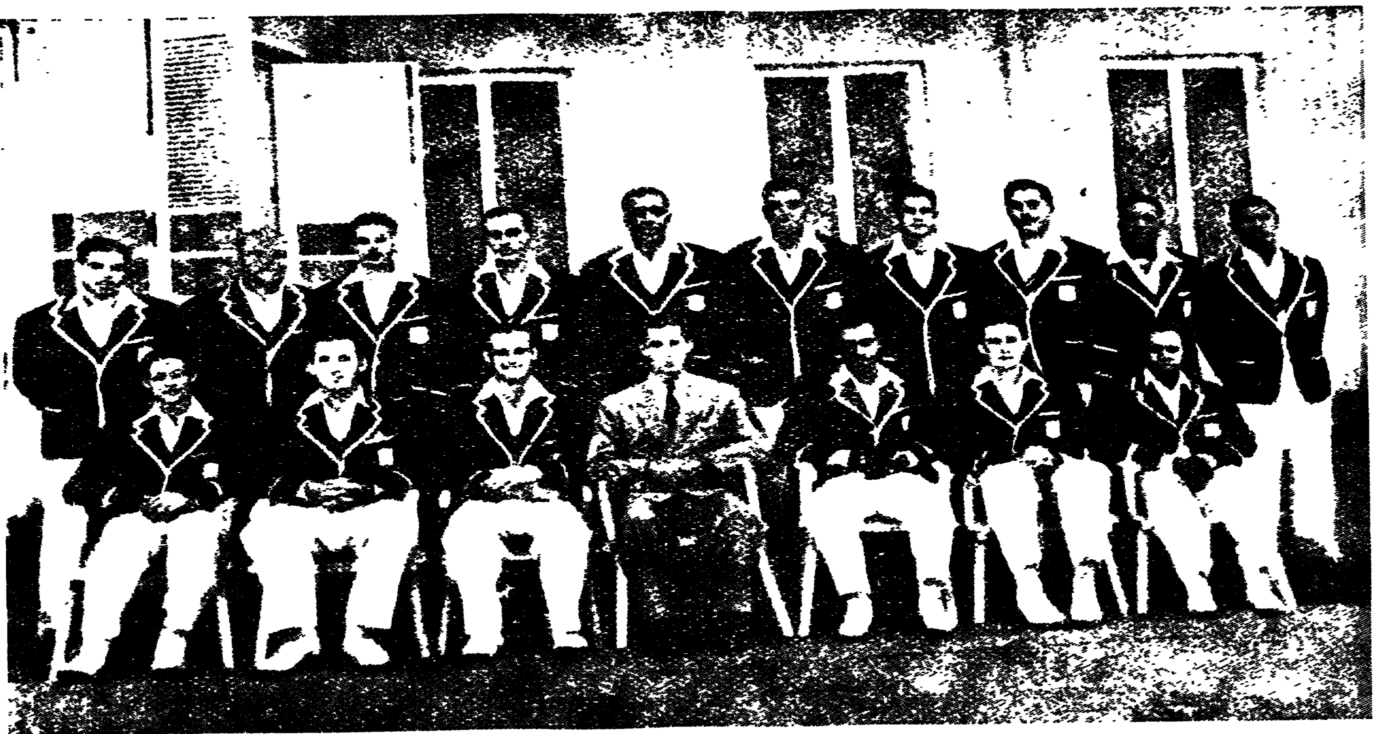
## ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে—প্রথম কমনওয়েলথ দল

এই দলে ছিলেন—এল. লিভিংষ্টোন (অধিনায়ক), ডব্লিউ. এ্যালে, জি. ডকস্, ডি. ফিটজ্‌মরিস, এফ. ডব্লিউ. ফ্রিয়ার, জে. কে. হোল্ট, এইচ. ল্যাম্বার্ট, ডব্লিউ. ল্যাংডন, এন. ওল্ডফিল্ড, জে. পেটিফোর্ড, সি. জি. পেপার, ডব্লিউ. প্লেস, জি. এইচ. পোপ, আর. স্মিথ, জি. ট্রাইব এবং এফ. এম. ওরেল।

ফলাফল—৮টি জয়, ৯টি ড্র, ২টি পরাজয়।

## ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে—দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দল

এই দলে ছিলেন—এল. ই. জি. এমস্ (অধিনায়ক·), এফ. এম. ওরেল, এ. টি. বার্লো, বি. ডুল্যাণ্ড, আর. আর. ডোভে, জি. এম. এমেট, এল. বি. ফিসলক, এইচ. গিম্বলেট, কে. গ্রিবস্, জে. টি. আইকিন, এল. জ্যাকসন, জে. সি. লেকার,



১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারত-ভ্রমণকারী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল

না গড়িয়ে দিয়ে গাছের ছোট ছোট ডাল কেটে নিয়ে ঐ খেলা চলতে লাগলো। সেই গাছের ডাল দিয়ে পাথর মারার খেলা থেকেই আজকের বেস্‌বল, হকি, ক্রিকেট, গল্‌ফ প্রভৃতি খেলার সৃষ্টি।

বিভিন্ন দেশের ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায়, তাতে দেখা যায় যে, হকি খেলার ন্যায় একরকমের খেলা প্রথম পারশ্য দেশে খেলা হতো। পারশ্য থেকে গ্রীসে এবং গ্রীস থেকে রোমে ক্রমশঃ খেলাটি প্রচলিত হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এথেন্সের এক আবিষ্কার থেকে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, এ খেলাটি নাকি প্রাচ্য দেশেই প্রথম প্রচলিত ছিল। আমেরিকাতে এবং লণ্ডনেও বহু বছর আগে থেকেই হকি-জাতীয় একপ্রকারের খেলার প্রচলন ছিল বলে শোনা যায়। যাই হোক একথা সত্য যে, ঐ সব খেলার সঙ্গে এখন যে হকি খেলা হয় তার মিল খুব কমই।

প্রায় ২,৫০০ বছর আগে গ্রীসে বর্ত্তমানের হকি খেলার সঙ্গে কিছুটা মিল আছে এই রকমের খেলা প্রথম খেলতে দেখা যায়। এর কয়েকশত বছর পরে ফ্রান্সে খেলাটি প্রচলিত হয়। ফ্রান্সের লোকেরা **হকেট** (hoquet) নামে খেলাটি খেলতে থাকে। ইংলণ্ডের লোকেরা ফ্রান্সের লোকেদের কাছ থেকে খেলাটি শিখে **হকে** (hokay) নামে খেলতে সুরু করে। ফ্রান্সের লোকেরা ইংলণ্ডের লোকেদের ন্যায় এই খেলাটাকে ‘হকে’ বলতে গিয়ে তাদের ভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী **হকি** (Hockey) করে নেয়। এখন অবশ্য পৃথিবীর সব দেশেতেই খেলাটির নাম ‘হকি খেলা’ বলা হয়।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে হকি খেলাকে প্রথমে কিছুটা বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে খেলতে দেখা যায়। এই সময়ে নিয়ম ছিল যে, ১৫ গজ দূর থেকে গোলে সট্ করতে না পারলে গোল হবে না। কিন্তু ঐ ১৫ গজ দূরে কোন দাগ কেটে সীমানা নির্দ্দিষ্ট করা থাকতো না।

হকি খেলার এক যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন হয় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে **উইম্বিলডন ক্লাব** প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। উইম্বিলডন ক্লাব পুরানো হকি খেলার নিয়মের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করে খেলাটিকে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেন। বর্ত্তমানে হকি খেলায় যে **ষ্টিক** ও **বল** নিয়ে খেলা হয়, তারও প্রথম প্রচলন করেন এই উইম্বিলডন ক্লাব। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী **ইংলণ্ডের হকি এসোসিয়েশন**-এর জন্ম হয় এবং এই সভাতেই বর্ত্তমানে প্রচলিত হকি খেলার অনেক আইন তৈরী হয়। এই কারণেই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারীকে অনেকে হকি খেলার জন্ম-তারিখ বলে উল্লেখ করেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে **কাউন্টি ম্যাচ** খেলা আরম্ভ হয়। প্রথম কাউন্টি ম্যাচ খেলা হয় 'সারে' এবং 'নিউজিল্যাণ্ড' দল হু'টির মধ্যে।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে **মহিলারা হকি খেলা সুরু করেন**। ক্রমশঃ হকি খেলা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলে বিভিন্ন দেশে হকি এসোসিয়েশন-এর সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দেশের এইসব হকি এসোসিয়েশনগুলির মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক রাখা এবং সকল দেশেই যাতে একই নিয়মে হকি খেলা পরিচালিত হয় সেই উদ্দেশ্যে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে একটি আন্তর্জাতিক হকি এসোসিয়েশন গঠনের জন্যে একটা সভা ডাকা হয়। এই সভায় আয়ার্ল্যাণ্ড এবং ওয়েলসের দুজন করে প্রতিনিধি যোগ দেন। বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে দিয়ে খেলার কিছু কিছু আইনের সংশোধন করা হয় এবং **আন্তর্জাতিক হকি বোর্ড** নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম **আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা** হয় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে। **১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অলিম্পিকে প্রথম হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।**

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ লণ্ডনের 'মটন এবেতে' যে আন্তর্জাতিক হকি সভা হয় সেই সভাতে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন গঠনের কথা আলোচনা হবার পর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এই আলোচনা অনুযায়ী **আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন** গঠন করা হয়। আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনই বর্ত্তমান বিশ্বের হকি পরিচালনার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান।

ভারতবর্ষে হকি খেলা সবথেকে বেশী প্রচলিত। কিন্তু এই খেলা ভারতীয়েরা প্রথম শিক্ষালাভ করেন ইংরেজদের কাছ থেকে। ভারতীয় ফৌজের লোকেরা ইংরেজ অফিসারদের কাছ থেকে খেলাটি শিখে ক্রমশঃ দেশের মধ্যে প্রচার করেন।

আজ ভারতীয় হকিদল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিশ্বের সকল জাতিকে পর পর পাঁচটি অলিম্পিকে হারিয়ে ভারত হকি খেলায় বিশ্ববিজয়ী।

## *ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশন ( আই. এইচ. এফ. )*

ভারতবর্ষে হকি খেলাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং ভারতীয় খেলার মানকে বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার সকল দায়িত্বই ইণ্ডিয়ান বা ভারতীয় হকি ফেডারেশনের। ভারতীয় হকি ফেডারেশনই ভারতের হকি খেলার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান।

১৯০৭ কিংবা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন হকি এসোসিয়েশনগুলিকে একটি কেন্দ্রীয়

প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এনে হকি খেলাকে পরিচালনা করবার প্রথম চেষ্টা করেন এ. বি. রসার, এন. আর. ভট্টাচার্য্য এবং টি. এইচ. রিচার্ডসন। কিন্তু এই চেষ্টা অনেকদূর এগিয়ে যাবার পর ব্যর্থ হয়।

১২ বছর পর আবার এই চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সেবারেও কোন ফল হয় না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব হকি এসোসিয়েশনের সভাপতি সি. ই. নিউহ্যাম এই কাজে আবার অগ্রণী হলেও সফলকাম হতে পারেন না।

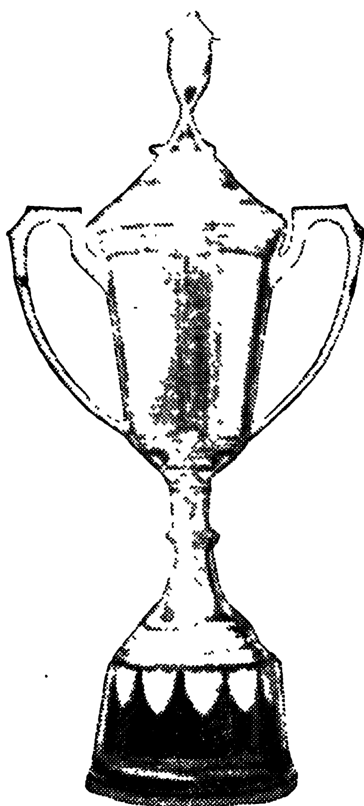
১৯২৪ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম-ভারত হকি এসোসিয়েশনের অনুরোধে গোয়ালিয়র স্পোর্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি লেঃ কর্ণেল সি. ই. লুয়ার্ড, সি. আই. ই. ভারতের বিভিন্ন হকি এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি ও হকি-উৎসাহীদের নিয়ে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় গোয়ালিয়র, বাঙ্গলা, সিন্ধু, রাজপুতানা, পশ্চিম ভারত, পাঞ্জাব এবং সার্ভিসেস কণ্ট্রোল বোর্ডের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে ভারতীয় হকি ফেডারেশন গঠন করেন। লেঃ কর্ণেল সি. ই. লুয়ার্ড ভারতীয় হকি ফেডারেশনের প্রথম সভাপতি এবং এন. এইচ. আন্সারী প্রথম সম্পাদক হিসাবে নির্ব্বাচিত হন। এই সভায় আরও ঠিক হয় যে, ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় অফিস গোয়ালিয়রেই থাকবে।

ভারতীয় হকি ফেডারেশন প্রকৃতপক্ষে কাজ সুরু করে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ থেকে। এই সময়ে ফেডারেশনের অফিসও গোয়ালিয়র থেকে দিল্লীতে নিয়ে আসা হয়। মেজর আই. বার্ণ মার্ডক্ ভারতীয় হকি ফেডারেশনের নূতন সভাপতি এবং টি. পি. গেট্‌লে নূতন সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ভারতীয় হকি ফেডারেশন গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালিয়র, সিন্ধু, রাজপুতানা, পাঞ্জাব, আর্ম্মি স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ড এবং লক্ষ্ণৌ এই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিছু পরে দিল্লীও যোগ দেয়। ভারতীয় রেলওয়েজ হকি এসোসিয়েশন ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে, বাঙ্গলা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে, এবং বোম্বাইতে কোন হকি এসোসিয়েশন এই সময়ে না থাকায় ও পশ্চিম-ভারত ফুটবল এসোসিয়েশন বোম্বাইয়ের হকি খেলা পরিচালনা করায় পশ্চিম-ভারত ফুটবল এসোসিয়েশন ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের মধ্যে প্রবেশ করে। এর পর অবশ্য ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হকি এসোসিয়েশন গঠিত হয়। বিহার-উড়িষ্যা ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে, মাদ্রাজ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে, মানভাদার রাজ্য ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে, এবং মধ্যভারত বা মধ্যপ্রদেশ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় হকি ফেডারেশনে যোগদান করে। ক্রমশঃ মহীশূব, পাতিয়ালা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বরোদা, বেলুচিস্তান এবং হায়দ্রাবাদ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

## আন্তঃরাজ্য বা জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

ভারতীয় হকি ফেডারেশন গঠিত হবার পর ফেডারেশনের কর্ত্তৃপক্ষ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আমষ্টার্ডাম অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দল পাঠানো হবে বলে স্থির করেন। এই উদ্দেশ্যে সমস্ত ভারতের মধ্যে থেকে কি করে খেলোয়াড় বাছাই করা যায়, এ নিয়ে আলোচনা হবার পর ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করেন যে, যদি এমন একটা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করা যায় যাতে সমস্ত প্রদেশের বাছাই-করা খেলোয়াড়েরা অংশ গ্রহণ করতে পারে তাহলে খেলোয়াড় বাছাই করার সুবিধা হয়। ফলে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। এই আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতাকে বর্ত্তমানে আন্তঃরাজ্য বা জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা বলা হয়।


রঙ্গস্বামী কাপ

প্রথম বছরে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। পাঞ্জাব, বাঙ্গলা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও রাজপুতানা দল প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ফাইন্যালে উত্তরপ্রদেশ রাজপুতানা দলকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে এই প্রতিযোগিতায় প্রথম জয়লাভ করবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করে।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একবছর অন্তর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে অবশ্য কোন খেলা হয় না। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে আন্তঃরাজ্য বা জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয় এবং সেই কারণেই ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রতিযোগিতাটি প্রতিবছরই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে যে কাপটি দেওয়া হয়, তার নাম রঙ্গস্বামী কাপ।

রঙ্গস্বামী কাপ প্রচলিত হবার আগে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী

দলকে 'মেওয়ারী শীল্ড' দেওয়া হতো। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় হকি দল নিউজিল্যাণ্ড সফরের সময়ে নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপের আদিম অধিবাসী মেওয়ারীরা ভারতীয় দলকে প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ এই শীল্ডটি উপহার দেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারতীয় হকি ফেডারেশন বিজয়ী দলকে এই শীল্ডটি উপহার দিয়ে আসছিলেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব দল এই শীল্ডটি লাভ করে। ভারত বিভক্ত হবার পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারতীয় হকি ফেডারেশন পাকিস্তানের অন্তর্গত পাঞ্জাব থেকে এই শীল্ডটি উদ্ধার করার সকলপ্রকার চেষ্টা করেও ব্যর্থকাম হওয়ায় ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত বিজয়ী রাজ্যদলকে কোন কাপ বা শীল্ড উপহার দেওয়া সম্ভব হয় না।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে যখন মাদ্রাজে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, তখন মাদ্রাজ হকি এসোসিয়েশনের চেষ্টায় 'হিন্দু ও স্পোর্টস্ এ্যাণ্ড প্যাস্ট টাইম্‌স'-এর কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁদের হকি খেলায় উৎসাহী মৃত সম্পাদক এস. রঙ্গস্বামীর নামে বর্ত্তমানের এই কাপটি উপহার দেন। এই উপহার দেওয়া দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে মাদ্রাজের 'উবেরায়' কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীধাওয়ান বিজিত দলের জন্যেও একটি সুদৃশ্য কাপ উপহার দেন।

## বাইটন কাপ

বর্ত্তমানে ভারতে যে ক'টি হকি প্রতিযোগিতা হয় তার মধ্যে বাইটন কাপের খেলা অন্যতম শ্রেষ্ঠ। ভারতের সকল রাজ্যের, এমনকি ভারতের বাহিরের বিভিন্ন শক্তিশালী দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে বাইটন কাপের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর প্রতিটি খেলার মীমাংসা হয় বলেই বাইটন কাপ-এ জয়লাভ করা যে-কোন দলের পক্ষেই গৌরবজনক।


বাইটন কাপ

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা সরকারের আইন-উপদেষ্টা টি. ডি. বাইটন এই কাপটি উপহার দেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ থেকে বাইটন কাপের প্রতিযোগিতা সুরু হয়।

এখন যে বাইটন কাপটি খেলা হয় সেটা কিন্তু টি. ডি. বাইটনের দেওয়া 'বাইটন কাপ' নয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আসানসোল রিক্রিয়েশন ক্লাব এই কাপটি জয়লাভ করে আসানসোল নিয়ে

যায়। আসানসোল রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট থেকে কাপটি চুরি যায়। ফলে আসানসোল রিক্রিয়েশন ক্লাব এবং বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের মিলিত সাহায্যে আবার একটি নূতন কাপ তৈরী করে দেওয়া হয়।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ঠিক হয় যে বাইটন কাপের ফাইন্যাল খেলা পর পর দুদিন অমীমাংসিত ভাবে শেষ হলে উভয় দলকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হবে।

প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় অর্থাৎ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ন্যাভাল ভলেন্টিয়ার্স দল (যাকে বর্ত্তমানে 'রেঞ্জার্স ক্লাব' বলা হয়) বাইটন কাপ বিজয়ী হয়।

বাইটন কাপ পরিচালনার সকল দায়িত্বই এখন বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের উপর ন্যস্ত।

## *পর পর পাঁচটি অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের জয়লাভের কথা*

অলিম্পিকের হকি খেলায় যোগদান করা থেকে ভারতীয় হকি দলকে কোন দল পরাজিত করতে পারেনি। পর পর পাঁচটি অলিম্পিকে বিশ্বের সকল হকিদল, একের পর এক, ভারতীয় দলের কাছে পরাজিত হয়েছে। ভারতীয় হকি খেলোয়াড়দের সুনিপুণ ও ক্ষিপ্র ষ্টিকের চাতুর্য্য দেখে সমস্ত বিশ্বের খেলোয়াড়েরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছে।



ভারতীয় হকির বিস্ময় যাদুকর ধ্যানচাঁদ

ভারতীয় হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদের ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখে সকলে প্রশ্ন করেছে,—পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে সামান্য একটা ষ্টিকের সাহায্যে একটা দ্রুত চলমান বলকে এভাবে আয়ত্ত করা কি করে সম্ভব? কিন্তু সেই অসম্ভবকে যিনি সম্ভব করেছেন, চোখের নিমেষে বিপক্ষের সকল বাধাকে ধূলিসাৎ করে যিনি একের পর এক নিজ দলকে জয়লাভের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সেই বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ধ্যানচাঁদকে 'হকি যাদুকর' নামে সারা বিশ্ব বরণ করে নিয়েছে।

হকি খেলাতে ভারতবর্ষ একমাত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দল হিসাবে সম্মানের অধিকারী। পর পর পাঁচটি অলিম্পিকে কোন জাতি কোন বিশেষ একটি খেলায় বিজয়ীর

সম্মান আজও লাভ করতে পারেনি। ভারতীয় হকি খেলোয়াড়েরা ভারতকে সেই গৌরবজনক সম্মানে ভূষিত করেছেন।

## ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আমষ্টার্ডাম অলিম্পিক

ভারত অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার আগে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এণ্টোয়ার্পে মাত্র দুবার হকি প্রতিযোগিতা হয়। ঐ দুটো অলিম্পিকেই ইংলণ্ড জয়লাভ করে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, ওয়েলস, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মধ্যে খেলা হয়। ফাইন্যালে ইংলণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ডকে ৮-১ গোলে পরাজিত করে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক ও ফ্রান্স—এই চারটি দেশ যোগদান করায় লীগ-পদ্ধতিতে খেলা হয়। ইংলণ্ড অন্য তিনটি দলকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার জয়ী হয়।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের অলিম্পিকে হকি খেলাকে স্থান দেওয়া হয় না। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের চেষ্টায় আমষ্টার্ডামে আবার হকি খেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অনেক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও মাত্র তেরজন খেলোয়াড় ম্যানেজার এ. বি. রসারের তত্ত্বাবধানে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ কাইজার-ই-হিন্দ জাহাজ-যোগে আমষ্টার্ডামের পথে যাত্রা করেন। মনে তাদের অনেক আশা। ভারত তখনও কোন আন্তর্জাতিক খেলায় জয়লাভ করতে পারেনি। যদি সেই সম্মান ভারতের জন্যে তারা আনতে পাবেন। যাত্রার দিনে ভারতীয় জনসাধারণের কাছ থেকে কোন উৎসাহ বা ভরসাও তাঁরা পান না। মাত্র তিনজন ভারতীয়, তার মধ্যে দুজন হকি ফেডারেশনের কর্ম্মকর্ত্তা, বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাতে জাহাজঘাটে যান।

খেলোয়াড় হিসাবে যাঁরা এই দলের সঙ্গে যান তাঁরা হলেন : গোল—আর জে. এ্যালেন (বাঙ্গলা); ব্যাক—এম. রক (মধ্যপ্রদেশ) ও এল. হ্যামণ্ড (যুক্তপ্রদেশ); হাফব্যাক—খেরসিং (পাঞ্জাব), আর. নরিস (মধ্যপ্রদেশ), ই. পিনিজার (পাঞ্জাব) ও ডব্লিউ. জে. জি. কালেন (যুক্তপ্রদেশ); ফরোয়ার্ড—এম. গেটলি (পাঞ্জাব), ফিরোজ খাঁ (পাঞ্জাব), সৌকত আলী (বাঙ্গলা), ধ্যানচাঁদ (যুক্তপ্রদেশ), জি. মার্থিনস্ (যুক্তপ্রদেশ) এবং এফ. সীম্যান (যুক্তপ্রদেশ)।

এই সময় জয়পাল সিং অক্সফোর্ডে পড়ছিলেন, তাঁকেই দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত করা হয়। পাতৌদির নবাবও এ সময়ে বিলেতে পড়ছিলেন, তাঁকেও দলভুক্ত করা হয়। জয়পাল সিং কয়েকটি খেলায় ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করবার

পর অজ্ঞাত কারণে দলের কাছ থেকে বিদায় নেন। ফলে বাকী খেলাগুলিতে পিনিজারকেই নেতৃত্ব করতে হয়।

এই ভারতীয় হকি দল প্রথম আন্তর্জাতিক খেলায় যোগদান করে বিশ্বের সেরা দলগুলিকে যেভাবে হারিয়ে দেয় তা স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন ইতিহাসে লেখা থাকবে। যাত্রার পথে বোম্বাই একাদশের কাছে ২-১ গোলে এবং টিল্‌বারি ডকে সম্মিলিত সেনাদলের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হওয়া ছাড়া মনসারগস্‌ দলের সঙ্গে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ হয়। অলিম্পিক খেলা ছাড়াও বাকী আর ১২টি খেলাতেই ভারতীয় দল জয়লাভ করে।

অলিম্পিকের খেলায় অষ্ট্রিয়াকে ৬-০ গোলে, বেলজিয়ামকে ৯-০ গোলে, ডেনমার্ককে ৫-০ গোলে, সুইজারল্যাণ্ডকে ৬-০ গোলে এবং হল্যাণ্ডকে৩-০ গোলে পরাজিত করে ভারতীয় দল অলিম্পিকের জয়মাল্য লাভ করে। ভারতীয় দলের বিপক্ষে কোন দলই একটি গোলও করতে পারে না। সমস্ত বিশ্ব বিস্মিত হয় ভারতীয় হকি খেলোয়াড়দের প্রতিভা দেখে।

## ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে লস এঞ্জেল্‌স অলিম্পিক

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ভারত অনেক আর্থিক অসুবিধার মধ্যে দ্বিতীয়বার দল পাঠায় লস এঞ্জেল্‌সে। দলের অধিনায়ক হিসাবে নির্ব্বাচিত হন লাল শা বোখারি। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়েরা ছিলেন ঃ গোল—আর. জে. এ্যালেন ( বাঙ্গলা ) ও এ. সি. হিন্দ ( পাঞ্জাব ) ; ব্যাক—সি. ট্যাপসেল ( বাঙ্গলা ), এল. সি. হ্যামণ্ড ( যুক্ত-প্রদেশ ) ও এস. আলম ( পাঞ্জাব ) ; হাফব্যাক—এফ. বিডন ( বোম্বাই ), লাল শা বোখারি ( পাঞ্জাব ), মামুদ মিনহাস ( পাঞ্জাব ) ও ই. পিনিজার ( পাঞ্জাব ) ; ফরোয়ার্ড—আর. কার ( বাঙ্গলা ), গুরমিত সিং ( যুক্তপ্রদেশ ), ধ্যানচাঁদ ( আর্ম্মি ), রূপসিং ( যুক্তপ্রদেশ ), এম. জাফর ( পাঞ্জাব ) ও ডব্লিউ. পি. সুলিভ্যান ( বোম্বাই )। ম্যানেজার—জি. বি. সোন্ধী ; সহকারী ম্যানেজার—পঙ্কজ গুপ্ত।

এই অলিম্পিকে মাত্র তিনটি দেশ যোগদান করায় লীগ প্রথায় খেলা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক দলকেই বাকী দুটো দলের সঙ্গে খেলতে হয়।

ভারত প্রথম খেলায় জাপানের বিরুদ্ধে ১১-১ গোলে জয়লাভ করে। এই খেলার পর জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে খেলা হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র এই খেলায় জাপানকে হারিয়ে দেওয়ায় ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে খেলতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারত ২৪-১ গোলে জয়লাভ করে অলিম্পিকের হকি খেলায় গোল

দেবার এক বিশ্ব-রেকর্ড স্থষ্টি করে। এইভাবে ভারত পর পর দুবার অলিম্পিক বিজয়ী হয়।

অলিম্পিকে জয়লাভ করবার পর ভারতীয় দল নিউইয়র্ক, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, হল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া—এক কথায় সমস্ত ইউরোপ প্রদক্ষিণ করে। মোট ৩৭টি খেলায় যোগ দিয়ে ভারতীয় দল অপরাজিত থেকে স্বদেশে ফিরে আসে। ৩৭টি খেলার মধ্যে ৩৫টি খেলায় জয়লাভ ও মাত্র ২টি খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। সবসমেত ভারতীয় দল ৩৩৮টি গোল করে, এর মধ্যে ধ্যানচাঁদ একাই ১৩৩টি গোল করেন। ভারতের বিপক্ষে গোল হয় মাত্র ৩৪টি।

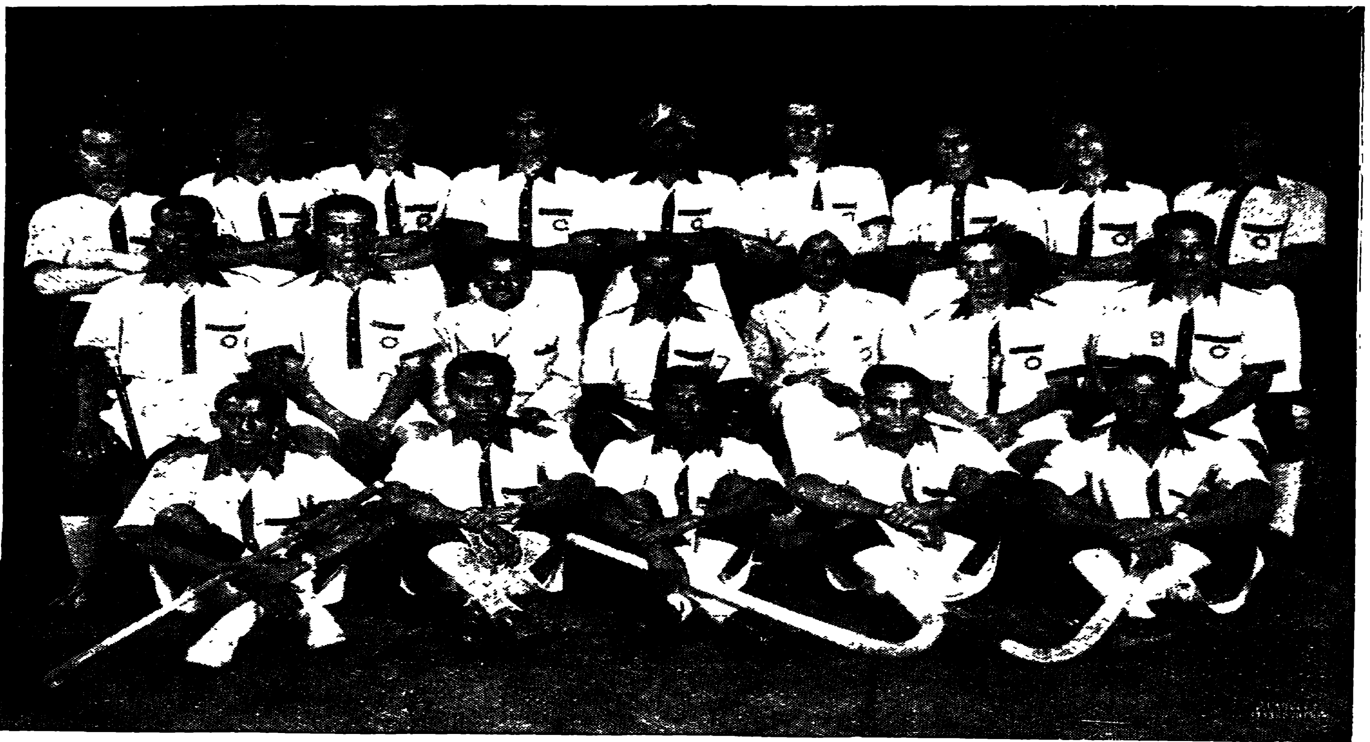
ভারতের অধিকাংশ হকি সমালোচকদের মতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে হকি দলকে সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে ধরা হয়।

## ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিন অলিম্পিক

ধ্যানচাঁদের নেতৃত্বে তৃতীয়বার ভারতীয় দল পাঠানো হয় বিশ্ববিজয়ীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে বার্লিনে। ভারতীয় দলের জন্যে নির্ব্বাচিত হন: গোল— আর. জে. এ্যালেন ( বাঙ্গলা ) ও সি. জে. মিকি ( রেল ); ব্যাক—সি. ট্যাপসেল ( বাঙ্গলা ), মহম্মদ হোসেন ( মানভাদার ), গুরচরণ সিং ( পাঞ্জাব ) ও জে. ফিলিপস্ ( বোম্বাই ); হাফব্যাক—ই. কালেন ( মাদ্রাজ ), এম. এল. মাসুদ ( মানভাদার ), বিনিমল ( বোম্বাই ), জে. গ্যলিবার্ডি ( বাঙ্গলা ) ও আসান মহম্মদ খাঁ ( মানভাদার ); ফরোয়ার্ড—এল. সি. এমেট ( বাঙ্গলা ), সাহাবুদ্দিন ( মানভাদার ), ধ্যানচাঁদ ( আর্ম্মি ), রূপ সিং ( যুক্তপ্রদেশ ), এস. এম. জাফর ( পাঞ্জাব ), পি. ফার্নাণ্ডেজ ( সিন্ধু ), আলী ইফতিকার শা বা দারা ( আর্ম্মি ) ও আমেদ সের। ম্যানেজার—অধ্যাপক জগন্নাথ, সহকারী ম্যানেজার— পঙ্কজ গুপ্ত।

অলিম্পিকের প্রতিযোগিতায় ভারত হাঙ্গেরীকে ৪-০ গোলে, যুক্তরাষ্ট্রকে ৭-০ গোলে, জাপানকে ৯-০ গোলে, ফ্রান্সকে ১০-০ গোলে এবং জার্ম্মানীকে ৮-১ গোলে পরাজিত করে পর পর তিনবার অলিম্পিক বিজয়ী হবার গৌরব লাভ করে।

এই সফরে ভারতীয় দল ৪০টি খেলায় যোগ দিয়ে ৩৭টি খেলায় জয়ী হয়, ১টি খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয় এবং ২টি খেলায় পরাজিত হয়। ভারত যে ২টি খেলায় পরাজিত হয় তার একটি হলো, ভারত ছাড়ার আগে দিল্লীর বাছাই দলের কাছে ৪-১ গোলে এবং অপর খেলাটি, অলিম্পিকের ঠিক আগে, জার্ম্মান



১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিন অলিম্পিকে যোগদানকারী ভারতীয় হকিদল

একাদশের কাছে ৪-১ গোলে। অমীমাংসিত খেলাটি হয় বার্লিন একাদশ ও ভারতীয় দলের মধ্যে ৩-৩ গোলে।

## ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন অলিম্পিক

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে চতুর্থবার ভারতীয় দল পাঠানো হয় লণ্ডন অলিম্পিকে। এবারে দলের নেতৃত্বের ভার পড়ে বোম্বায়ের কিষেণলালের ওপরে। ভারতীয় দলের খেলোয়াড় হিসাবে নির্ব্বাচিত হন: গোল—লিও পিণ্টো (বোম্বাই) ও আর. ফ্রান্সিস (মাদ্রাজ); ব্যাক—ত্রিলোচন সিং (পাঞ্জাব), আর. এস. জেণ্টল (বোম্বাই), ডব্লিউ. ডি. সুজা (বোম্বাই) ও আখতার হোসেন (ভূপাল); হাফব্যাক—এল. ক্লডিয়াস (বাঙ্গলা), কেশব দত্ত (বোম্বাই), আমীরকুমার (বোম্বাই), ম্যাক্সি ভাজ (বোম্বাই) ও যশোবন্ত রাজপুত (দিল্লী); ফরোয়ার্ড—কিষেণলাল (বোম্বাই), দিগ্‌বিজয় সিং [বাবু] (উত্তরপ্রদেশ), গ্রহনন্দন সিং (বাঙ্গলা), জি. গ্ল্যাকেন (বাঙ্গলা), প্যাট জ্যানসেন (বাঙ্গলা), বলবীর সিং (পাঞ্জাব), আর রডরিগস্ (বোম্বাই), লরি ফার্নাণ্ডেজ (বোম্বাই) এবং লতিফুর রহমান (ভূপাল)। ম্যানেজার—ডাঃ এ. সি. চ্যাটার্জ্জী, সহকারী ম্যানেজার—পঙ্কজ গুপ্ত।

অলিম্পিকের খেলায় ভারত অষ্ট্রিয়াকে ৮-০ গোলে, আর্জ্জেণ্টিনাকে ৯-১ গোলে, এবং স্পেনকে ২-০ গোলে পরাজিত করে সেমিফাইন্যালে হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২-১ গোলে জয়লাভ করে। ফাইন্যালে গ্রেটবৃটেনের সঙ্গে খেলায় ভারত সহজেই ৪-০ গোলে গ্রেটবৃটেনকে হারিয়ে পর পর চতুর্থবার অলিম্পিক বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের এই জয়লাভে তাদের তেরঙা নিশান অন্যান্য বিজয়ী জাতিগুলির নিশানের সঙ্গে পত্‌ পত্‌ করে ওড়ে।

ভারতীয় দল স্বদেশে এবং বিদেশে সবসমেত ২৬টি খেলায় যোগ দিয়ে অপরাজিত অবস্থায় দেশে ফিরে আসে।

## ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে হেলসিঙ্কি অলিম্পিক

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে পঞ্চমবার ভারতীয় দল তাদের গত ২৫ বছরের বিজয়ীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে যাত্রা করে হেলসিঙ্কির পথে। দিগ্‌বিজয় সিং (বাবু)-কে এবার অধিনায়ক করা হয়। ভারতীয় দলের খেলোয়াড় হিসাবে নির্ব্বাচিত হন:—গোল—দেশমুথু (মহীশূর) ও ফ্রান্সিস (মাদ্রাজ); ব্যাক—স্বরূপ সিং (সার্ভিসেস), আর. এস. জেণ্টল (বোম্বাই) ও ধরম সিং (পাঞ্জাব);



১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন অলিম্পিকে যোগদানকারী ভারতীয় হকিদল



১৯৫২ খৃষ্টাব্দের হেলসিঙ্কি অলিম্পিক-বিজয়ী ভারতীয় হকি খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু

হাফব্যাক—আর. ডালুজ (বাঙ্গলা), এল. ক্লডিয়াস (বাঙ্গলা), কেশব দত্ত (বাঙ্গলা), যশোবন্ত রাজপুত (বাঙ্গলা) ও পেরুমল (বোম্বাই); ফরোয়ার্ড—সি. এস. দুবে (বাঙ্গলা), রাঘবীরলাল (পাঞ্জাব), উধম সিং (পাঞ্জাব), বলবীর সিং (পাঞ্জাব), কে. ডি. সিং [বাবু] (উত্তরপ্রদেশ), গ্রহনন্দন সিং [নন্দী সিং] (সার্ভিসেস) এবং সি. এস, গুরুং (বাঙ্গলা)। ম্যানেজার—এম. এল. মিত্র, শিক্ষক—হরবেল সিং।

অলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতায় ভারত প্রথম রাউণ্ডে অষ্ট্রিয়াকে ৪-০ গোলে পরাজিত করে সেমিফাইন্যালে ওঠে। সেমিফাইন্যালে গ্রেটবৃটেনের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩-১ গোলে জয়লাভ করবার পর ভারতকে ফাইন্যাল খেলায় অবতীর্ণ হতে হয় নেদারল্যাণ্ড বা হল্যাণ্ডের সঙ্গে। হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতকে জয়লাভ করতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। সহজেই ৬-১ গোলে পরাজিত করে ভারত পর পর পাঁচটি অলিম্পিকে জয়লাভ করে এক অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করে।

## ভারতীয় হকিদলের বিদেশ সফর

অলিম্পিক প্রতিযোগিতা ছাড়া ভারতীয় হকিদল যে কয়েকবার বিদেশ সফর করেছে সেই সফরগুলির তালিকা, ফলাফল এবং খেলোয়াড়দের নাম এখানে দেওয়া হল।

### ফৌজী দলের নিউজিল্যাণ্ড সফর

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের আগে কোন ভারতীয় দল কখনো ভারতের বাইরে খেলতে যায়নি। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের সৈন্যদলের মধ্য থেকে বাছাই-করা একটি দল প্রথম নিউজিল্যাণ্ড সফরে যায়। ভারতীয় হকি ফেডারেশন এই সময়ে সৃষ্টি হয়নি, এমন কি অনেক প্রাদেশিক এসোসিয়েশনও তখনও জন্মলাভ করেনি। সুতরাং এই ফৌজী দলকে সরকারীভাবে ভারতীয় দল হিসেবে আখ্যা দেওয়া না গেলেও, ভারতীয় হকি খেলার সুনাম এই সফরের মধ্য দিয়াই প্রথম ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। হকি-যাদুকর ধ্যানচাঁদ এই সফরের মধ্য দিয়েই তাঁর প্রতিভা প্রকাশ করবার সুযোগ পান।

নিউজিল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় ফৌজী দল মোট ২১টি খেলায় অংশগ্রহণ ক'রে ১৮টি খেলায় জয়লাভ করে, ২টি খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয় এবং ১টি খেলায় পরাজিত হয়।

ফৌজী দল এবং নিউজিল্যাণ্ডের মধ্যে যে ৩টি টেষ্ট খেলা হয় তার মধ্যে একমাত্র দ্বিতীয় টেষ্টে ভারতীয় দলকে পরাজিত হতে হয়, অন্য দুটি টেষ্টের মধ্যে একটিতে ভারতীয় দল জয়লাভ করে এবং অন্যটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

ফৌজী দল ১৯২টি গোল দিয়ে মাত্র ২৪টি গোল খেয়ে আসে।

## ভারতীয় দলের নিউজিল্যাণ্ড সফর

নিউজিল্যাণ্ডের আমন্ত্রণে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় হকি ফেডারেশন নিউজিল্যাণ্ডে ভারতীয় হকি দল পাঠাবার সিদ্ধান্ত করেন। ভারতীয় দলের জন্য নির্ব্বাচিত হন :—

গোল—টি. ব্লেক ( সিন্ধু ) ও নির্ম্মল মুখার্জ্জী ( বাঙ্গলা ); ব্যাক—মহম্মদ হুসেন ( মানভাদার ), পি. দাস ( বাঙ্গলা ) ও রসিদ আমেদ ( পাঞ্জাব ); হাফব্যাক—ই. নেষ্টর ( বাঙ্গলা ), এস. মাসুদ ( মানভাদার ), এস. জে. গোপালন ( মাদ্রাজ ) ও মহম্মদ নাইম ( পাঞ্জাব ); ফরোয়ার্ড—সাহাবুদ্দিন ( মানভাদার ), এল. ডেভিডসন ( বাঙ্গলা ), ধ্যানচাঁদ ( আর্ম্মি ), রূপসিং ( গোয়ালিয়র ), মানভাদারের নবাব ( অধিনায়ক ), বি. পি. অগ্নিহোত্রী ( যুক্তপ্রদেশ ) ও আর. কার ( বাঙ্গলা )।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মানভাদারের নবাব, আর. কার এবং অগ্নিহোত্রী সফরে যেতে অক্ষমতা জানানোর ফলে তাঁদের স্থানে ফ্রাঙ্ক ওয়েলস ( বাঙ্গলা ), ফার্নাণ্ডেজ ( সিন্ধু ) এবং হরবেল সিংকে ( পাঞ্জাব ) নির্ব্বাচিত করা হয়। ধ্যানচাঁদ দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হন।

এই সফরে ভারতীয় দল ৪৮টি খেলায় অংশগ্রহণ করে এবং সব খেলাতেই জয়ী হয়।

ভারতীয় দল ৫৮৪টি গোল করে এবং মাত্র ৪০টি গোল ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে হয়। ধ্যানচাঁদ এই সফরে সবথেকে বেশী—২০১টি গোল করেন।

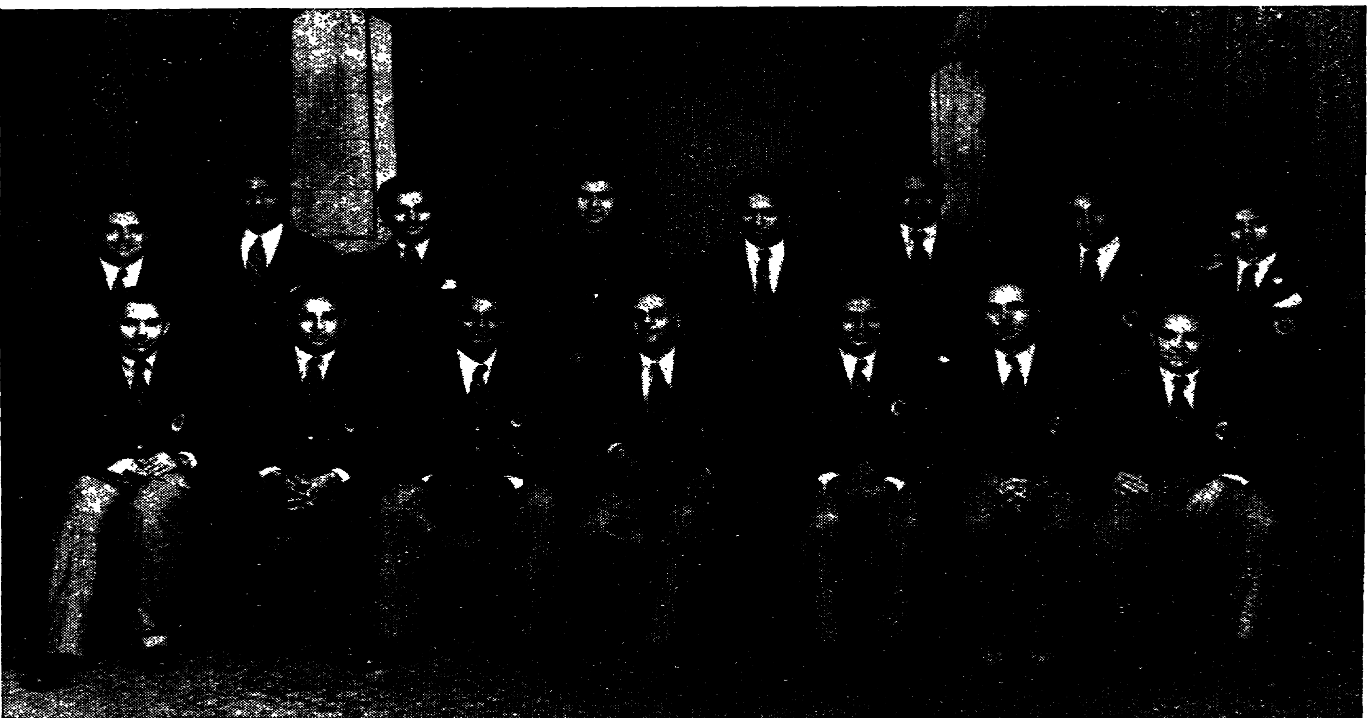
## ভারতীয় দলের পূর্ব্ব আফ্রিকা সফর

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব আফ্রিকার এশিয়ান স্পোর্টস এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে ভারতীয় হকি ফেডারেশন ভারতীয় দলকে পূর্ব আফ্রিকা সফরে পাঠান। ভারতীয় দলের জন্য নির্ব্বাচিত হন :—

গোল—লিও পিন্টো ( বোম্বাই ) ও সি. ফ্রান্সিস ( মাদ্রাজ ); ব্যাক—ওয়াল্টার ডি. সুজা ( বোম্বাই ), আর. এস. জেণ্টল ( দিল্লী ) ও মুস্তাক আমেদ ( বাঙ্গলা ); হাফব্যাক—কেশব দত্ত ( পাঞ্জাব ), বি. কাপুর ( বাঙ্গলা ),



১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে নিউজিল্যাণ্ড সফরকারী ভারতীয় হকিদল



১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব আফ্রিকা সফরকারী ভারতীয় হকিদল

ম্যাক্সি ভাজ ( বোম্বাই ) ও লেঃ মান্না সিং ( গোয়ালিয়র ) ; ফরোয়ার্ড—আর. কার ( বাঙ্গলা ), দিগ্‌বিজয় সিং [ বাবু ] ( ইউ. পি. ), কিষেণলাল ( বোম্বাই ), প্যাট জ্যানসেন ( বাঙ্গলা ), গুরবচন সিং ( পাঞ্জাব ), রাজাগোপাল ( মহীশূর ), লেঃ এ. সকুর ( ভূপাল ) ও লেঃ ধ্যানচাঁদ ( অধিনায়ক—আর্ম্মি )।

ভারতীয় দল এই সফরে ২৮টি খেলায় অংশগ্রহণ করে এবং সব খেলাতেই জয়ী হয়। ভারতীয় দল সব খেলাগুলিতে মোট ২৮০টি গোল করে এবং ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে মাত্র ৯টি গোল হয়।

দিগ্‌বিজয় সিং ( বাবু ) এই সফরে সবথেকে বেশী—৭০টি গোল করেন।

## ভারতীয় দলের দ্বিতীয়বার পূর্ব্ব আফ্রিকা সফর

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া হকি এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে ভারতীয় হকি ফেডারেশন ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর আবার একটি ভারতীয় দলকে পূর্ব্ব আফ্রিকা সফরে পাঠান। ভারতীয় দলের জন্য নির্ব্বাচিত হন :—

গোল—দেশমুথু ( মহীশূর ) ও মেহের সিং ( পাতিয়ালা ) ; ব্যাক—ওয়াহেদুল্লা ( উত্তরপ্রদেশ ), আর. এস. জেন্টল ( বোম্বাই ) ও ডি. পাল ( বাঙ্গলা ) ; হাফব্যাক—পেরুমল ও পেরেরা ( বোম্বাই ), হুসেন আলি ( উত্তর-প্রদেশ ) ও ক্লডিয়াস ( বাঙ্গলা ) ; ফরোয়ার্ড—সি. এস. দুবে ( বাঙ্গলা ), দিগ্‌বিজয় সিং [ বাবু ] ( অধিনায়ক—উত্তরপ্রদেশ ), হরদয়াল সিং ( আর্ম্মি ), জে. এস. কাকা ( দিল্লী ), রাজাগোপাল ( মহীশূর ), গুরবচন সিং ( দিল্লী ) ও শিবপ্রকাশ ( মাদ্রাজ )।

ভারতীয় দল এই সফরে ৩৩টি খেলায় অংশগ্রহণ করে, ৩০টি খেলায় জয়ী হয় এবং বাকী খেলাগুলি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। ভারতীয় দল ২৮০টি গোল করে এবং ভারতীয় দলের বিপক্ষে মাত্র ৯টি গোল হয়।

নাইরোবীতে ভারত ও পূর্ব্ব আফ্রিকার মধ্যে যে একটি মাত্র বেসরকারী টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয় সেই খেলায় ভারত সহজেই ৬-০ গোলে জয়ী হয়।

ভারতীয় দলকে এই সফরে নাইরোবীতে মহিলা হকিদলের সঙ্গে একটি প্রদর্শনী খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। এক হাতে ষ্টিক ধরে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়েরা খেলেন এবং খেলাটি পরিচালনা করেন আর. এস. জেন্টল। খেলাটি ২-২ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

দিগ্‌বিজয় সিং ( বাবু ) এই সফরে সবথেকে বেশী—৯৯টি গোল করেন।



১৯৫১ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব আফ্রিকা সফরকারী ভারতীয় হকিদল

## ভারতীয় দলের মালয় সফর

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় হকি ফেডারেশন মালয় সফরের জন্যে একটি দল পাঠান। ভারতীয় দলের জন্য নির্ব্বাচিত হনঃ—

গোল—ফ্রান্সিস (মাদ্রাজ) ও রামপ্রকাশ (পাঞ্জাব); ব্যাক—আবিদ আলী (ইউ- পি.), আর. এস. জেন্টল (বোম্বাই) ও বকশিস সিং (পাঞ্জাব); হাফব্যাক—পাদাভত (মাদ্রাজ), মিডিলকোট (বোম্বাই), মালহোত্র (ইউ. পি.) ও ক্লডিয়াস (বাঙ্গলা); ফরোয়ার্ড—বলবীর সিং (অধিনায়ক—পাঞ্জাব), ভাস্করণ (বাঙ্গলা), জে. ডি' মেলো (বোম্বাই), আর. এস. রানা (সার্ভিসেস), সুশীনাথন (মাদ্রাজ), রাজাগোপাল (মহীশূর), আর. এস. ভোলা (সার্ভিসেস) ও রাঘ্‌বীরলাল (পাঞ্জাব)।

ভারতীয় দল এই সফরে ১৬টি খেলায় অংশগ্রহণ করে এবং সব ক'টি খেলাতেই জয়ী হয়। ভারতীয় দল ১২১টি গোল ক'রে মাত্র ৭টি গোল খায়।

বলবীর সিং সবথেকে বেশী—৪৫টি গোল করেন।

ব্যাডমিণ্টন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ক্যানাডায় ব্যাডমিণ্টন খেলা প্রচলিত হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের সৃষ্টি হয় এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে আমেরিকার জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। **১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন গঠিত হয়।**

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা **টমাস কাপ**-এর খেলা আরম্ভ হয়।

ভারতবর্ষে ব্যাডমিণ্টন খেলার সৃষ্টি হলেও, বর্ত্তমানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যাডমিণ্টন খেলা সুরু হয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি শরৎকুমার মিত্র কলকাতায় তাঁর নিজের বাড়ী ৮৬নং গ্রে স্ট্রীটে ইংলণ্ড থেকে ব্যাট ও কর্ক আনিয়ে ব্যাডমিণ্টন খেলা সুরু করেন।



শরৎকুমার মিত্র

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শরৎকুমার মিত্রের বাড়ীতেই **ক্যালকাটা ব্যাডমিণ্টন ক্লাব**-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এই ক্লাবই ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্বপ্রথম ব্যাডমিণ্টন ক্লাব।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ক্যালকাটা ব্যাডমিণ্টন ক্লাবই **ক্যালকাটা ব্যাডমিণ্টন টুর্ণামেণ্ট** নাম দিয়ে প্রথম প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ছোটদের সিঙ্গিলস এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ছোটদের ডাবলস প্রতিযোগিতাও আরম্ভ হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের প্রতিযোগিতা শুধু মাত্র ক্লাবের সভ্যদের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দ থেকে এই প্রতিযোগিতায় সাধারণে যোগ দেওয়ার অধিকার লাভ করে।

১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রতিযোগিতাটি বিভিন্ন কলেজ হোষ্টেল ও ক্লাবগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় কলকাতায় এবং কলকাতার আশেপাশে প্রায় ১০০ ব্যাডমিণ্টন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার বিভিন্ন ক্লাবগুলিকে নিয়ে **অল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন**-এর সৃষ্টি হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে অল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

## অল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন

ভারতবর্ষে ব্যাডমিণ্টন খেলার উন্নতির এবং পরিচালনার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানকে 'অল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন' বলা হয়। ভারতে ব্যাডমিণ্টন খেলার সকল দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য এই এসোসয়িেশনের উপর ন্যস্ত। কিন্তু এই এসোসিয়েশন স্বষ্টির মূলে বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের দানই সর্ব্বাধিক। এক কথায় বলা যায়, বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের উৎসাহ এবং চেষ্টাতেই এই অল ইণ্ডিয়া বা ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের স্বষ্টি সম্ভব হয়।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ক্যালকাটা ব্যাডমিণ্টন ক্লাব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা স্বরু করবার পর ক্রমশঃই ব্যাডমিণ্টন খেলা বাঙ্গলা দেশের মধ্যে উৎসাহের স্বষ্টি করে। ফলে আহিরিটোলা স্পোর্টিং ক্লাব, ক্যালকাটা নর্থ ক্লাব, ইণ্টালী ইউনাইটেড ক্লাব এবং অলিম্পিক ব্যাডমিণ্টন ক্লাবের স্বষ্টি হয়।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ব্যাডমিণ্টন খেলার উৎসাহ আরও দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এই সময়ে ভারতীয়, অভারতীয় এবং স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেই ব্যাডমিণ্টন খেলার প্রতি এত বেশী ঝুঁকে পড়ে যে, কলকাতায় বিভিন্ন বড় বড় ক্লাব ও প্রতিযোগিতার স্বষ্টি হয়। বিভিন্ন বড় বড় ক্লাবগুলির মধ্যে ইও-ইও ক্লাব, র‍্যাকেটার্স ক্লাব, অশোক মেমোরিয়াল ক্লাব এবং সিজিন ক্লাবের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সময়কার প্রধান ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ানশিপ, নর্থ ক্যালকাটা টুর্ণামেণ্ট এবং অশোক মেমোরিয়াল টুর্ণামেণ্টের নাম করা যায়।

এই সব প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বাঙ্গলাদেশে কয়েকজন প্রতিভাবান কুশলী খেলোয়াড়ের স্বষ্টি হয়। বাঙ্গলাদেশের এইসব খেলোয়াড়েরা নিজেদের প্রদেশ ছাড়াও সর্ব্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করবার জন্মে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন।

ব্যাডমিণ্টন খেলা ক্রমশঃই ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করবার কথা বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন থেকে বারবার দাবী করা হতে থাকে। কিন্তু ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের আগে পর্য্যন্ত সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করা সম্ভব হয় না।

অবশেষে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলাদেশের প্রতিনিধিদের আন্তরিক চেষ্টায় 'অল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন'-এর জন্ম হয়। এই এসোসিয়েশন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। অল ইণ্ডিয়া

ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন গঠন করবার ব্যাপারে সবথেকে বেশী সাহায্য করেন স্থকুমার মিত্র, এ. এন. দে, বি. সি. মল্লিক, এফ. সেন এবং এন. সি. তালুকদার।

## জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

ভারতবর্ষে বিভিন্ন ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতাই শ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে যখন প্রথম এই ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা স্থরু হয় তখন এই প্রতিযোগিতার নাম ছিল 'অল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা'। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলাদেশের ব্যাডমিণ্টন ক্লাবগুলি মিলে যে 'অল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন' গঠিত হয়, সেই এসোসিয়েশনই ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে 'অল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা'র প্রচলন করেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাঙ্গলার বাইরের দল হিসাবে বেরিলী ক্লাব এবং পরের বছর তুজন উত্তরপ্রদেশের খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। এই সময়ের প্রতিযোগিতায় একমাত্র পুরুষদের সিঙ্গিলস ও ডাবলস খেলা অনুষ্ঠিত হতো।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জি. লুইস, কর্ত্তার সিং ও মিস্ ঘোষ (এখন মিসেস্ লুইস) এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে সাফল্য লাভ করায় চারিদিকে একটা সাড়া পড়ে যায় এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের খেলোয়াড়েরাও এসে যোগদান করেন।

এর কয়েক বছরের মধ্যেই এই প্রতিযোগিতা এত বেশী উৎসাহের স্বষ্টি করে যে, প্রতিযোগিতা পরিচালনা করবার জন্যে যে অল ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন গঠিত হয়েছিল, তার আইনের পরিবর্ত্তন করতে হয়। নূতন আইন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাদেশিক এসোসিয়েশনগুলিকে 'অল ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন'-এর সভ্য করে নেওয়া হয়।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই অল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় হল্ ঘরে এই খেলার ব্যবস্থা করেন। এর পর থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে পুরুষদের সিঙ্গিলস এবং ডাবলস প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। মহিলাদের সিঙ্গিলস এবং ডাবলস প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এবং মিক্সড ডাবলস প্রতিযোগিতা স্থরু হয় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ থেকে আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা সুরু হয়। এই প্রতিযোগিতাকেই বর্ত্তমানে আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতা বলা হয়।

## টমাস কাপ

পৃথিবীর মধ্যে বর্ত্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে টমাস কাপের প্রতিযোগিতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আন্তর্জাতিক দলগত



স্যার জর্জ্জ এ. টমাস এবং তাঁহার দান 'টমাস কাপ'

প্রতিযোগিতা হিসাবে টমাস কাপ টেনিস খেলায় ডেভিস কাপের মত সমখ্যাতি-সম্পন্ন। বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ কুশলী খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত জাতীয় ব্যাডমিণ্টন দলগুলির মধ্যে যে দল জয়লাভ করে, তারাই এই টমাস কাপ বিজয়ের গৌরব লাভ করে।

আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের সভাপতি স্যার জর্জ্জ এ. টমাস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে দলগত প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তনের জন্য ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে একটি সুদৃশ্য কাপ আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের কাছে দান করেন। স্যার জর্জ্জ এ. টমাসের নাম অনুযায়ী এই কাপটিকে টমাস কাপ বলা হয়।

স্যার জর্জ্জ এ. টমাসের পরিচয় শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের সভাপতি বললেই যথেষ্ট হয় না। টমাস সর্ব্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়। ইংলণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস এবং ফ্রান্সের এমন কোন ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা নেই, যে প্রতিযোগিতায় টমাস বিজয়ী হননি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন খেলায় তিনি ২৯ বার ইংলণ্ডের পক্ষ সমর্থন করে অবিস্মরণীয় গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। ব্যাডমিণ্টন ছাড়াও টেনিস ও দাবা খেলাতেও তিনি বিশ্বের একজন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দ থেকে টমাস কাপের খেলা আরম্ভ হয়। আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন টমাস কাপের খেলা পরিচালনা করেন। বিভিন্ন 'জোন'-এ ভাগ করে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জোন-এর বিজয়ী দল মূল প্রতিযোগিতার সেমিফাইন্যাল খেলায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ৫টি সিঙ্গিলস এবং ৪টি ডাবলস খেলার মধ্যে যে-দল বিপক্ষ দল থেকে বেশী খেলায় জয়লাভ করে, তারাই জয়ী বলে সাব্যস্ত হয়।

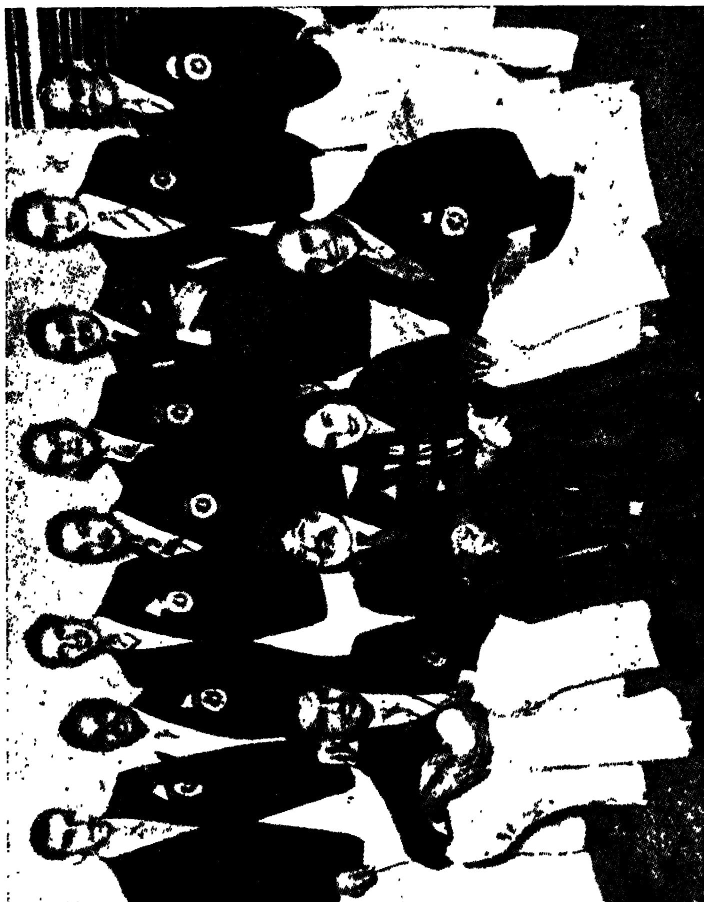
## টমাস কাপে ভারতীয় দল

টমাস কাপ প্রতিযোগিতা সুরু হবার প্রথম বছরেই ভারতীয় দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ভারতীয় দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় ক্যানাডার সঙ্গে। ক্যানাডাতেই এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় দলের জন্যে নির্ব্বাচিত হন :—জর্জ্জ লুইস ( অধিনায়ক ), দেবিন্দর মোহন, গজানন হেমাডী, বি. ডি. স্রফ, ডি. জি. ম্যাগওয়ে, আগস্কার, উল্লাস এবং হেনরী ফেরেরা। ভারত ক্যানাডার নিকট এই খেলায় পরাজিত হয়।

টমাস কাপে ভারতীয় দল দ্বিতীয়বার যোগদান করে ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে। এই ভারতীয় দলের জন্যে নির্ব্বাচিত হন :—দেবিন্দর মোহন ( অধিনায়ক ), টি. এন. শেঠ, হেনরী ফেরেরা, মনোজ গুহ, অমৃত দেওয়ান, গজানন হেমাডী এবং চিরঞ্জীৎলাল ম্যাডান।

ভারত প্রথম খেলায় সহজেই থাইল্যাণ্ডকে পরাজিত করে পরবর্ত্তী রাউণ্ডে উন্নীত হয়। বোম্বাইতে এই খেলা হয়।



টমাস কাপে যোগদানকারী প্রথম ভারতীয় দল

পরবর্ত্তী রাউণ্ডে ভারতকে সিঙ্গাপুরে অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। ভারত অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন খেলায় সুনাম অর্জ্জন করে।

পরবর্ত্তী রাউণ্ডে ভারত ও ডেনমার্কের মধ্যে খেলা হয়। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ভারত ডেনমার্কের নিকট পরাজয় বরণ করে।

১৯৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে টমাস কাপের খেলায় পুনরায় ভারতীয় দল যোগদান করে। ভারতকে প্রথম রাউণ্ডে থাইল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়।

ভারতীয় দলের জন্য নির্ব্বাচিত হন—টি. এন. শেঠ (অধিনায়ক—উত্তরপ্রদেশ), অমৃত দেওয়ান (সহঃ অধিনায়ক—দিল্লী), নন্দু নাটেকার (বোম্বাই), পি. এস. চাওলা (দিল্লী) ও রণবীর ডোঙ্গরে (বোম্বাই)। ভারত এই খেলায় ৬-৩ গেমে জয়লাভ করে। পরবর্ত্তী প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের সেমিফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় ২০শে ও ২১শে নভেম্বর করাচীতে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই খেলা হয়। ভারতীয় দলের জন্য নির্ব্বাচিত হন—ত্রিলোকনাথ শেঠ (অধিনায়ক—উত্তরপ্রদেশ), নন্দু নাটেকার ও রণবীর ডোঙ্গরে (বোম্বাই), মনোজ গুহ ও গজানন হেমাডী (বাঙ্গলা)। ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৯-০ গেমে জয়লাভ করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় ভারত ও হংকং-এর মধ্যে বোম্বাইতে ৯ই ও ১০ই এপ্রিল ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে। ভারত এই খেলায় সহজেই হংকং দলকে ৯-০ গেমে পরাজিত করে এশিয়ার আঞ্চলিক বিজয়ী হবার গৌরব লাভ করে। ভারতের পক্ষ সমর্থন করেন—অমৃতলাল দেওয়ান (অধিনায়ক—দিল্লী), নন্দু নাটেকার ও রণবীর ডোঙ্গরে (বোম্বাই), মনোজ গুহ ও গজানন হেমাডী (বাঙ্গলা)।

২৪শে ও ২৫শে মে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে সিঙ্গাপুরে এশিয়ার আঞ্চলিক বিজয়ী ভারত ও আমেরিকার আঞ্চলিক বিজয়ী আমেরিকার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ভারতীয়দলের জন্য নির্ব্বাচিত হন—টি. এন. শেঠ (অধিনায়ক—উত্তরপ্রদেশ), নন্দু নাটেকার ও রণবীর ডোঙ্গরে (বোম্বাই), মনোজ গুহ ও গজানন হেমাডী (বাঙ্গলা) এবং পি. এস. চাওলা (দিল্লী)। ভারত আমেরিকার বিরুদ্ধে ৬-৩ খেলায় বিজয়ী হয়ে প্রথম আঞ্চলিক ফাইন্যালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। ফাইন্যালে ভারতকে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়।

৩১শে মে ও ১লা জুন সিঙ্গাপুরে আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমেরিকার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের হয়ে যে খেলোয়াড়েরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তাঁরাই ফাইন্যালে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ভারত ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ৬-৩ খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর পরাজিত হলেও আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন পর্য্যায়ে ভারত তৃতীয় স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়। হকি ছাড়া অন্য কোন খেলাতেই ভারত আজও এরূপ কোন আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করতে পারেনি।



# টেনিস

## *টেনিস খেলার জন্ম ও বিস্তার*

বিভিন্ন খেলার জন্ম-বৃত্তান্তের মত টেনিস খেলার জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে মত-বিরোধ থাকলেও ফ্রান্সে যে এই খেলার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বহু শত বছর আগে ইংলণ্ডের কয়েকজন লোক ফ্রান্সে বেড়াতে এসে টেনিস খেলা খেলতে দেখতে পান। খেলার সময়ে দর্শক ও সমর্থকেরা চীৎকার করতো **টিন-ইজ** বলে। ফরাসী ভাষায় ঐ শব্দটির অর্থ হলো 'ভালো করে খেলো' বা 'খেলা চালিয়ে যাও'। ইংলণ্ডের ঐ সব লোকেরা ফরাসী ভাষা না জানায় মনে করে নিলেন যে খেলাটির নামই বুঝি 'টিন-ইজ'। সুতরাং তাঁরা ইংলণ্ডে ফিরে এসে ঐ টিন-ইজ নামেই খেলাটি চালু করলেন। **ইংলণ্ডে টিন-ইজ থেকে 'টেনিস'** নাম হলো। ফ্রান্সে কিন্তু খেলাটির প্রকৃত নাম তখন ছিল **লা পাম**।

কোন কোন ঐতিহাসিকেরা বলেন যে হোমার-যুগেও নাকি এ খেলাটির প্রচলন ছিল। প্রমাণ হিসাবে তাঁরা হোমারের আঁকা একটা ছবি দেখান। ঐ ছবিটা হলো যে, এক রাজকুমারী হাত দিয়ে কোন খেলা খেলছেন। কিন্তু এই ছবিটা এত অস্পষ্ট যে, সেটা যে টেনিস-জাতীয় খেলা—এ বোঝা যায় না।

টেনিস খেলা 'লা পাম' নামে সৃষ্টি হলেও এ খেলাটি কোন সময়েই খালি হাতে খেলা হতো না। দ্বিতীয়তঃ, হোমারের যুগে মেয়েদের মধ্যে, বিশেষ করে রাজপরিবারের মেয়েদের মধ্যে খেলাধুলার উৎসাহ খুব কমই ছিল। সেই কারণেই হোমারের যুগে যে টেনিস খেলা হতো, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিভিন্ন গবেষণা থেকে যতদূর জানা যায় তাতে দেখা যায় যে, খৃষ্টজন্মের আগে এ খেলা পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল না।

ফ্রান্সের 'লা পাম' খেলা বাইরে খোলা মাঠে এবং ঘরের ভিতরেও খেলা হতো। ১২৩০ খৃষ্টাব্দে ঘরের ভিতরে 'লা পাম' খেলা ফ্রান্সের ধর্ম্মযাজক বা পাদ্রীরা প্রচলিত করেন। ১২৪৫ খৃষ্টাব্দে নবম লুইস ধর্ম্মযাজক বা পাদ্রীদের খেলাধুলায় এত বেশী উৎসাহী হওয়া উচিত নয় মনে করে ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে এই খেলা বন্ধ করে দেন।

১৩৫৮ থেকে ১৩৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই খেলা ইংলণ্ডে প্রথম প্রচলিত হয়। প্রথম প্রথম ইংলণ্ডে খোলা মাঠেই এই খেলা হতো। তৃতীয় এডওয়ার্ড যখন ইংলণ্ডের রাজা তখন তিনি এই খেলাটি ঘরের ভেতরে খেলা যায় জানতে পেরে নিজের রাজপ্রাসাদে খেলার কোর্ট তৈরী করে খেলা আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ খেলাটি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা যে, এতদিন ধরে যে খেলা ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত হলো, সেই খেলা যে কি নিয়মে হতো সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এমন কি এই সময়ে—কি ধরনের নেট, ব্যাট বা বল ব্যবহার করা হতো তাও জানা যায় না। শুধু এইটুকুই জানা যায় যে, খেলার নেট বা জাল সৃষ্টির আগে কাঠ উঁচু করে বা মাটি দিয়ে ছোট দেওয়ালের মত তৈরী করে খেলা হতো।

ঘরের ভেতরে টেনিস খেলার কোর্ট ও অন্যান্য অনেক আনুষঙ্গিক খরচ থাকায় সাধারণের পক্ষে ঘরের ভেতরে টেনিস খেলা সম্ভব হতো না। সেই কারণেই ঘরের ভেতরে টেনিস খেলা ধনীলোক বা রাজা-রাজড়াদের মধ্যেই থেকে গেলো। ফলে ঘরের ভেতরে যে টেনিস খেলা হতো তার নাম হলো

**রয়াল টেনিস** এবং বাইরের খোলা মাঠে যে টেনিস খেলা হতো তার নাম হলো **কোর্ট টেনিস।**

**এখনকার দিনে যে টেনিস খেলা হয়—এই টেনিস খেলা প্রথম আবিষ্কার করেন উইংফিল্ড নামে একজন ইংরাজ।** কিন্তু তিনি যখন এই খেলা আবিষ্কার করেন তখন এই খেলার নাম 'লন টেনিস' ছিল না। **অল ইংলণ্ড ক্রকেট ক্লাব খেলাটির নাম 'লন টেনিস' দিয়ে উইম্বিলডনে খেলাটির প্রবর্ত্তন করেন।**

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে উইম্বিলডনেই **প্রথম প্রতিযোগিতামূলক খেলা হয়।** এই সময়ে খেলার কোর্টের মাপ ছিল লম্বায় ২৬ গজ ও চওড়ায় ৯ গজ এবং নেটের মাঝখানের উচ্চতা ছিল ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ঐ নেটের উচ্চতাকে দুটো পোষ্টের কাছে করা হয় ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি ও নেটের মাঝখানটাকে করা হয় ৩ ফুট। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ঐ মাপটিকে আরও কমিয়ে দুটো পোষ্টের কাছে করা হয় ৪ ফুট এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দুটো পোষ্টের কাছে উচ্চতাকে ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি করা হয়।

**১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় এই খেলা প্রচলিত হবার কথা শোনা যায়।** মিস্ মুরি ই. আউটার ব্রিজ নামে একজন মহিলা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বারমুডায় এসে সেখানকার সৈন্যবিভাগের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে এই খেলা প্রথম খেলতে দেখেন। খেলাটি মিস্ আউটার ব্রিজের খুব ভাল লাগায় তিনি দেশে ফিরে আসবার সময় ঐ সব সৈন্যবিভাগের কর্ম্মচারীদের সাহায্যে কয়েকটি বল, নেট এবং ব্যাট কিনে নিয়ে এসে নিজের দেশে খেলাটির প্রচলন করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে প্রথম টেনিস কোর্ট আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয় নিউইয়র্কে 'র‍্যাকেট কোর্ট' ক্লাবে।

**১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর সৃষ্টি হয়।** বর্ত্তমান পৃথিবীর টেনিস পরিচালনার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান **আন্তর্জাতিক লন টেনিস ফেডারেশন**-এর সৃষ্টি হয় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে।

**১৯০০ খৃষ্টাব্দ থেকে আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতা ডেভিস কাপ-এর খেলা সুরু হয় বোস্টনের নিকটবর্ত্তী লং উডে।** ৮ই, ৯ই ও ১০ই আগষ্ট প্রথম বছরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

**১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ থেকে মহিলারা প্রথম টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।** মহিলাদের টেনিস প্রতিযোগিতা সরকারীভাবে চালু হয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে উইম্বিলডনে।

## ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ লাহোরে এক সভায় ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর জন্ম হয়। এই এসোসিয়েশন স্থষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ঃ—

(১) ভারতীয় টেনিস খেলার মান উন্নয়ন এবং ভারতে টেনিস খেলা প্রচার করা।

(২) জাতীয় এবং আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

(৩) ভারতবর্ষে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হলে বা কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারত যোগদান করলে, তার ব্যবস্থা করা।

(৪) প্রতি বছর ভারতীয় খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায় ঠিক করা।

(৫) ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।

(৬) পেশাদারী খেলোয়াড়দের আলাদা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

(৭) টেনিস খেলার আইন, প্রয়োজন হলে, সংশোধন করা। আন্তর্জাতিক লন টেনিস ফেডারেশন-এর নিয়মাবলী মাঝে মাঝে প্রকাশ করে প্রচার করা।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চের এই সভায় কর্ণেল বি. ও. রো, এফ. আর. এল. ক্রাফোর্ড, জেকব, জগৎমোহনলাল, মিঙ্ক এবং স্লিম উপস্থিত ছিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন সিমলায় এই এসোসিয়েশন-এর দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসোসিয়েশন-এর প্রথম বাৎসরিক সাধারণ সভা হয় ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর দিল্লীর টাউন-হলে। এই সভায় ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর প্রথম সভাপতি হিসাবে নির্ব্বাচিত হন, এস. পি. ওডোনেল এবং যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে নির্ব্বাচিত হন এ. সি. গুপ্ত ও এস. এম. জেকব। সভাপতি ও সম্পাদক-দুজন ছাড়াও ৯ জন সহ-সভাপতি এই সভায় নির্ব্বাচিত হন।

ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন স্থষ্টি হবার পর প্রথম প্রথম এই এসোসিয়েশন ভারতীয় খেলোয়াড়দের বিদেশ সফর তো দূরের কথা, এমন কি এক প্রদেশের খেলোয়াড়দের অন্য প্রদেশে খেলবার সুযোগ-সুবিধাও করে দিতে পারেন না। কোন প্রাদেশিক এসোসিয়েশন-এর উপরেও এই এসোসিয়েশন-এর কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না। এসোসিয়েশন-এর এই অবস্থার

পরিবর্ত্তন করে ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশনকে প্রাণবন্ত করে তোলেন কানওয়াল দলীপ সিং, ডি. এন. ভাল্লা এবং ব্রুক্ এডওয়ার্ডস। এই তিনজনের আন্তরিক চেষ্টাতেই ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন ভারতের টেনিস খেলার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে সমর্থ হয়।

ক্রমশঃ টেনিস খেলা ভারতে প্রচার হতে থাকে এবং টেনিস খেলোয়াড়দের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ভারতীয় খেলোয়াড় স্লিম ইউরোপ সফরে ডাচ, সুইস এবং ইটালীর টেনিস প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়দের এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় টেনিস এসোসিয়েশন-এর মর্য্যাদাও বাড়িয়ে তোলেন। ডেভিস কাপ-এর খেলায় ভারত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জয়লাভ করায় এই মর্য্যাদা আরও বেড়ে যায়।

ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রাদেশিক লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর সৃষ্টি হওয়ায় ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। বাঙ্গলার 'সাউথ ক্লাব' ভারতের বাইরের বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড়দের ভারত-ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দিয়ে ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর সুনাম আরও বাড়িয়ে তোলেন। এই সাউথ ক্লাবের টেনিস মাঠ শুধু ভারতের নয়, সারা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাঠ হিসাবে স্বীকৃত।

## *ভারতের বিভিন্ন রাজ্য টেনিস এসোসিয়েশন-এর ইতিহাস*

**বাঙ্গলা ঃ**—১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল লন টেনিস এসোসিয়েশন'-এর জন্ম হয়। খুব অল্পদিনের মধ্যেই ১৯টি ক্লাব এই এসোসিয়েশনের সভ্য হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৬১টি ক্লাব এই রাজ্য টেনিস এসোসিয়েশন-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য টেনিস এসোসিয়েশনগুলির মধ্যে বেঙ্গল লন টেনিস এসোসিয়েশনই শ্রেষ্ঠ। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ক্যালকাটা চ্যাম্পিয়ানশিপ নামে প্রথম প্রতিযোগিতা এখানে সুরু হয়।

**বিহার ও উড়িষ্যা ঃ**—১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 'বিহার ও উড়িষ্যা লন টেনিস কাউন্সিল' ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। বিহার ও উড়িষ্যা লন টেনিস কাউন্সিল গঠিত হবার আগে থেকে অর্থাৎ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে বিহার-উড়িষ্যা টেনিস প্রতিযোগিতা সুরু হয়। প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় শুধু পুরুষদের সিঙ্গিলস এবং ডাবলস প্রতিযোগিতা হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ থেকে

মিক্সড্ ডাবলস এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে মহিলাদের সিঙ্গিলস এবং ডাবলস প্রতিযোগিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

**বোম্বাই**ঃ—১৯১৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'বোম্বাই লন টেনিস এসোসিয়েশন'-এর সৃষ্টি হয় 'বোম্বাই কাউন্সিল অফ অল ইণ্ডিয়া লন টেনিস এসোসিয়েশন' নামে। বোম্বাই লন টেনিস এসোসিয়েশন—অল ইণ্ডিয়া লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর সৃষ্টি থেকেই সভ্য।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই কাউন্সিল অফ অল ইণ্ডিয়া লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর নাম পরিবর্ত্তন করে 'বোম্বাই প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল অফ অল ইণ্ডিয়া লন টেনিস এসোসিয়েশন' রাখা হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই টেনিস দল প্রথম আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের প্রথম টেনিস প্রতিযোগিতা সুরু হয় 'মার্কাস টুর্ণামেণ্ট' নামে। এই প্রতিযোগিতার নাম পরে পরিবর্ত্তন করে 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হার্ড কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতা' রাখা হয়।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল অফ অল ইণ্ডিয়া লন টেনিস এসোসিয়েশন নাম পরিবর্ত্তন করে 'বোম্বাই লন টেনিস এসোসিয়েশন' করা হয়।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রথম মহিলাদের আন্তঃক্লাব প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ থেকে বোম্বাইতে আন্তঃঅফিস খেলার প্রবর্ত্তন হয়।

**পাঞ্জাব**ঃ—ভারতে টেনিস খেলা প্রচলনের নানা ভাবে সাহায্য করে 'পাঞ্জাব লন টেনিস এসোসিয়েশন'। ভারতে প্রথম টেনিস খেলা সুরু হয় লাহোরে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লাহোরে জিমখানা ক্লাবের পরিচালনায় ভারতে প্রথম টেনিস প্রতিযোগিতা সুরু হয়।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দ থেকে 'লাহোর টেনিস প্রতিযোগিতা' সুরু হয় ডাঃ গোকুলচাঁদ ও লালা হরগোবিন্দলালের চেষ্টায়। এই প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তন করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়দের মান উন্নয়ন করা। ডাঃ গোকুলচাঁদের মৃত্যুর পর এই টেনিস প্রতিযোগিতার নাম হয় 'গোকুলচাঁদ টেনিস প্রতিযোগিতা'।

১৯১১ খৃষ্টাব্দ থেকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে টেনিস প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে 'পাঞ্জাব লন টেনিস এসোসিয়েশন' অল ইণ্ডিয়া লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

**দিল্লী ঃ**—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে 'দিল্লী লন টেনিস এসোসিয়েশন'-এর জন্ম হয়.

দিল্লী লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর প্রথম প্রতিযোগিতা হলো 'দিল্লী ওপেন চ্যাম্পিয়ানশিপ'। রাজপুতানা লন টেনিস এাসাসিয়েশন সৃষ্টি হওয়ার আগে পর্য্যন্ত আজমীঢ়ের টেনিস প্রতিযোগিতাগুলি দিল্লী লন টেনিস এসোসিয়েশন পরিচালনা করতেন।

পাঞ্জাব ভারত থেকে ভাগ হয়ে যাবার পর 'নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া বা উত্তর-ভারতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপ' দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়।

**হোলকার ঃ**—১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর 'হোলকার রাজ্য লন টেনিস এসোসিয়েশন'-এর জন্ম হয়। এই এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি ছিলেন ওয়াজিরউদ্দৌলা রায় বাহাদুর এস. এম. বাপনা—তিনি হোলকারের মহারাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে হোলকার এবং মধ্যভারত রাজ্য টেনিস প্রতিযাগিতা এখানে সুরু হয়। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে 'হোলকার এসোসিয়েশন' অল ইণ্ডিয়া লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতা পুনরায় চালু করেন। এই প্রতিযোগিতাকেই বর্ত্তমানে জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতা বলা হয়।

**হায়দ্রাবাদ ঃ**—নবাব মেহেদী জঙ্গের উৎসাহ, সাহায্য এবং চেষ্টায় 'হায়দ্রাবাদ লন টেনিস এসোসিয়েশন'-এর সৃষ্টি হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে টেনিস খেলার জন্যে মেহেদী জঙ্গ ষ্টেডিয়াম গঠিত হয়। এই মেহেদী জঙ্গ ষ্টেডিয়ামের মধ্যে যে টেনিস মাঠটি আছে সেটি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেনিস মাঠ হিসাবে বিবেচিত হয়।

হায়দ্রাবাদ লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতাই এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা।

**মাদ্রাজ ঃ**—'মাদ্রাজ লন টেনিস এসোসিয়েশন'-এর সৃষ্টি হয় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই এসোসিয়েশন তেমন শক্তিশালী ছিল না। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের পর থেকে এই এসোসিয়েশন ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং দক্ষিণ-ভারতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা ও প্রেসিডেন্সী হার্ড কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতা এখানে সুরু হয়।

**মহীশূর ঃ**—'মহীশূর রাজ্য লন টেনিস এসোসিয়েশন'-এর সৃষ্টি হয় ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ থেকে এসোসিয়েশন এর স্থায়ী অফিস বাঙ্গালোরে স্থাপিত হয়।

মহীশূর রাজ্য টেনিস প্রতিযোগিতা এই এসোসিয়েশন-এর শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা। 'প্রোফেসার শেষা আয়েঙ্গার কাপ'টি এখানে আন্তঃক্লাব খেলা হিসাবে এই এসোসিয়েশন পরিচালনা করেন। মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, হায়দ্রাবাদ এবং মহীশূরের মধ্যে এখানে প্রতিবছরই আন্তঃ-এসোসিয়েশন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

**রাজপুতানা** ঃ—শেঠ শোভাগমল লোধার চেষ্টায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে 'রাজপুতানা টেনিস এসোসিয়েশন'-এর জন্ম হয়। শোভাগমল লোধা-ই এসোসিয়েশন-এর প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

রাজপুতানা টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ-ই এখানকার প্রধান প্রতিযোগিতা।

**ত্রিবাঙ্কুর** ঃ—মাদ্রাজ লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর পরিচালনায় ত্রিবেন্দ্রামে যে টেনিস ক্লাবের সৃষ্টি হয়, সেই ক্লাব থেকেই ধীরে ধীরে 'ত্রিবাঙ্কুর লন টেনিস এসোসিয়েশন' জন্মলাভ করে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুরের সমস্ত রাজ্যক্লাব-গুলিকে নিয়ে ত্রিবাঙ্কুর লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর সৃষ্টি হয়। এই এসোসিয়েশন সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দেই অল ইণ্ডিয়া লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে আন্তঃ-এসোসিয়েশন প্রতিযোগিতা 'ই. জে. জন মেমোরিয়াল ট্রফি'র খেলা সুরু হয়। এই বছরই দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতীয় লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতাও ত্রিবাঙ্কুর লন টেনিস এসোসিয়েশন আরম্ভ করেন।

**উত্তরপ্রদেশ** ঃ—'উত্তরপ্রদেশ লন টেনিস এসোসিয়েশন'-এর সৃষ্টি হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দেই এই এসোসিয়েশন অল ইণ্ডিয়া লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এস. ডব্লিউ. বব্ এই এসোসিয়েশন-এর প্রথম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অল ইণ্ডিয়া লন টেনিস প্রতিযোগিতা—যাকে বর্ত্তমানে জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা বলা হয়—উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরপ্রদেশ লন টেনিস এসোসিয়েশনই এই সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতার প্রথম সৃষ্টি করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ঠিক হয়, যে-কোন একটি বিশেষ রাজ্যে অথবা বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

উত্তরপ্রদেশ লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতা লক্ষ্ণৌ-আউধ জিমখানা ক্লাবে প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হয়।

## ইন্টারন্যাশন্যাল লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ অফ এশিয়া

ইন্টারন্যাশন্যাল লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ অফ এশিয়া বা এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতা সুরু হয় ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে। এশিয়ার বিভিন্ন লন টেনিস এসোসিয়েশনগুলির মধ্যে ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর সুনাম সর্ব্বাপেক্ষা বেশী থাকায় প্রথম প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশনের উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ভারতের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলার মাঠ কলকাতা সাউথ ক্লাব মাঠে এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ১৪ জন সভ্যযুক্ত একটি শক্তিশালী কমিটি এই প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর তৎকালীন সভাপতি ও সম্পাদক ডাঃ অমরনাথ ঝা ও টি. এস. কাক্কুকে এই টুর্ণামেন্ট কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক-রূপে নির্ব্বাচিত করা হয়।

ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর পক্ষে এই প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্বলাভ একদিকে যেমন গৌরবের, অন্যদিকে ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড় দিলীপ বসু ও সুমন্ত মিশ্রের এই প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ তেমনি অবিস্মরণীয়। সিঙ্গিলস-এ দিলীপ বসু ঐ সময়ের বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় ফিলিপাইনস্-এর এফ. এম্পনকে পরাজিত করে ভারতীয় টেনিস জগতে এক অবিশ্বাস্য গৌরবের অধিকারী হন। ডাবলস খেলায় দিলীপ বসু ও সুমন্ত মিশ্র জয়লাভ করে ভারতীয় টেনিসের মর্য্যাদাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

## জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতা

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বিভিন্ন টেনিস প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে ন্যাশন্যাল চ্যাম্পিয়ানশিপ বা জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়েরা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান টেনিস খেলোয়াড়েরা প্রতিবছরই যোগদান ক'রে এই জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতার আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তোলেন।

উত্তরপ্রদেশ টেনিস এসোসিয়েশন-এর পরিচালনায় 'অল ইণ্ডিয়া লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ' নামে এই 'জাতীয় প্রতিযোগিতা' প্রথম সুরু হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই অল ইণ্ডিয়া লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন ঠিক করেন যে, ভবিষ্যতে কোন একটি বিশেষ রাজ্যে এই অল ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানশিপ অনুষ্ঠিত হবে না। ফলে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন এই অল্ ইণ্ডিয়া লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপের নাম পরিবর্ত্তন করে 'ন্যাশন্যাল চ্যাম্পিয়ানশিপ' বা 'জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা' করেন। কলকাতার সাউথ ক্লাবে প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বলেও ঠিক হয়। ফলে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ থেকে সাউথ ক্লাবের পরিচালনায় এই প্রতিযোগিতা প্রতিবছরই কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

## *ডেভিস কাপ*

কলেজের এক ছাত্রের দুর্দ্দমনীয় জয়ের আকাঙ্ক্ষায় যে ডেভিস কাপের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ব্যক্তিগত জয়ের আকাঙ্ক্ষা আজ বিশ্বের সকল জাতির জাতীয় আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। যে কোন দেশই টেনিস খেলার এই শ্রেষ্ঠ মুকুট লাভ করবার জন্যে তাই উদ্‌গ্রীব। যে দেশ এই ডেভিস কাপ-এ জয়লাভ করে, তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়ের দেশ হিসাবে স্বীকৃত হয়। তাই এই প্রতিযোগিতার আর একটি নাম হলো 'চ্যাম্পিয়ানশিপ অফ দি ওয়ার্লড' বা 'বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিতা'।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ডুইট এফ. ডেভিস নামে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র আমেরিকার বিভিন্ন টেনিস প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করবার পর এবং আমেরিকার ডাবলস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার পর, আরও কোন শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলায়াড়কে পরাজিত করবার জন্যে অনুসন্ধান করতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে তিনি জানতে পারেন যে, ডোহার্টি ব্রাদার্স নামে দুই ভাই গ্রেটবৃটেনে সিঙ্গিলস এবং ডাবলস খেলায় নাকি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ডেভিসের মন নেচে ওঠে গ্রেটবৃটেনের ঐ শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দ্বয়কে পরাজিত করবার জন্যে। কিন্তু তখন আমেরিকার এবং গ্রেটবৃটনের টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো না, সুতরাং ডেভিস যে ডোহার্টি ব্রাদার্সের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তার কোন সুযোগও ছিল না।

জয়ের নেশায় ডেভিসের মাথায় এক বুদ্ধি খেলে। পৃথিবীর যে কোন দেশের মধ্যে যদি কোন প্রতিযোগিতার প্রচলন করা যায়, তাহলে গ্রেটবৃটেনের ডোহার্টি ব্রাদার্স এবং অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়দের সঙ্গে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সুযোগ পাবেন বলে তাঁর মনে হয়। এই আশায় ডেভিস ২০০ পাউণ্ড দিয়ে এক সুদৃশ্য সোনার কাজকরা রূপার কাপ আমেরিকার জাতীয়



ডেভিস কাপ

লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর হাতে তুলে দেন। এই প্রতিযোগিতা সুরু করবার সময়ে অবশ্য ঠিক ছিল যে, একমাত্র আমেরিকা ও গ্রেটবৃটেনের মধ্যেই শুধু এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। কারণ, এই সময়ে একমাত্র গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকাতেই টেনিস খেলার বেশী প্রচলন ছিল।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী আমেরিকার জাতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর সভাপতি ইংলণ্ডের জাতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর সভাপতির কাছে ডেভিসের ইচ্ছা জানান। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ থেকেই ডেভিস কাপের খেলা আরম্ভ হয়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৮ই, ৯ই ও ১০ই আগষ্ট বোস্টনের কাছাকাছি লং উডে প্রথম ডেভিস কাপের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ডোহার্টি ব্রাদার্স এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে না পারায় আমেরিকা সহজেই জয়লাভ করে। আমেরিকার দল গঠিত হয় এম. ডি. হুইটম্যান, ডুইট এফ. ডেভিস এবং হেভার্ডকে নিয়ে এবং বৃটিশ আইসিলিস্ বা গ্রেটবৃটেনের দল গঠিত হয় এ. ডব্লিউ. গোর, ই. ডি. ব্লাক ও এইচ. রোপার ব্যারেটকে নিয়ে।

আমেরিকা ও গ্রেটবৃটেন ছাড়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়াম ও ফ্রান্স এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ক্রমশঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ডেভিস কাপে যোগদান করবার আকর্ষণ বেড়ে যায়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান জোন-এ ভাগ করে ডেভিস কাপের খেলা আরম্ভ হয়।

ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকান জোন-এ বিজয়ী দল দুটির মধ্যে 'ইন্টার জোন' খেলা হয়। এই ইন্টার জোন খেলায় যে দল বিজয়ী হয়, তারা পূর্ব্বেকার



প্রথম ডেভিস কাপের খেলায় বিজয়ী ইউ. এস. এ. দল। মাঝখানে ডুইট এফ. ডেভিস
( ইনিই ডেভিস কাপ দান করেন )

বিজয়ী দলের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ফাইন্যাল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অর্থাৎ যে দেশ এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে, পরের বছর সেই দেশে গিয়ে তাদের কাছ থেকে এই ডেভিস কাপ জয়লাভ করে আনতে হয়। যে দল বিজয়ী থাকে

সেই দল ছাড়া অন্য সব যোগদানকারী দলের মধ্যে প্রথমতঃ প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় যে দল জয়লাভ করে তারা আগেকার বিজয়ী দলের সঙ্গে শেষ বা ফাইন্যাল খেলায় তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই শেষ বা ফাইন্যাল খেলাটি আগেকার বিজয়ী দলের দেশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৪টি সিঙ্গিলস ও ১টি ডাবলস খেলার ফলাফলের পরে ডেভিস কাপের প্রত্যেকটি খেলার মীমাংসা হয়। যে দল ঐ ৫টি খেলার মধ্যে তিনটি খেলায় জয়লাভ করতে পারে তারা বিজয়ী বলে সাব্যস্ত হয়। আন্তর্জাতিক লন টেনিস এসোসিয়েশন-এর ডেভিস কাপ কমিটি এই খেলার যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকেন।

কোন মহিলা খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারেন না।

## হুইটম্যান কাপ

পুরুষদের ডেভিস কাপের মত মহিলাদের হুইটম্যান কাপও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার মহিলা টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যেই এই হুইটম্যান কাপ-এর খেলা হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম এই কাপের খেলা আরম্ভ হয় এবং সেই থেকে প্রতিবছরই এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

মিসেস জর্জ্জ হুইটম্যান, যিনি বিবাহের আগে মিস্ হ্যাজেল হচকিস্ নামে পরিচিত থেকে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি তিন বছর আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মহিলা খেলোয়াড় হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তিনিই এই কাপটি দান করেন।

এক বছর ইংলণ্ডে এবং এক বছর আমেরিকায় এই হুইটম্যান কাপের খেলা হয়। ৫টি সিঙ্গিলস ও ২টি ডাবলস খেলার মধ্যে যে দল ৪টি খেলায় জয়লাভ করে, তারাই বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

## ভারতের বিখ্যাত টেনিস প্রতিযোগিতাগুলি কি এবং কোথায় খেলা হয়

১। রাজস্থান লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ—আজমীঢ়ে, হার্ড কোর্টে খেলা হয়।

২। বরোদা লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ—বরোদায়, হার্ড কোর্টে খেলা হয়।

৩। দিল্লীরাজ্য টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ—দিল্লীতে, ঘাসের কোর্টে খেলা হয়।

৪। বেঙ্গল লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ—কলকাতায়, ঘাসের কোর্টে খেলা হয়।

৫। ন্যাশন্যাল চ্যাম্পিয়ানশিপ বা ভারতের জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতা—কলিকাতায়, ঘাসের কোর্টে খেলা হয়।

৬। মধ্যভারত লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ—এলাহাবাদে, ঘাসের কোর্টে খেলা হয়।

৭। উত্তরপ্রদেশ লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ—লক্ষ্ণৌতে, ঘাসের কোর্টে খেলা হয়।

৮। উত্তর-ভারত লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ—দিল্লীতে, ঘাসের কোর্টে খেলা হয়।

৯। অল ইণ্ডিয়া হার্ড কোর্ট চ্যাম্পিয়ানশিপ—মাদ্রাজে, হার্ড কোর্টে খেলা হয়।

১০। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ—ত্রিবেন্দ্রামে, হার্ড কোর্টে খেলা হয়।

১১। পশ্চিম-ভারত টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ—বোম্বাইতে, হার্ড কোর্টে খেলা হয়।

১২। বোম্বাই রাজ্য হার্ড কোর্ট চ্যাম্পিয়ানশিপ—বোম্বাইতে, হার্ড কোর্টে খেলা হয়।

১৩। মধ্যভারত টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ—ইন্দোরে, হার্ড কোর্টে খেলা হয়।

১৪। হায়দ্রাবাদ রাজ্য টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ—হায়দ্রাবাদে, হার্ড কোর্টে খেলা হয়।

১৫। মাদ্রাজ রাজ্য টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ—মাদ্রাজে, হার্ড কোর্টে খেলা হয়।

১৬। মহীশূর রাজ্য টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ—বাঙ্গালোরে, হার্ড কোর্টে খেলা হয়।

## *বিদেশী টেনিস খেলোয়াড়েরা কে ও কবে ভারতে খেলতে আসেন*

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে : ফরাসী দল—এইচ. কচেট, জে. ব্রাগনন্, পি. ল্যাণ্ডি এবং আর. রডেল।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে : ইংরাজ দল—এ. ওয়ালিস মায়ার্স (অধিনায়ক), এইচ. ডব্লিউ. অষ্টিন, জে. এস. অলিফ, ই. ডি. এনড্রুজ এবং এম. ডি. হর্ণ।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে : জাপানী দল—জে. সাটো, আর. মিকি, এইচ. সাটো, এম. কাওয়াচি এবং জে. ফুজিকুরা।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে : ইটালিয়ান দল—জি. ডি. ষ্টিফানী, ই. সার্টিরিও, কাউন্ট ডেল পেনো, কাউন্ট এফ. ডি. ওষ্টিয়ানি, কাউন্ট এল. বোঞ্জি এবং সিগনোরিনা ভ্যালিরিও।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে : পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার দল—আর. ডি. ফোর্ড (অধিনায়ক), ডব্লিউ. ষ্টিফেন, এইচ. ডি. জেকোবী এবং জি. ভি. ডেভিস।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে : যুগোশ্লাভিয়ার দল—এফ. পুনকেক, জে. প্যালাডা এবং এফ. কুকুল জেভিক।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে : মধ্য-ইউরোপীয় দল—আর. মেনজেল, এবং এল. হেষ্ট (চেকোশ্লোভাকিয়া), জি. ভন মেটাক্সা এবং কাউণ্ট এ. বাওরোস্কি (অষ্ট্রিয়া)।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে : ফ্রাসী ও নিউজিল্যাণ্ড দল—এ. সি. ষ্টেডম্যান, সি. ই. ম্যালফরী (নিউজিল্যাণ্ড), এ. জেন্টিন (ফ্রান্স)।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে : পেশাদারী দল—ডব্লিউ. টি. টিল্ডেন (আমেরিকা), এইচ. কচেট (ফ্রান্স), আর. র‍্যামিলন (ফ্রান্স) এবং এ. বার্ক (ইংলণ্ড)।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে : আমেরিকান দল—ডব্লিউ. রবার্টসন (অধিনায়ক), ওয়েন এণ্ডারসন, ডন ম্যাকনীল এবং চার্লস্ হ্যারিস।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে : যুগোশ্লাভিয়ার দল—এফ. পুনকেক. এবং ডি. মিটিক।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে : চেকোশ্লোভাকিয়ার দল—জে. ড্রবনি এবং ক্যাস্কা।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে : সুইডিস দল—টি. জোহানসন এবং এল. বার্জিলীন।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে : এস. ডেভিডসন, জে ড্রবনি, এফ. কোভালিস্কি. আই. ডর্ফম্যান, এ. জে. মট্রাম, মিস্ ডোরোথি হেড, মিসেস্ মট্রাম এবং মিসেস্ আর. এণ্ডারসন।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে : এল. বার্জিলীন, এস. ডেভিডসন, বি. ব্লমকুইষ্ট, এফ. হ্যাকানী, এ. মিয়াগী এবং আর. কামো।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে : এ. জে. মট্রাম, সি. হ্যানাম এবং মিসেস্ জয় মট্রাম।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে : এল. বার্জিলীন, জ্যাক্ আর্কিনষ্টল, এস. স্টকেনবার্গ ও ভেন ভরিস।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে : জ্যাক্ আর্কিনষ্টল, ভি স্কোনেকি এবং আর. হাওই।

## *ডেভিস কাপে ভারতীয় দলের খেলার ইতিহাস*

**১৯২১ খৃষ্টাব্দ :**—ভারতীয় দল ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রথম ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস-এ—এম. স্লিম, এম. এস. জেকব এবং এল. এস. ডিন।

ডাবলস-এ—এল. এস. ডিন এবং এ. এ. ফইজ।

১৬ই, ১৭ই এবং ১৮ই জুলাই ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে খেলা হয়। ভারত ৪-১ খেলায় জয়লাভ করে পরবর্ত্তী রাউণ্ডে উন্নীত হয়।

পরবর্ত্তী রাউণ্ডে ভারতকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় জাপানের বিরুদ্ধে। ১৮ই, ১৯শে এবং ২০শে আগষ্ট চিকাগোতে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভারত ৫-০ খেলায় পরাজিত হয়।

**১৯২২ খৃষ্টাব্দ ঃ**—ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস-এ—এ. এ. ফইজ এবং এ. এইচ. ফইজ।

ডাবলস-এ—এ. এইচ, ফইজ এবং সি. রামস্বামী।

ভারত ও রুমেনিয়ার মধ্যে প্রথম রাউণ্ডের খেলা হয় লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী বেকেনহামে। ভারত সহজেই ৫-০ খেলায় জয়লাভ করে।

দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা হয় ইংলণ্ডে ১৩ই, ১৪ই, এবং ১৫ই জুলাই ভারত ও স্পেনের মধ্যে। ভারত ৪-১ খেলায় পরাজিত হয়।

**১৯২৩ খৃষ্টাব্দ ঃ**—ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস-এ—এস. এম. জেকব এবং এ. এইচ. ফইজ।

ডাবলস-এ—এ. এইচ. ফইজ ও এল. এস. ডিন।

ভারত ও আয়র্ল্যাণ্ডের মধ্যে খেলা হয় ডাবলিনে ১লা, ২রা এবং ৪ঠা জুন। ভারত ৩-২ খেলায় পরাজিত হয়।

**১৯২৪ খৃষ্টাব্দ ঃ**—ভরতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস-এ—এস. এম. জেকব এবং এম. স্লিম।

ডাবলস-এ—এস. এম. জেকব এবং এস. এম. হাদি।

ভারত ও নেদারল্যাণ্ডের মধ্যে প্রথম খেলা হয় হল্যাণ্ডর অন্তর্গত আর্নহেমে ৩০শে, ৩১শে মে এবং ১লা জুন তারিখে। ভারত ৪-১ খেলায় জয়ী হয়।

তৃতীয় রাউণ্ডে ভারতকে অবতীর্ণ হতে হয় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। প্যারিসে ১৭ই এবং ১৮ই জুন এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফ্রান্স ৪-০ খেলায় ভারতকে পরাজিত করে।

**১৯২৫ খৃষ্টাব্দ ঃ**—ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস-এ—এস. এম জেকব, এবং ই. বি. এণ্ডি।

ডাবলস-এ—এস. এম. হাদি এবং জগৎমোহনলাল।

১৬ই, ১৭ই এবং ১৮ই মে ব্রুসেলস-এ ভারত ও বেলজিয়ামের মধ্যে প্রথম খেলা হয়। ভারত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ৩-২ খেলায় জয়ী হয়।

পরবর্ত্তী রাউণ্ডে ভারতকে খেলতে হয় অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে। ভিয়েনাতে ১২ই, ১৩ই এবং ১৪ই জুন এই খেলা হয়। ভারত ৪-০ খেলায় সহজেই বিজয়ী হয়।

সেমিফাইন্যালে ভারত ও নেদারল্যাণ্ডের মধ্যে খেলা হয় ইংলণ্ডে ১০ই, ১১ই এবং ১২ই জুলাই। ভাবত ৪-১ খেলায় পরাজিত হয়।

**১৯২৬ খৃষ্টাব্দ ঃ**—ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস-এ—এ. এ. ফইজ এবং এ. এইচ. ফইজ।

ডাবলস-এ—এ. এইচ. ফইজ এবং এস. ডব্লিউ. বব্।

ভারতকে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম রাউণ্ডেই খেলতে হয়। ১৪ই, ১৫ই এবং ১৬ই মে প্রাগে খেলা হয়। ভারত ৪-১ খেলায় পরাজিত হয়।

**১৯২৭ খৃষ্টাব্দ ঃ**—ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস এবং ডাবলস-এ—কৃষ্ণপ্রসাদ এবং এ. এইচ. ফইজ।

৭ই, ৮ই এবং ৯ই মে বার্সিলোনাতে ভারত ও স্পেনের মধ্যে প্রথম রাউণ্ডের খেলায় ভারত ৩-২ খেলায় জয়ী হয়।

পরবর্ত্তী রাউণ্ডের খেলা হয় ২০শে, ২১শে এবং ২২শে মে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে। ভারত সহজেই ৩-০ খেলায় বিজয়ী হয়।

ভারতকে পরবর্ত্তী রাউণ্ডে খেলতে হয় ডেনমার্কের বিরুদ্ধে। ৯ই, ১০ই, এবং ১১ই জুন কোপেনহেগেনে এই খেলা হয়। ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ভারত ৫-০ খেলায় পরাজিত হয়।

**১৯২৮ খৃষ্টাব্দ ঃ**—ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস-এ—এম. শ্লিম এবং ই. ভি. বব্।

ডাবলস-এ—এ. এম. ডি. পিট্ এবং এইচ. এল. সোনি।

ভারত ও সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে প্রথম খেলা হয় জুরিখে ১২ই, ১৩ই এবং ১৪ই মে। ভারত ৩-২ খেলায় বিজয়ী হয়।

তৃতীয় রাউণ্ডে ভারতকে খেলতে হয় ইটালীর বিরুদ্ধে। ৯ই, ১০ই এবং ১১ই মে টুরীনে। এই খেলাতে ভারত ৪-১ খেলায় পরাজিত হয়।

**১৯৩০ খৃষ্টাব্দ ঃ**—ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস-এ—জে. চরঞ্জীব এবং এ. মদনমোহন।

ডাবলস-এ—জে. চরঞ্জীব এবং এইচ. এল. সোনি।

ভারত ও জাপানের মধ্যে খেলা হয় ৭ই, ৮ই এবং ৯ই জুন লণ্ডনে। ভারত ৫-০ খেলায় পরাজিত হয়।



১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ডেভিস কাপ দল

**১৯৩২ খৃষ্টাব্দ** :—ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস-এ—জে. চরঞ্জীব এবং এ. মদনমোহন।

ডাবলস-এ—জে. চরঞ্জীব এবং কৃষ্ণপ্রসাদ।

৬ই, ৭ই এবং ৮ই মে বার্লিনে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ভারতকে খেলতে হয়। জার্ম্মান দল সহজেই ভারতকে ৫-০ খেলায় পরাজিত করে।

**১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ** :—ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস-এ—এম. ভাণ্ডারী এবং এম. স্লিম।

ডাবলস-এ—এম. ভাণ্ডারী এবং এ. ই. ব্রাউন।

ভারত ও সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে প্রথম খেলা হয় লুক্রেনে ১৮ই, ১৯শে এবং ২০শে মে। ভারত ৫-০ খেলায় পরাজিত হয়।

**১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ** :—ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস এবং ডাবলস-এ—গউস মহম্মদ খাঁন এবং এস. এল. আর. সোহনী।

ব্রুসেলসে ভারত ও বেলজিয়ামের মধ্যে প্রথম খেলা হয় ২৬শে, ২৭শে এবং ২৮শে মে। ভারত ৪-১ খেলায় পরাজিত হয়।

**১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ** :—ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস এবং ডাবলস-এ—গউস মহম্মদ খাঁন এবং ওয়াই. সাবুর।

১৮ই, ১৯শে এবং ২০শে মে ব্রুসেলসে ভারত ও বেলজিয়ামের মধ্যে দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা হয়। ভারত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ৩-২ খেলায় পরাজিত হয়।

**১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ** :—ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস-এ—সুমন্ত মিশ্র এবং গউস মহম্মদ খাঁন।

ডাবলস-এ—সুমন্ত মিশ্র এবং জে. এম. মেটা।

প্যারিসে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে খেলা হয়। ভারত ৫-০ খেলায় পরাজিত হয়।

**১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ** :—ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস-এ—দিলীপকুমার বসু এবং সুমন্ত মিশ্র।

ডাবলস-এ—সুমন্ত মিশ্র এবং এস. এল. আর. সোহনী।

২১শে, ২৩শে এবং ২৪শে এপ্রিল হ্যারিগেটে ভারত ও গ্রেটবৃটেনের মধ্যে প্রথম রাউণ্ডের খেলায় ভারত ৩-২ খেলায় পরাজিত হয়।

**১৯৫২ খৃষ্টাব্দ** :—ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস এবং ডাবলস-এ—সুমন্ত মিশ্র এবং নরেশকুমার।

ব্রিসবেনে ১১ই, ১২ই এবং ১৩ই ডিসেম্বর ভারত এবং ইটালীর মধ্যে খেলায় ভারত ৩-২ খেলায় পরাজিত হয়।

**১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ** :—ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস এবং ডাবলস-এ—সুমন্তকুমার মিশ্র এবং আর. কৃষ্ণান।

ব্রিসবেনে ডিসেম্বর মাসে ভারত ও বেলজিয়ামের মধ্যে খেলায় ভারত খেলায় পরাজিত হয়।

**১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ ঃ**—ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

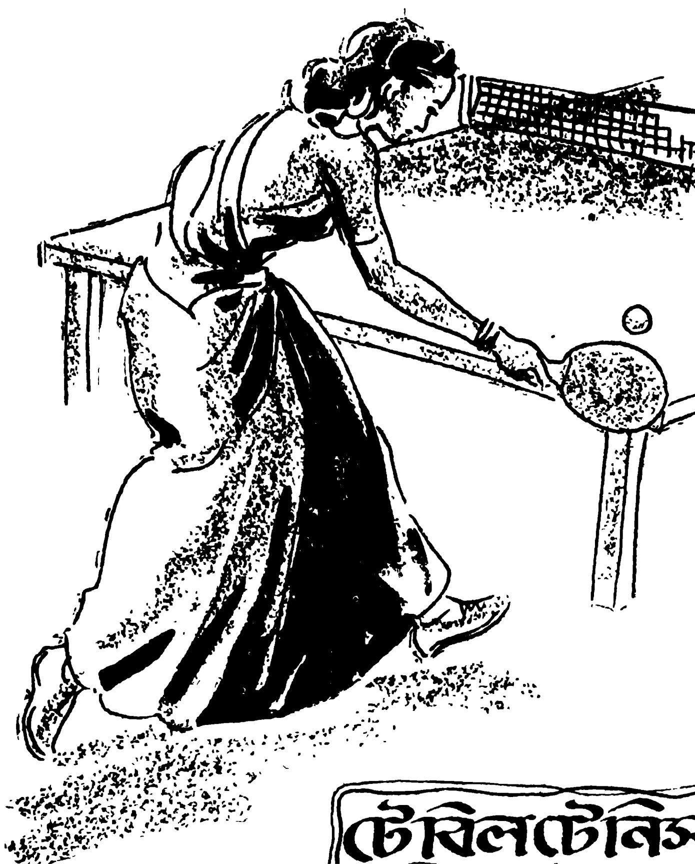
সিঙ্গিলস এবং ডাবলস-এ—নরেন্দ্রনাথ, নরেশকুমার ও আর. কৃষ্ণান।

ভারত অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভ করে এবং পরবর্ত্তী রাউণ্ডে ফ্রান্সের কাছে ৪-১ খেলায় পরাজিত হয়।

**১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ ঃ**—ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—

সিঙ্গিলস এবং ডাবলস নরেশকুমার ও আর. কৃষ্ণান।

ভারত দ্বিতীয় রাউণ্ডে [illegible]রকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হয়। কোয়ার্টার ফাইন্যালে ভারত বৃটেনের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ৩-২ খেলায় পরাজিত হয়।




## টেবিল টেনিস খেলার জন্ম ও বিস্তার

এই পৃথিবীতে টেবিল টেনিস বা পিং পং খেলা যে কবে, কোন্ দেশে এবং কোন্ সময়ে সুরু হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস আজও আবিষ্কৃত হয়নি।

কোন কোন ঐতিহাসিক দাবী করেন যে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই খেলা নাকি ইংলণ্ডে সুরু হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে ইংলণ্ডে এই খেলা আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিছু কিছু লোকের ধারণা যে সৈন্য-বিভাগের একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী ভারতবর্ষে থাকার সময়ে খেলাটির সৃষ্টি করেন। এক শ্রেণীর লোক আজও বিশ্বাস করে যে, বোয়ার যুদ্ধের আগে সৈন্যবিভাগের একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময়ে খেলাটির প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে বা দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ সৈন্যবিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী এই খেলা সৃষ্টি করেছিলেন বলে যাঁরা দাবী

করেন, তাঁরা সেই বৃটিশ কর্ম্মচারীর নাম বা কোন্ সময়ে এবং কোথায় যে এই খেলা সেই সৈন্যবিভাগের কর্ম্মচারী সৃষ্টি করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য তারিখ বা কাগজপত্র দেখাতে পারেন না।

এই খেলার জন্ম সম্বন্ধে প্রাক্তন আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশন-এর সভাপতি আইভর মণ্টেগু বিশেষ গবেষণা করে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ইংরেজ খেলাধুলার সরঞ্জাম বিক্রেতাদের জিনিসের তালিকায় এই খেলার সরঞ্জামের নাম দেখতে পান। অবশ্য এই খেলার নাম তখন টেবিল টেনিস বা পিং পং ছিল না, **গসিমা** (gossima) বা আরও অন্যান্য নামে খেলা হতো। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জেমস্ গিব্ নামে একজন ভদ্রলোক ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় বেড়াতে এসে কর্ক বা রবারের বল দিয়ে এই খেলা খেলতে দেখতে পান। গিব্-এর মাথায় এই খেলা দেখে একটা বুদ্ধি খেলে যায়। তাঁর মনে হয়, যদি রবার বা কর্কের বলের বদলে ফাঁপা সেলুলয়েড বলের সাহায্যে এই খেলাটি খেলা হয়, তাহলে বোধহয় খেলাটি আরও আকর্ষণীয় হয়।

গিব্ দেশে ফিরে এসে নিজের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ঐ ফাঁপা সেলুলয়েডের বল দিয়ে খেলে অত্যাশ্চর্য্য ফল পান। গিব্ তাঁর এই খেলার কথা তাঁর জনৈক খেলাধুলার সরঞ্জাম বিক্রেতা বন্ধুর কাছে বলেন। ফলে সেই বন্ধু এই ফাঁপা বল বিক্রী সুরু করেন। এই ফাঁপা সেলুলয়েডের বলে খেলাটি এত আকর্ষণীয় হয় যে, কয়েক বছরের মধ্যেই টেবিল টেনিস খেলা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

গিব্-এর ঐ খেলাধুলার সরঞ্জাম বিক্রেতা বন্ধুর দোকানের নাম ছিল লণ্ডনের 'হ্যামলী ব্রাদার্স'। **হ্যামলী ব্রাদার্সই এই খেলার নাম পিং পং রাখেন।** পিং পং নামটি বলা হতো এইজন্যে যে, বলটা যখন ব্যাটে লাগে তখন 'পিং' করে শব্দ হয়ে ওঠে এবং বলটা ব্যাটে লেগে যখন আবার টেবিলে এসে পড়ে তখন 'পং' করে শব্দ হয় বলে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দ থেকে ইংলণ্ডে এই খেলা ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইংলণ্ডে এই খেলা খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ার প্রধান কারণ হিসেবে বলা যায় যে, লণ্ডনের গুড নামে একজন ভদ্রলোক **১৯০২ খৃষ্টাব্দে টেবিল টেনিস ব্যাট-এর দুধারে কাঠের 'পরে রবার, বালির কাগজ এবং ভেলাম নামে একপ্রকারের পাতলা চামড়া-জাতীয় জিনিস লাগিয়ে খেলার প্রথা আবিষ্কার করেন।** এই আবিষ্কারের ফলে আগে থেকে বলকে বেশী আয়ত্তে রাখার সুবিধা হতে থাকায় খেলার উৎসাহ সাধারণের মধ্যে ভীষণভাবে বেড়ে যায়।

বিশেষ করে ইংলণ্ডের সৌখীন ও ধনী সম্প্রদায়ের লোকেরা এই খেলাটি ভীষণভাবে খেলতে সুরু করেন। বিভিন্ন জায়গায় প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম-দিকে লণ্ডনের কুইনস্ হল-এ **সাধারণ প্রতিযোগিতা** অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ এত খ্যাতি অর্জ্জন করে যে, ক্রমে ক্রমে ফ্রান্স, জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার খেলোয়াড়েরা যোগদান করতে থাকেন। ফলে এই প্রতিযোগিতা একরূপ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সুরু থেকে অর্থাৎ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ থেকে, প্রথম মহাযুদ্ধের জন্যে ইউরোপ ও আমেরিকাতে টেবিল টেনিস খেলা একরকম বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত এ খেলা আর আগের মত সাধারণের আনন্দের বস্তু থাকে না। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ থেকে ধীরে ধীরে ইউরোপীয় দেশসমূহে আবার টেবিল টেনিস খেলা আরম্ভ হতে থাকে।

**১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ইংলিশ টেবিল টেনিস এসোসিয়েশন পিং পং নাম ত্যাগ করে খেলাটির নাম টেবিল টেনিস করেন।**

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের ডাঃ লিম্যানের নিমন্ত্রণে বার্লিনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের যে সভা হয়, সেই সভায় **আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশন** গঠিত হয়। এই আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশনই বর্ত্তমানে পৃথিবীর টেবিল টেনিস খেলার পরিচালক বা সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। এই সভাতেই টেবিল টেনিস খেলা এবং টেবিল টেনিস খেলার বিভিন্ন সরঞ্জাম সম্বন্ধে আইন তৈরী হয়।

আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশন গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দেই আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশন **বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা** আরম্ভ করেন। বর্ত্তমানে ৫৫টি জাতি আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশন-এর সদস্য।

আমেরিকার পিং পং এসোসিয়েশন গঠিত হয় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। এই এসোসিয়েশন ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে আমেরিকার জাতীয় প্রতিযোগিতা সুরু করেন।

## ভারতে টেবিল টেনিস খেলা

১৯১০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় টেবিল টেনিস খেলা প্রথম সুরু হয় ওয়াই. এম. সি. এ.-তে। বিভিন্ন কাগজপত্র থেকে যতদূর সংবাদ পাওয়া যায় তা থেকে

মনে হয়, ভারতে এর আগে অন্য কোথাও নিয়ম অনুযায়ী টেবিল টেনিস খেলা হতো না। ক্রমশঃ খেলাটি দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথম প্রতিযোগিতামূলক খেলার সৃষ্টি হয় আন্তঃক্লাব খেলার মধ্য দিয়ে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে। মুসলিম ইনষ্টিটিউট ও কলেজ স্ট্রীট ওয়াই. এম. সি. এ.-র মধ্যে এই খেলা প্রথম আরম্ভ হয়।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লণ্ডনে ভারতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড়েরা বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতি-যোগিতায় এইসব ছাত্রেরা অংশগ্রহণ করে সাফল্য লাভ করায় ভারতের সুনাম বেড়ে যায়। ভারতীয় ছাত্রদের খেলা এত উচ্চাঙ্গের ছিল যে, এই খেলোয়াড়দের মধ্যে দু'এক জনকে এই সময়কার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের পর্য্যায়ে ধরা হোতো। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পি. এন. নন্দ এবং ১৯২৬ ও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এম. জি. সুফিয়া ইংলণ্ডের টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে বিবেচিত হন। এই সুফিয়া 'চপ্‌স' (chops) ও 'স্লাইসেস' (slices) মারের আবিষ্কার করেন।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতাতে ভারত যোগদান করে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে ১২ বার বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে ৯ বার ভারত এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ভারতের যে-সব ছাত্র লণ্ডনে পড়াশুনার জন্যে ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকেই অবশ্য এই ৯ বার দল গঠন করা হয়।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ওয়াই. এম. সি. এ. কলেজ শাখা, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট এবং মুসলিম ইনষ্টিটিউটের প্রতিনিধিরা মিলে প্রথম একটা বেসরকারী এসোসিয়েশন গঠন করেন। এই এসোসিয়েশন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে 'অল বেঙ্গল পিং পং টুর্ণামেণ্ট' নাম দিয়ে প্রথম প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেন। প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় শুধু পুরুষদের সিঙ্গিলস ও দলগত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ধনী ব্যবসায়ী হরদৎলাল চামেরিয়া এই প্রতিযোগিতার জন্য দুটি কাপ উপহার দেন। ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র মহম্মদ আবদুল্লা সিঙ্গিলস-এ এবং ওয়াই. এম. সি. এ. কলেজ শাখা দলগত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সরকারীভাবে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম টেবিল টেনিস এসোসিয়েশন 'বেঙ্গল টেবিল টেনিস এসোসিয়েশন'-এর জন্ম

হয়। সি. এস. প্যাটারসন এই এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি এবং অমর মুখার্জ্জি ও ডাঃ এ. এন. সিংহ এসোসিয়েশনের যুগ্ম-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এইচ. এম. বরফওয়ালার চেষ্টায় বোম্বাই টেবিল টেনিস এসোসিয়েশন-এর সৃষ্টি হয়। মাদ্রাজ টেবিল টেনিস এসোসিয়েশন-এর জন্ম হয় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে। এই ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবে 'অল ইণ্ডিয়া টেবিল টেনিস এসোসিয়েশন' জন্মলাভ করে।

অল ইণ্ডিয়া টেবিল টেনিস এসোসিয়েশন সৃষ্টি হবার পরেই ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'অল ইণ্ডিয়া টেবিল টেনিস এসোসিয়েশন' জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ থেকে মহিলাদের সিঙ্গিলস প্রতিযোগিতা এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতা এই জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে এই সময়কার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেবিল টেনিস খেলোয়াড় জি. ভি. বার্ণা ও এল. বেলাক্ ভারত-ভ্রমণে আসেন। বার্ণা ও বেলাক্ তাঁদের অপূর্ব্ব খেলা দেখিয়ে ভারতে টেবিল টেনিস খেলার উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দিয়ে যান। বার্ণা ও বেলাক্ তাঁদের ভারত-ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরে যাবার সময় ভারত সফরের স্মৃতিকে ভারতীয়দের কাছে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্যে একটা সুদৃশ্য কাপ উপহার দিয়ে যান। বার্ণা ও বেলাক-এর প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ এই কাপটিই আন্তঃপ্রাদেশিক খেলায় বিজয়ী দলের কাপ হিসাবে দেওয়া হয়।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম 'ভারতীয় টেবিল টেনিস দল' বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় সরকারীভাবে যোগ দেয়। এর পর যুদ্ধের জন্য অন্যান্য খেলাধুলার মত টেবিল টেনিস খেলাও প্রায় একরূপ বন্ধ থাকে। যাই হোক, যুদ্ধের পর ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ভারত প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় দল পাঠায়। আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় যতগুলি দলকে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় পাঠানো হয়েছে, তার মধ্যে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের এই দলটিকেই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল হিসাবে ধরা হয়।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বি. ভানা, আই. এ্যাণ্ড্রিয়াডিস, রিচার্ড বার্জম্যান, ভিক্টর বার্ণা ও জেবাডোস প্রভৃতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়েরা ভারত-ভ্রমণে আসেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে জনী লীচ এবং মিচেল হগ্‌নেয়ার ভারতের জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বুদাপেষ্টে এবং ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনায় বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল যোগদান করে।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনার প্রতিযোগিতাতে ভারতের মহিলা খেলোয়াড়েরাও প্রথম বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের সঙ্গে এইভাবে খেলবার এবং খেলা দেখবার সুযোগ লাভ করে ভারতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের অনেক কিছু শেখবার সুযোগ হয়। জনসাধারণও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের খেলা দেখবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠায় টেবিল টেনিস খেলা ভারতে আরও বেশী প্রচারিত হয় ও আকর্ষণের সৃষ্টি করে।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দ ভারতীয় টেবিল টেনিস ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এই ১৯৫২ খৃষ্টাব্দেই টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া ভারতে 'বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা'র ব্যবস্থা করেন। এর আগে ভারতে কোন খেলাধুলারই বিশ্ব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়নি। ভারতীয় টেবিল টেনিস কর্তৃপক্ষ এর জন্যে সমস্ত ভারতবাসীর কাছেই কৃতিত্বের অধিকারী। বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে ১লা থেকে ১০ই ফেব্রুযারী পর্য্যন্ত এই বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়েরা এই বিশ্ব প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে ভারতীয় টেবিল টেনিসের মর্য্যাদা বাড়িয়ে দেন।

## *টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া*
## *( টি. টি. এফ. আই )*

ভারতের টেবিল টেনিস খেলার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানকে টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া বলা হয। টেবিল টেনিস খেলাকে ভারতে আরও বেশী প্রচলিত করবার এবং ভারতের টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের খেলা আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সকল দায়িত্বই টেবিল টেনিস ফেডারেশনের। ভারতের শ্রেষ্ঠ টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা, যাকে জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতা বলা হয়, সেই প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্বও এই ফেডারেশনের উপর ন্যস্ত। আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত এই ফেডারেশন, প্রয়োজন হলে, টেবিল টেনিস খেলার আইনের পরিবর্ত্তন বা নূতন আইনের প্রচলন করতে পারেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল টেবিল টেনিস এসোসিয়েশন-এর সম্পাদক মণীশ চ্যাটার্জ্জী সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি এসোসিয়েশন গঠন করবার চেষ্টা সুরু করেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারেন না।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই টেবিল টেনিস এসোসিয়েশন-এর এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ টেবিল টেনিস এসোসিয়েশন সৃষ্টি হবার পর মণীশ চ্যাটার্জ্জী পিথাপুরমের যুবরাজকে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি ফেডারেশন গঠন করবার কথা বলায় পিথাপুরমের যুবরাজ এ বিষয়ে উৎসাহী হন।

পিথাপুরমের যুবরাজ ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা সাউথ ক্লাবে এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় পিথাপুরমের যুবরাজ ছাড়া বেঙ্গল টেবিল টেনিস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মণীশ চ্যাটার্জ্জী, বোম্বাই টেবিল টেনিস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এইচ. এম. বরফওয়ালা এবং মাদ্রাজ টেবিল টেনিস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে টি. আর. রাঘবচারি উপস্থিত হন।



পিথাপুরমের যুবরাজ

এই সভাতেই অল ইণ্ডিয়া বা ভারতীয় টেবিল টেনিস এসোসিয়েশনের সৃষ্টি হয়। পিথাপুরমের যুবরাজ সভাপতি, এইচ. এম. বরফওয়ালা সম্পাদক এবং মণীশ চ্যাটার্জ্জী কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। অল ইণ্ডিয়া টেবিল টেনিস এসোসিয়েশনের প্রয়োজনীয় আইনও এই সভায় তৈরী করা হয়।

ভারতীয় টেবিল টেনিস এসোসিয়েশন সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে এই এসোসিয়েশন সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা সুরু করেন। প্রথম বছরে পুরুষদের সিঙ্গিলস ও ডাবলস এবং আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকে অল ইণ্ডিয়া টেবিল টেনিস ফেডারেশনের নাম পরিবর্ত্তন করে 'টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া' রাখা হয়। পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গিলস এবং ডাবলস প্রতিযোগিতাকে এই সময় থেকেই জাতীয় প্রতিযোগিতা বলা হয় এবং আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতাকে 'আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতা' নাম দেওয়া হয়।

## বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশন বিশ্বের টেবিল টেনিস খেলার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। ৫৫টি জাতির প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এই প্রতিষ্ঠান ১৯২৬

খৃষ্টাব্দে সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে যে বাৎসরিক প্রতিযোগিতা সুরু করেন, তাকেই বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা বলা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কোন্ বছর কোথায় যে এই প্রতিযোগিতা হবে, সেটা আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশন স্থির করে দেন।

বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে খেলা হয়। এর মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের একক এবং দলগত প্রতিযোগিতা আছে। যে ক'টি ভাগে এই প্রতিযোগিতা ভাগ করে খেলা হয় সেই বিভাগ ক'টির নাম নীচে দেওয়া হলো—

(১) **সোয়েথলিং কাপ—পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতা।**
(২) **মার্সেল কর্বিলন কাপ—মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতা।**
(৩) **সেণ্ট ব্রাইড ভেস—পুরুষদের সিঙ্গিলস প্রতিযোগিতা।**
(৪) **জি-জিষ্ট প্রাইজ—মহিলাদের সিঙ্গিলস প্রতিযোগিতা।**
(৫) **ইরাণ কাপ—পুরুষদের ডাবলস প্রতিযোগিতা।**
(৬) **পোপ কাপ—মহিলাদের ডাবলস প্রতিযোগিতা।**
(৭) **হেডুসেক কাপ—মিক্সড্ ডাবলস প্রতিযোগিতা।**

এ ছাড়াও পুরুষদের কনসোলেশন সিঙ্গিলস, মহিলাদের কনসোলেশন সিঙ্গিলস ও জুবিলী কাপ নামেও তিনটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

## সোয়েথলিং কাপ

বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশের পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে যে কাপটি দেওয়া হয়, তাকে সোয়েথলিং কাপ বলে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লেডী সোয়েথলিং তাঁর স্বামী লর্ড সোয়েথলিং-এর নামে এই সুদৃশ্য কাপটি উপহার দেন। এই কাপটি মাটি থেকে ১৮ ইঞ্চি উঁচু।

সোয়েথলিং কাপে খেলবার জন্যে যে-কোন দেশ পাঁচজন পর্য্যন্ত প্রতিযোগী পাঠাতে পারে। তবে প্রতিযোগিতার সময় ঐ পাঁচজনের মধ্য থেকে দলের অধিনায়ক যিনি থাকেন তিনি যে-কোন তিনজন খেলোয়াড়কে বাছাই করে নেন। কারণ, এই প্রতিযোগিতার আইন অনুযায়ী তিনজনের বেশী খেলোয়াড় যোগ দিতে পারে না। এইভাবে বিভিন্ন দেশের বাছাই-করা তিনজন পুরুষ খেলোয়াড়ের মধ্যে এই দলগত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলার তালিকা অনুযায়ী একদলকে অপর দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। সবসমেত ৯টি সিঙ্গিলস খেলার মধ্যে যে দল ৫টি খেলায় জয়লাভ করতে

পারে, তারাই জয়ী হয়। প্রত্যেকটি খেলা তিনটি গেমে মীমাংসা হয়। অর্থাৎ ঐ তিনটি গেমের মধ্যে যে খেলোয়াড় ২টি গেমে জয়লাভ করে, সে-ই জয়ী হয় এবং জয়ী খেলোয়াড়ের দলও একটি খেলায় জয়ী বলে সাব্যস্ত হয়।



সোয়েথলিং কাপ

খেলা সুরু হবার আগে প্রথমে দুই দলের অধিনায়ক টস্ করেন। এই টস্-এ যে দলের অধিনায়ক জয়লাভ করেন তিনি তাঁর দলের তিনজন খেলোয়াড়ের নাম A, B, C বা X, Y, Z রাখেন। কোন্ খেলোয়াড় 'A', কোন্ খেলোয়াড় 'B' এবং কোন্ খেলোয়াড় 'C' হবে, সেটাও বিপক্ষ দলের শক্তি বুঝে অধিনায়ককে ঠিক করে দিতে হয়। যে দলের অধিনায়ক টস্-এ জয়লাভ করেন তিনি A, B, C নিলে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের নাম হয় X, Y, Z; তবে কোন্ খেলোয়াড় 'X' হবে, কোন্ খেলোয়াড় 'Y' হবে এবং কোন্ খেলোয়াড় 'Z' হবে—এটা বিপক্ষ দলের অধিনায়ক ঠিক করে দেন। খেলা সুরু করবার আগে পর্য্যন্ত কোন্ খেলোয়াড়ের নাম কি রাখা হয়েছে সেটা বিপক্ষ দলকে জানতে দেওয়া হয় না। উভয় দলের অধিনায়ককে খেলা সুরু হবার আগেই কোন্ কোন্ খেলোয়াড় খেলবেন এবং কোন্ কোন্ খেলোয়াড়ের নাম কি রাখা হয়েছে, সেটা রেফারীকে জানিয়ে দিতে হয়।

৯টি সিঙ্গিলস খেলা কি ভাবে হয় এবং কোন্ খেলার পর কোন্ খেলা হয়, সেটা ১, ২, ৩ করে বুঝিয়ে দেওয়া হলো—

| | | |
|---|---|---|
| (১) A—X | (২) B—Y | (৩) C—Z |
| (৪) A—Y | (৫) C—X | (৬) B—Z |
| (৭) C—Y | (৮) A—Z | (৯) B—X |

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম বছরের প্রতিযোগিতা লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতা সুরু হওয়া থেকে হাঙ্গেরী পর পর পাঁচবছর সোয়েথলিং কাপ-এ জয়লাভ করে এক অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি লাভ করে। আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন জাতিই এ গৌরব লাভ করতে পারেনি।

## মার্সেল কর্বিলন কাপ

বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশের মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে যে কাপটি দেওয়া হয়, তাকে 'মার্সেল কর্বিলন কাপ' বলে। কর্বিলন কাপকে টেবিল টেনিস খেলায় মহিলাদের ডেভিস কাপ বলা হয়।

মার্সেল কর্বিলন কাপের খেলা সুরু হয় সোয়েথলিং কাপ সুরু হবার ৯ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে। ফ্রান্সের টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি মার্সেল কর্বিলন এই কাপটি উপহার দেন বলে কাপটি ঐ নামেই পরিচিত।



মার্সেল কর্বিলন কাপ

কর্বিলন কাপে খেলার জন্যে যে-কোন দেশ ৫ জন পর্য্যন্ত খেলোয়াড় পাঠাতে পারেন। তবে এই ৫ জন খেলোয়াড়ের মধ্য থেকে দলের যিনি অধিনায়িকা থাকেন, তিনি কোন্ ২ জন খেলোয়াড় সিঙ্গিলস এবং কোন্ ২ জন খেলোয়াড় ডাবলস খেলবেন সেটা প্রতিযোগিতা সুরু হবার আগেই ঠিক করে দেন। প্রয়োজন হলে একই খেলোয়াড় সিঙ্গিলস এবং ডাবলস খেলায় যোগ দিতে পারেন।

৫টি খেলায় কর্বিলন কাপের খেলা নিষ্পত্তি হয়। এই ৫টি খেলার মধ্যে ৪টি সিঙ্গিলস ও ১টি ডাবলস খেলা হয়। যে-কোন ৩টি খেলায় জয়লাভ করতে পারলে সেই দল জয়ী হয়। প্রত্যেক খেলার আবার ৩টি গেমে মীমাংসা হয়। এই ৩টি গেমের মধ্যে যে খেলোয়াড়েরা ২টি গেমে জয়লাভ করে তারা সে খেলায় বিজয়ী হয়।

সোয়েথলিং কাপের ন্যায় কর্বিলন কাপেও খেলা সুরু করবার আগে দুই দলের অধিনায়িকার মধ্যে টস্ হয় এবং যিনি টস্-এ জয়লাভ করেন তিনি তাঁর দলের খেলোয়াড় দুজনের নাম A, B অথবা X, Y রাখবেন, ঠিক করে দেন। এইভাবে দুই দলের খেলোয়াড়দের নাম ঠিক হবার পর নীচে লেখা তালিকা অনুযায়ী খেলা হয়।

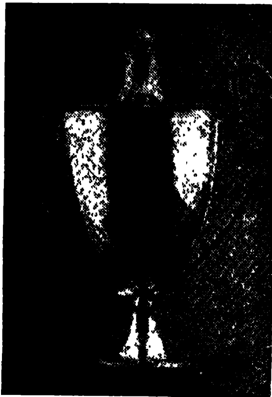
(১) A—X, (২) B—Y, (৩) ডাবলস, (৪) A—Y, (৫) B—X.

প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় জার্ম্মানীর মহিলা দল কর্বিলন কাপ জয়লাভ করবার গৌরব লাভ করেন।

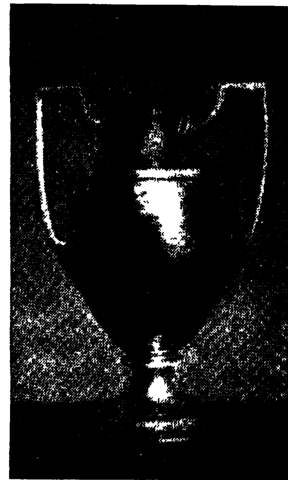
## সেণ্ট ব্রাইড ভেস

বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী সকল পুরুষ খেলোয়াড়দের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীকে যে কাপটি দেওয়া হয়, তাকে 'সেণ্ট ব্রাইড ভেস' বলে। যে খেলোয়াড় যে বছর সেণ্ট ব্রাইড ভেস লাভ করেন তিনি সেই বছরের জন্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেবিল টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে বিবেচিত হন।

খেলার তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেক খেলোয়াড়কে অপর খেলোয়াড়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। ৫টি গেমে খেলার মীমাংসা হয়। এই ৫টি খেলার মধ্যে যে খেলোয়াড় ৩টি গেমে জয়লাভ করতে পারেন সেই খেলোয়াড় জয়ী হন



সেণ্ট ব্রাইড ভেস



জি-জিষ্ট প্রাইজ

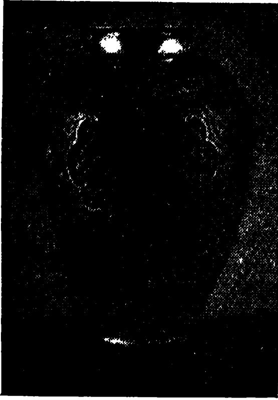
## জি-জিষ্ট প্রাইজ

মহিলাদের সিঙ্গিলস প্রতিযোগিতা ঠিক পুরুষদের সিঙ্গিলস প্রতিযোগিতার নিয়মে পরিচালিত হয়। যে মহিলা খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হন, তিনি 'জি-জিষ্ট প্রাইজ' লাভ করেন। 'জি-জিষ্ট প্রাইজ'-বিজয়িনী মহিলা খেলোয়াড়কে সেই বছরের জন্যে মহিলাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে গণ্য করা হয়।

## ইরাণ কাপ, পোপ কাপ ও হেডুসেক কাপ

পুরুষদের ডাবলস প্রতিযোগিতায় যে জুটী জয়লাভ করে, তারা 'ইরাণ কাপ'

লাভ করে। মহিলাদের ডাবলস প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী জুটীকে 'পোপ কাপ'



ইরাণ কাপ



পোপ কাপ

দেওয়া হয় এবং মিক্সড্ ডাবলস খেলায় বিজয়ী দলকে 'হেড়ুসেক কাপ' দেওয়া হয়।

এই তিনটি বিভাগের খেলার-ই ৫টি করে গেমে নিষ্পত্তি হয়। এই ৫টি গেমের মধ্যে ৩টি গেমে জয়লাভ করতে পারলে সেই খেলায় জয়ী হওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশনের তালিকা অনুযায়ী এই তিনটি বিভাগের খেলা-ই অনুষ্ঠিত হয়।

## *জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা*

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় টেবিল টেনিস ফেডারেশন সৃষ্টি হবার পর এই ফেডারেশন সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা সুরু করেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই প্রতিযোগিতাকে পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গিলস ও ডাবলস প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক দলগুলির মধ্যে খেলাকে আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা নামে অভিহিত করা হতো। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় টেবিল টেনিস ফেডারেশন পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতাকে জাতীয় প্রতিযোগিতা এবং আন্তঃ প্রাদেশিক প্রতিযোগিতাকে আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতা হিসাবে নাম পরিবর্ত্তন করেন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায় রেঞ্জার্স ক্লাবে। প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় শুধু মাত্র পুরুষদের সিঙ্গিলস এবং ডাবলস খেলা ও আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গিলস খেলায় এম. আয়ুব

এবং ডাবলস খেলায় অরুণ ঘোষ ও ডি. আর. ভাসিন জয়লাভ করেন। আন্তঃ-প্রাদেশিক খেলা হয় বাঙ্গলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও দিল্লীর মধ্যে। পাঞ্জাব এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে যখন দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তখন মহিলাদের সিঙ্গিলস খেলাকে প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথম বছরের মহিলাদের প্রতিযোগিতায় মিস. ডি. লামা বিজয়িনী হন।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে এই আন্তঃরাজ্য এবং জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবার সময়ে মহিলাদের আন্তঃরাজ্য, মহিলাদের ডাবলস ও মিক্সড্ ডাবলস খেলাকে প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মহিলাদের আন্তঃরাজ্য খেলায় বোম্বাই দল পর পর সাতবছর জয়লাভ করে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ছোটদের সিঙ্গিলস প্রতিযোগিতা অন্তর্ভুক্ত হয়।

টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক পরিচালিত এই আন্তঃরাজ্য এবং জাতীয় প্রতিযোগিতা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়।

পুরুষদের সিঙ্গিলস খেলায় বিজয়ীকে যে কাপটি দেওয়া হয় তাকে 'মহারাজা পিথাপুরম কাপ' ও পুরুষদের ডাবলস খেলায় বিজয়ীদের কাপটিকে 'যুবরাজ পিথাপুরম কাপ' বলে। ঐ দুটি কাপই পিথাপুরমের যুবরাজের দান। মহিলাদের সিঙ্গিলস খেলার কাপটির নাম 'ত্রিবাঙ্কুর কাপ'—এটি ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার দান। মহিলাদের ডাবলস খেলায় বিজয়িনীদের যে কাপটি দেওয়া হয় তার নাম 'সুসান বার্ণা কাপ'। সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ভিক্টর বার্ণা ও তাঁর স্ত্রী সুসান বার্ণার দান এই কাপটি। পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের যে কাপটি দেওয়া হয় সেটির নাম 'বার্ণা-বেলাক কাপ'। ১৯৩৮ সালে বার্ণা ও বেলাক প্রথম ভারত-সফরে এসে তাদের প্রীতির চিহ্নস্বরূপ এই কাপটি দান করে যান। মহিলাদের দলগত প্রতি-যোগিতায় বিজয়ী রাজ্যদল 'জয়লক্ষ্মী কাপ' লাভ করে থাকে। ছোটদের সিঙ্গিলসে 'ইন্দিরা ট্রফি', ছোটদের দলগত প্রতিযোগিতায় 'রামানুজম ট্রফি' এবং ভেটারেনস সিঙ্গিলসের খেলায় 'মাধবরাজ কাপ' দেওয়া হয়।

জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতার সকল খেলা-ই আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশনের আইন অনুযায়ী খেলা হয়। পুরুষদের আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতা সোয়েথলিং কাপের নিয়মে এবং মহিলাদের আন্তঃরাজ্য প্রতি-যোগিতা কর্ব্বিলন কাপের নিয়মে খেলা হয়।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে টমাস জে. ওয়াটসন আন্তর্জাতিক ভলিবল প্রতিযোগিতার জন্যে একটি সুদৃশ্য কাপ দান করেন।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ থেকে **বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতা** সুরু হয়।

## ভারতে ভলিবল খেলা

ওয়াই. এম. সি. এ.-র বিভিন্ন শাখার চেষ্টাতে ভারতে ভলিবল খেলা প্রচলিত হয়।

বাঙ্গলাদেশেও ওয়াই. এম. সি. এ.-ই ভলিবল খেলা প্রথম আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ বিভিন্ন কলেজ হোষ্টেলের ছাত্রদের মধ্যে খেলাটি প্রচলিত হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ভলিবল বিভিন্ন ক্লাব ও জিমনাসিয়ামে খেলতে দেখা যায়।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বাগবাজার জিমনাসিয়াম ক্লাব প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ভলিবল খেলার সৃষ্টি করেন। এই প্রতিযোগিতার নাম ছিল 'ক্যালকাটা ভলিবল লীগ'। প্রথম বছরেই অনেকগুলি ক্লাব এই ভলিবল লীগ খেলায় যোগদান করে। ভলিবল খেলার উৎসাহ ক্রমশঃই বাড়তে থাকে, ফলে কলকাতা ছাড়াও বিভিন্ন জেলার মধ্যে ভলিবল খেলা প্রচলিত হয়।

বিভিন্ন ক্লাবের সৃষ্টি হওয়ায় ভলিবল খেলার একটা উপযুক্ত আইন তৈরী করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। বাগবাজার জিমনাসিয়াম ক্লাব এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে বিভিন্ন ভলিবল ক্লাবের প্রতিনিধি ও উৎসাহী লোকদের নিয়ে এক সভা আহ্বান করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সভাতেই 'বেঙ্গল ভলিবল এসোসিয়েশন'-এর জন্ম হয়। এই এসোসিয়েশন ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ভলিবল খেলার আইন এবং এসোসিয়েশনের নিয়মাবলী প্রকাশ করেন।

কিন্তু এই এসোসিয়েশনের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় কতগুলি ক্লাব মিলে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল ভলিবল ফেডারেশন' গঠন করেন। ফলে বেঙ্গল ভলিবল ফেডারেশন এবং বেঙ্গল ভলিবল এসোসিয়েশন উভয়েই ভলিবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে থাকেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক ভলিবল প্রতিযোগিতা 'বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন'-এর দ্বারাই পরিচালিত হতো। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল ভলিবল ফেডারেশন' গঠিত হবার পর এই প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার ভার 'ভলিবল ফেডারেশন' গ্রহণ করেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল ভলিবল ফেডারেশনের চেষ্টা এবং উৎসাহে বাঙ্গলা দল আন্তঃপ্রাদেশিক ভলিবল প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে 'ভারতীয় ভলিবল ফেডারেশন'-এর সৃষ্টি হয়। এর আগে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন ভারতের ভলিবল পরিচালনার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান ছিল। ভারতীয় অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি একবছর অন্তর আন্তঃপ্রাদেশিক ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। এই আন্তঃ-প্রাদেশিক খেলা পরিচালনার দায়িত্ব ছিল ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের ওপর। ১৯৫২ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ভলিবল ফেডারেশন আন্তর্জাতিক ভলিবল ফেডা-রেশনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ব-ভলিবল প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ১৯৫৫ সালের মার্চ্চ মাসে প্রথম বহিরাগত দল হিসাবে ভলিবলে বিশ্ববিজয়ী রাশিয়ার বিখ্যাত 'স্পার্টাক' দল ভারতীয় ভলিবল ফেডারেশনের আমন্ত্রণে ভারত সফরে আসে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে খেলাগুলি ছাড়াও ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে ৩টি টেষ্ট-ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা হয়। কলকাতায় প্রথম টেষ্টে ও দিল্লীতে ৩য় টেষ্টে ভারতীয় দল স্পার্টাক দলকে পরাজিত করে ভারতীয় ভলিবলের গৌরব বহুলাংশে বাড়িয়ে তোলে।

## *ভলিবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া*

ভারতে ভলিবল খেলার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানকে বর্ত্তমানে 'ভলিবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া' বলা হয়।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন লুধিয়ানায় এ্যাথলেটিকস্ ও বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। ভলিবল খেলা এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ায় একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেউই এ বিষয়ে অগ্রণী হন না।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের তরফ থেকে এস. কে. বসু বিভিন্ন রাজ্য-এসোসিয়েশনকে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করবার কথা উল্লেখ করে লুধিয়ানায় সকলকে মিলিত হবার জন্যে অনুরোধ করেন।

ফলে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে লুধিয়ানায় এ্যাথলেটিকস্ ও বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার সময়ে একটি সভা হয়। রাজপুতানা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বাঙ্গলা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী এবং বোম্বাইয়ের প্রতিনিধিরা এই সভায় মিলিত হয়ে 'ভলিবল ফেডারেশন

অফ ইণ্ডিয়া' গঠন করেন। প্রিন্সিপ্যাল এফ. সি. অরোরা সভাপতি এবং এস. কে. বসু এই ফেডারেশনের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পাটনার সভায় ভলিবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়াকে সরকারী ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। একবছর অন্তর যে আন্তঃপ্রাদেশিক ভলিবল প্রতিযোগিতা ভারতীয় অলিম্পিক গেমস্-এর সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতো সেই প্রতিযোগিতা প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হবে বলে 'ভলিবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া' স্থির করেন। ফলে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রতিবছরই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন-ই আন্তঃপ্রাদেশিক ভলিবল খেলার ব্যবস্থা করতেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ থেকে ভলিবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কাছ থেকে ভলিবল খেলা পরিচালনার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

## বেঙ্গল ভলিবল ফেডারেশন

বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে ভলিবল খেলা পরিচালনার সকল দায়িত্ব 'বেঙ্গল ভলিবল ফেডারেশন'-এর উপর ন্যস্ত।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর বেঙ্গল ভলিবল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই এসোসিয়েশনের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় কতকগুলি ক্লাব মিলে একটি নূতন এসোসিয়েশন গঠন করার চেষ্টা করতে থাকেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট ওয়াই. এম. সি. এ. চৌরঙ্গী শাখাতে ১২টি ক্লাবের প্রতিনিধিরা বি. এইচ. পিক-এর সভাপতিত্বে মিলিত হন। এই সভাতেই বেঙ্গল ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর পরবর্ত্তী সভায় এই ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় আইন গঠন করা হয়। বি. এইচ. পিক প্রথম সভাপতি এবং এ. কে. ব্যানার্জ্জী ফেডারেশনের প্রথম সম্পাদক হিসাবে নির্ব্বাচিত হন।

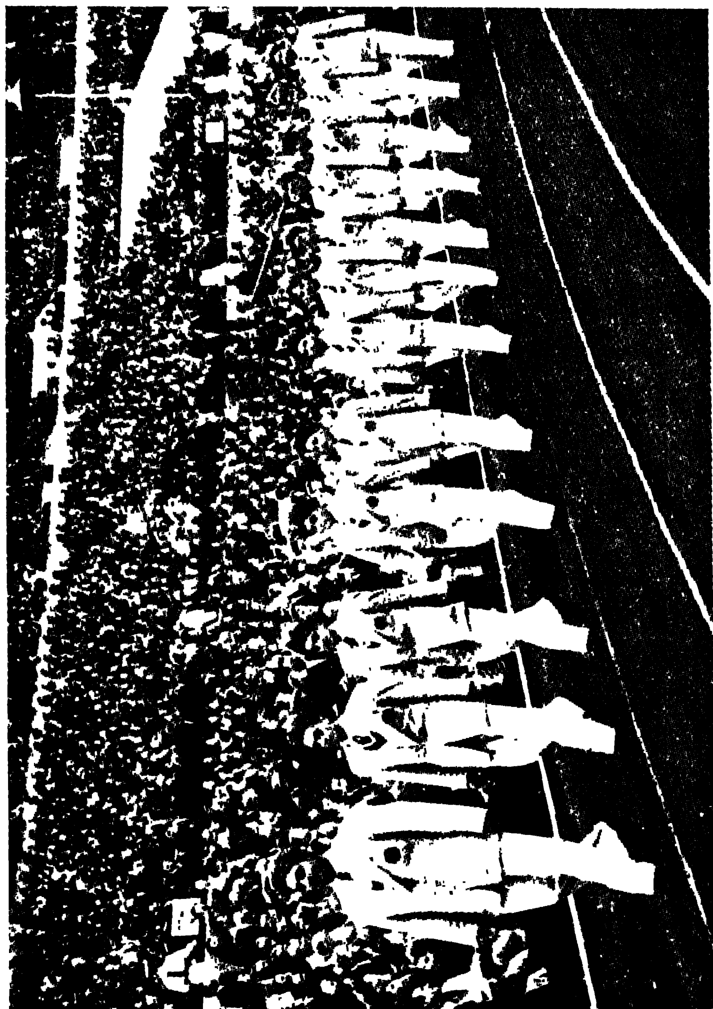
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল ভলিবল ফেডারেশন' বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকেই বেঙ্গল ভলিবল ফেডারেশন বাঙ্গলাদেশের সকল ভলিবল প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম হাওড়া জেলা এই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্রমে ২৪ পরগণা এবং অন্যান্য জেলাও একে একে এই ফেডারেশনের সভ্য হিসাবে প্রবেশ করে।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ভলিবল ফেডারেশন অফিস লীগ খেলার প্রচলন করেন।

## বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের যোগদান

ভারতে বহুদিন থেকেই ভলিবল খেলা প্রচলিত থাকলেও ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোন ভলিবল দল ভারতের বাইরে কোন খেলায় যোগদান করেনি।



১৯৫২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের মার্চ-পাষ্টের দৃশ্য

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ভলিবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া গঠিত হবার পর ঐ সময়েই এই ফেডারেশন 'আন্তর্জাতিক ভলিবল ফেডারেশন'-এর সভ্য হবার জন্যে আবেদন করেন। আন্তর্জাতিক ভলিবল ফেডারেশন ভারতকে সভ্য

তখন রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা তাদের বাধা দিতে চেষ্টা করে। এই বাধা দেওয়ার কালে অনেক সময় দৈহিক শক্তি-প্রয়োগেরও প্রয়োজন হয়।

ডাঃ নেসমিথ ভাবলেন যে—যদি এমন কোন খেলা আবিষ্কার করা যায় যে-খেলায় আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরা নিজ দায়িত্বে বেশীক্ষণ বল রাখতে পারবেন না, তাহলে এই দৈহিক শক্তি-প্রয়োগের প্রশ্ন আর উঠবে না; এবং খেলাটি আরও আকর্ষণীয় হবে। খেলার গোলপোষ্ট সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে তাঁর মনে হয় যে, গোলপোষ্ট দুটি যদি খেলোয়াড়দের মাথা থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে থাকে এবং খেলোয়াড়দের যদি হাতে করে বল ছুঁড়ে ঐ গোলের মধ্যে ফেলতে হয় তাহলে বোধ হয় খেলার আকর্ষণ আরও বেড়ে যায় এবং খেলার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনাও কম থাকে। শুধু মাত্র খেলোয়াড়েরা একে অপরের কাছ থেকে বল কেড়ে নেবার সময় যাতে কোনরূপ আঘাত না করতে পারে সেজন্যে অবশ্য বিধিনিষেধ তৈরী করা দরকার। এইভাবেই নেসমিথ বাস্কেটবল খেলা আবিষ্কার করেন।

এই খেলায় আইনের অত্যন্ত কড়াকড়ি থাকায় অনেকে এই খেলাটিকে বুড়োদের খেলা বলে উল্লেখ করতে থাকেন। কিন্তু এই খেলার মধ্যে তীব্র গতিবেগ এবং ঐ গতিবেগের মধ্যে অব্যর্থ লক্ষের প্রয়োজনীয়তা থাকায় খেলাটি যুবকদের মধ্যেও সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নেসমিথ বাস্কেটবল খেলার যে আইন তৈরী করেন সেই আইন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এই আইনের কিছু সংশোধন করা হয়। **১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ঠিক হয় যে প্রতি দলে ৫ জনের বেশী খেলোয়াড় যোগ দিতে পারবে না।**

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ থেকে বাস্কেটবল খেলায় **পেশাদারী প্রথার** প্রচলন হয়।

ক্রমশঃ মহিলারা এই খেলা দেখতে দেখতে এত বেশী উৎসাহী হয়ে পড়েন যে, ১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দ থেকে মহিলারা নিজেদের মধ্যেই খেলা স্কুরু করে দেন। মহিলাদের মধ্যে এই খেলা দ্রুত প্রচারিত হওয়ায় মহিলাদের অনেকগুলি বাস্কেট-বল ক্লাবের স্থষ্টি হয় এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ থেকে আমেরিকার এমেচার এ্যাথলেটিক ইউনিয়ন **মহিলাদের বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার** ব্যবস্থা করেন।

**১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়।** ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ থেকে **অলিম্পিকে 'বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা'কে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে **ইণ্টারন্যাশন্যাল এমেচার বাস্কেটবল ফেডারেশন** অর্থাৎ বাস্কেটবলের আন্তর্জাতিক কমিটি গঠিত হয়।

## বাঙ্গলাদেশে বাস্কেটবল খেলার প্রচলন ও প্রচার

বাঙ্গলাদেশে ওয়াই. এম. সি. এ.-র চেষ্টায় বাস্কেটবল খেলা প্রচলিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ওয়াই. এম. সি. এ. কলেজ শাখার ফিজিক্যাল ডাইরেক্টার ডাঃ জন হেনরী গ্রে বাঙ্গলাদেশে এই খেলার প্রচলন করেন।

বাঙ্গলাদেশে স্কুল এবং কলেজের ছাত্রদের মধ্যেই প্রথম বাস্কেটবল খেলা প্রচলিত হয় এবং সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা বাস্কেটবল খেলায় বিশেষ উৎসাহী হয়ে পড়ে। দক্ষিণ কলকাতায় 'বয়েজ ট্রেনিং এসোসিয়েশন' নামেও একটি বাস্কেটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ বিভিন্ন বাস্কেটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে 'গ্রে চ্যালেঞ্জ শীল্ড' নামে বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এস. কে. মুখার্জ্জী এই এসোসিয়েশন-এর প্রথম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশন প্রাদেশিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেন।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা বাস্কেটবল দল 'ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন'-পরিচালিত আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করে।

১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে বাস্কেটবল খেলা বাঙ্গলাদেশের মধ্যে বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৪৪টি বাস্কেটবল ক্লাব 'বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশন'-পরিচালিত প্রাদেশিক বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

ক্লাবের সংখ্যা বেশী হওয়ায় একটি মাত্র বিভাগে বাস্কেটবল পরিচালনা করার অসুবিধা হতে থাকায় ১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে সিনিয়ার, ইণ্টারমিডিয়েট এবং জুনিয়ার নামে তিনটি বিভাগে ভাগ করে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় না। দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত অকর্ম্মণ্য থাকায় বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশনও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। ফলে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশনকে 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশন' নামে পুনর্জ্জীবিত করা হয়।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে 'বাস্কেটবল ফেডারেশনে অফ ইণ্ডিয়া' গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে

'ওয়েষ্ট বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশন' বাস্কেটবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ওয়েষ্ট বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশন ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে বাঙ্গলাদেশের বাস্কেটবল খেলা পরিচালনার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে এই এসোসিয়েশন ময়দানে নিজেদের মাঠ তৈরী করার অনুমতি পাওয়ায় এই বছরেই ৮ই থেকে ১২ই ডিসেম্বর এসোসিয়েশনের মাঠে জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

## *বাস্কেটবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া*

১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে বাস্কেটবল খেলার কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ছিল না। ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন বাস্কেটবল খেলার পরিচালনা করতেন।

ক্রমশঃ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাস্কেটবল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাস্কেটবলের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে বিভিন্ন রাজ্যের বাস্কেটবল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে 'বাস্কেটবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া' গঠন করেন। বাঙ্গলার এন. আমেদের আন্তরিক উৎসাহ ও চেষ্টাতেই বাস্কেটবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। মাদ্রাজ ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ সি. সি. এব্রাহাম এই ফেডারেশনের প্রথম সভাপতি এবং এইচ. বি. এস. রিচি সম্পাদক হিসাবে নির্ব্বাচিত হন।

এই সভাতেই বাস্কেটবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার প্রয়োজনীয় আইন তৈরী হয় এবং প্রতি একবছর অন্তর নূতন কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত করা হবে বলে আইন প্রচলিত হয়।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয় অলিম্পিক গেমস্-এর সঙ্গে সঙ্গে এবং ভারতীয় অলিম্পিক কমিটির পরিচালনায় আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে বাস্কেটবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া এই আন্তঃ-প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ফেডারেশনের সভায় স্থির হয় যে, এই আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা 'জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা' নামে প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হবে। ফলে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রতিবছর জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা 'বাস্কেটবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া'র পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা, বোম্বাই, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, মাদ্রাজ,

হায়দ্রাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, দিল্লী, রাজপুতানা, পাঞ্জাব, পেপসু, উত্তর-প্রদেশ এবং বিহার 'বাস্কেটবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া'র অন্তর্ভুক্ত হয়।

পুরুষদের জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় যে কাপটি বিজয়ী দলকে উপহার দেওয়া হয়, ঐ কাপটির নাম 'দি এডওয়ার্ড উইলিয়ম টড্ মেমোরিয়াল ট্রফি'। হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্‌ট বাস্কেটবল দলে উইলিয়ম টড্ একজন খ্যাতিমান খেলোয়াড় ছিলেন। বিমান দুর্ঘটনায় অকস্মাৎ টড্ মারা যাওয়ায় তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই কাপটির নামকরণ করা হয়।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ থেকে বাস্কেটবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার পরিচালনায় মহিলাদের জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা সুরু হয়। মহিলাদের জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় যে কাপটি দেওয়া হয়, উহাকে 'প্রিন্স বাসালত ঝা ট্রফি' বলে। হায়দ্রাবাদের প্রিন্স বাসালত এই কাপটি উপহার দেন বলেই তাঁর নাম অনুযায়ী এই কাপটির নামকরণ হয়। বাঙ্গলা মহিলা বাস্কেটবল দল প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার গৌরব লাভ করে। ১৯৫৪ সালে কলকাতায় জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সময় পশ্চিমবঙ্গ বাস্কেটবল এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী 'আন্দামান কাপ' নামে একটি সুদৃশ্য কাপ উপহার দেন। 'লুসার্স টুর্ণামেণ্ট' অর্থাৎ পরাজিত দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দল এই কাপটি লাভ করবে বলে স্থির হয়।

## বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশন

ওয়াই. এম. সি. এ. শুধু মাত্র বাঙ্গলাদেশে বাস্কেটবল খেলার প্রচলন করেই ক্ষান্ত হননি, বাস্কেটবল খেলা যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে ক্রমশঃই উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে সেজন্যে ওয়াই. এম. সি. এ. সকল সময়েই চেষ্টা করেছেন। ওয়াই. এম. সি. এ.-র চেষ্টাতেই বাঙ্গলাদেশে বাস্কেটবল এসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ২৩শে আগষ্ট মঙ্গলবার বিকাল ৬-৩০ মিনিটে ৮৬ নং কলেজ স্ট্রীটে কলকাতার সকল ওয়াই. এম. সি. এ. শাখাগুলির ফিজিক্যাল ডাইরেক্টার এস. কে. মুখার্জ্জী বাঙ্গলাদেশে বাস্কেটবল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বিভিন্ন বাস্কেটবল ক্লাবের প্রতিনিধিদের এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় নিম্নলিখিত ক্লাবগুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত হন :—

ওয়াই. এম. সি. এ. কলেজ ব্রাঞ্চ, মিত্র ইনষ্টিটিউশন (ভবানীপুর), বয়েজ

ট্রেনিং এসোসিয়েশন, মাড়োয়াড়ী ক্লাব, ষ্টুডেণ্ট প্লে গ্রাউণ্ড, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, ওয়াই. এম. সি. এ. বয়েজ ব্রাঞ্চ, সংস্কৃত কলেজ, গিরিশ মেমোরিয়াল টুর্ণামেণ্ট, সেণ্ট পলস্ কলেজ, ওয়াই. এম সি. এ. কলেজ হষ্টেল, ওয়াই. এম. সি. এ. ওল্ড বয়েজ ক্লাব, ওয়াই. এম. সি. এ. ওয়েলিংটন ব্রাঞ্চ, ওয়াই. এম. সি. এ. বয়েজ হষ্টেল, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক প্লে গ্রাউণ্ড, ওয়াই. এম. সি. এ. বাস্কেটবল লীগ কমিটি, ওয়েডেল কাপ টুর্ণামেণ্ট কমিটি এবং ওয়াই. এম. সি. এ. ফিজিক্যাল এডুকেশন কমিটি।

এই সভাতেই 'বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশন'-এর সৃষ্টি হয়।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ৭ই সেপ্টেম্বর ৮৬নং কলেজ স্ট্রীটে পরবর্ত্তী সভায় বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশনের প্রয়োজনীয় আইন গঠন করা হয়। এই সভাতেই স্যার আর. এন. মুখার্জ্জী সভাপতি, এইচ. ই. ষ্টেপেলটন সহ-সভাপতি এবং এস. কে. মুখার্জ্জী সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে নির্ব্বাচিত হন।

বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ থেকেই প্রাদেশিক বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা 'বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশন'-এর পরিচালনায় আরম্ভ হয়।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে এই এসোসিয়েশন 'বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন পরিচালিত প্রথম আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃত্বাধীনে বাঙ্গলা দল যোগদান করে। ১৯৫১ সাল থেকে এই এসোসিয়েশন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং স্থানীয় ক্লাবগুলি ছাড়া বর্দ্ধমান জেলা, ২৪-পরগণা জেলা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড, বাটা স্পোর্টস ক্লাব প্রভৃতি এসোসিয়েশনে যোগদান করে। ১৯৫৪ সালের ৮ই থেকে ১২ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বাস্কেটবল এসোসিয়েশনের সুষ্ঠু পরিচালনায় জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়।

## ভারতীয় বাস্কেটবল দলের বিদেশ সফর

ভারতে দীর্ঘদিন ধরে বাস্কেটবল খেলা প্রচলিত থাকলেও ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের আগে ভারতীয় বাস্কেটবল দল কখনো ভারতের বাইরে খেলতে যায়নি। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় বাস্কেটবল দল প্রথম পাকিস্থান সফরে যায়। ভারতীয় দলের জন্য নির্ব্বাচিত হন :—সি. ভি. বিজয়রাঘবন ( অধিনায়ক ), ডি. এস. ভরদ্বাজ ও এইচ. পাণ্ডুরঙ্গরাঁও ( মহীশূর ), নরীন্দর সিং ( পাঞ্জাব ),

ওমপ্রকাশ (পেপসু), কে. জি. এলেক্স (মাদ্রাজ—সহ-অধিনায়ক) নির্ম্মল সিং (দিল্লী), এস. এ. রউফ (হায়দ্রাবাদ), রামনাথ মুদগল (বাঙ্গলা), এস. ভি. আপিয়া, ভি. এন. লক্ষ্মীনারায়ণ (মহীশূর), জে. সাম, সি. আই. ভার্গিস (ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন)। আর. ডি. সয়াল ম্যানেজার—ডি. এন. রজানা—শিক্ষক, এবং বাস্কেটবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক এস. মেহের সিং যুগ্ম-ম্যানেজার হিসাবে দলের সঙ্গে যান।

১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে লাহোর, লয়ালপুর, রাওয়ালপিণ্ডি এবং শিয়ালকোটে ভারতীয় দলকে ৯টি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। ভারত ৫টি খেলায় জয়ী হয়, তিনটি খেলায় পরাজিত হয় এবং ১টি খেলা বৃষ্টির জন্য অসমাপ্ত থাকে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে ৩টি টেষ্ট খেলা হয়, তার মধ্যে ভারত প্রথম ও দ্বিতীয় টেষ্টে জয়লাভ করে এবং তৃতীয় টেষ্টে পরাজিত হয়।

## এশিয়ান গেমস্-এ ভারতীয় বাস্কেটবল দল

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান গেমস্-এ ভারতীয় বাস্কেটবল দল যোগদান করে। ভারত ছাড়াও এই প্রতিযোগিতায় ফিলিপাইনস্, জাপান, বার্মা এবং ইরাণ দল যোগদান করে। ভারতীয় দল গঠিত হয় নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে :—

রণবীরচন্দ্র চোপরা (অধিনায়ক), গুরুপ্রসাদ, ধরম পাল, অভিনাশ চন্দর, দেবীন্দর বেরী, রামপ্রকাশ (পাঞ্জাব); জে. কে. কাপুর, আর. ডি. শেঠি (রাজপুতানা); পাপিয়া, আপিয়া, লক্ষ্মীনারায়ণ (মহীশূর); ডি. দাশ, ভি. গ্যাঞ্জার (বাঙ্গলা); রামস্বামী (বোম্বাই), জে. বি. চলাপ্পা (ইউ. পি.) এবং বলদেবপ্রকাশ সিং (দিল্লী)।

লীগ প্রথায় এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফিলিপাইনস্ প্রথম, জাপান দ্বিতীয়, ইরাণ তৃতীয় ও ভারত চতুর্থ স্থান অধিকার করে।



# সাঁতার

## *সাঁতারের জন্ম ও বিস্তার*

কোন্ দেশের কোন্ মানুষ যে কবে, কোথায় প্রথম সাঁতার দিয়েছিল একথা আজ পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিক বলতে পারেন নি। শুধু এইটুকুই তাঁরা বলেছেন যে, **মানুষ পশুদের সাঁতার দেওয়া দেখে সাঁতার দিতে শিখেছিল।**

মানুষ প্রথম যখন সাঁতার দেওয়া শিখলো তখন তারা সাঁতার দিতো কুকুরের মত। হাত ও পা অনবরত জলের ভেতর নেড়ে কোনরকমে তারা নিজের দেহটাকে জলের ওপর ভাসিয়ে রাখতো। এইভাবে সাঁতার দেবার ফলে বেশীদূর একসঙ্গে সাঁতরে যাওয়া সম্ভব হতো না।

বর্ত্তমানে যে উন্নত ধরণের সাঁতার দেখতে পাওয়া যায়, এই ধরণের সাঁতার প্রথম সুরু করেন ইংরেজরা। **সুইমিং** কথাটি ইংরেজী **সুইমিন** থেকে উৎপত্তি। ইংরেজ সাঁতারুরা প্রথমে 'ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক' বা বুক-সাঁতার এবং 'সাইড

ষ্ট্রোক' বা কাত্ হয়ে সাঁতার দেওয়া শিক্ষা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই সাঁতারকে ইংরেজরা খেলাধুলার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেন। অবশ্য এর বহু আগে থেকেই ইংরেজদের মধ্যে সাঁতার প্রচলিত ছিল।

ভারতে এই সময়ে সাঁতার দেবার কৌশল সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তাতে দেখা যায় যে, ভারতীয় সাঁতারুরা খুব তাড়াতাড়ি জলের ভেতর হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার দিতে অভ্যস্ত ছিলেন।

ইংরেজী সাঁতারের বই থেকে দেখা যায় যে, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে **প্রথম প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার** অনুষ্ঠিত হয় লণ্ডনে। এই সময়ে লণ্ডন সহরে সাঁতার দেবার জন্যে ৬টি 'সুইমিং পুল' ছিল এবং প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারগুলি ইংলণ্ডের 'ন্যাশন্যাল সুইমিং সোসাইটি'র পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু ইংলণ্ডে যে কবে 'সুইমিং পুল' প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না।



ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব সাঁতার দিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হচ্ছেন। পরিশ্রান্ত ম্যাথু ওয়েবকে পানীয়ের বোতল নিতে দেখা যাচ্ছে।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারী লণ্ডনে কিংস ক্রসের 'জার্মান জিমনাসিয়ামে' এসোসিয়েটেড সুইমিং ক্লাবের পরিচালনায় বিভিন্ন ক্লাবের সাঁতারুরা একটি প্রতিযোগিতায় মিলিত হন। এই ইতিহাস থেকে এই কথাই মনে হয় যে, তখন ইংলণ্ডে 'এসোসিয়েটেড সুইমিং ক্লাব' নামে একটি সাঁতারের এসোসিয়েশন

গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই এসোসিয়েশন যে কবে এবং কিভাবে জন্মলাভ করেছিল সে সম্বন্ধে কোন ইতিহাস জানা যায় না।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে **দি এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন অফ গ্রেটবৃটেন** প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩০০-এর বেশী ক্লাব এই এসোসিয়েশনের সভ্য ছিল।

দূর পাল্লার সাঁতার হিসেবে ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ২৪শে ও ২৫শে আগষ্ট বুক-সাঁতার দিয়ে **প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হন।** এই সাঁতার সুরু হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের ডোভার থেকে ফ্রান্সের কেপ গ্রিজ নেজ পর্য্যন্ত এবং এর দূরত্ব ছিল ১৯ মাইল। ক্যাপ্টেন ওয়েব ২১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ক্রমাগত সাঁতার দিয়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন।

ভারতে প্রথম উন্নত ধরণের সাঁতার আরম্ভ হয় বোম্বাইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। ভারতে প্রথম সুইমিং পুলও প্রতিষ্ঠিত হয় বোম্বাইতে।

## *বাঙ্গলাদেশে সাঁতারের প্রচার ও প্রতিষ্ঠান গঠন*

সাঁতার বাঙ্গলাদেশের জনসাধারণের নিকট বিশেষভাবেই প্রিয়। বাঙ্গলার অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল ও পুষ্করিণী সাঁতারের ওপর স্বাভাবিক আকর্ষণ চিরদিনই বাড়িয়ে এসেছে। বিশেষ করে পূর্ব্ববঙ্গের লোকেদের কাছে সাঁতার না-জানা যেন একটা অপরাধের বিষয়। সাঁতার ছিল তাদের স্নানের অঙ্গ। কিন্তু সেই সাঁতার কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেওয়া হতো না। কোন এসোসিয়েশন বা ক্লাব মারফত নিয়মিত কোন সাঁতার-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও তখন কিছু ছিল না।

আজ বাঙ্গলাদেশে সাঁতারের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা, কিন্তু ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের আগে এই কলকাতাতে সাঁতার-জানা লোকের সংখ্যা বোধহয় হাতে গুণে বলা যেতো। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলকাতায় কোন সাঁতার দেবার পুকুর বা ক্লাব ছিল না, এমন কি কর্পোরেশনের অনেক পুকুরে সাধারণকে স্নান করতে দেওয়া হতো না। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এক শোচনীয় দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে কলকাতার জনসাধারণ বুঝতে পারলো যে সাঁতার না জানা থাকলে যে-কোন সময়ে মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারে।

দুর্ঘটনাটি এই যে, ওয়াই. এম. সি. এ.-র একদল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর বোটানিক্যাল গার্ডেনে বনভোজন করতে যায়। বনভোজন শেষ করে দিনের শেষে নৌকায় নদী পার হয়ে ফিরবার মুখে হঠাৎ ঝড় ওঠায়

নৌকাটি উল্টে যায়। নৌকার মধ্যে যে সব ছাত্র ছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই সাঁতার না জানায় মারা যায়।

এই শোচনীয় দুর্ঘটনার পর কলকাতার কিছু কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি সাঁতার শেখার ব্যবস্থা করার জন্য উৎসাহী হয়ে পড়েন। এই সব উৎসাহী লোকেদের মধ্যে রায়বাহাদুর হরিধন দত্ত, তুলসীচরণ রায় এবং তখনকার কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এস. এল. ম্যাডক অন্যতম ছিলেন। এঁদের চেষ্টাতেই কলেজ স্কোয়ারে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম সুইমিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশন থেকেও কলেজ স্কোয়ারে সাঁতার দেবার প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়া যায়।

কর্পোরেশন বিভিন্ন পুকুরগুলিতে সাঁতার দেবার অনুমতি দেওয়ায় কয়েকটি সাঁতারের ক্লাবের সৃষ্টি হয়। এইসব ক্লাবকে পরিচালনা করবার জন্যে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা সুইমিং স্পোর্টস এসোসিয়েশন' নামে একটি এসোসিয়েশন গঠিত হয়। আহিরিটোলা, কলেজ স্কোয়ার, বাগবাজার এবং মিলিটারী দল এই এসোসিয়েশনের সভ্য ছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ক্যালকাটা সুইমিং স্পোর্টস এসোসিয়েশনের পরিচালনায় বিভিন্ন সাঁতার প্রতিযোগিতা সুরু হয়।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম আন্তঃপ্রাদেশিক সাঁতার প্রতিযোগিতা সুরু হয় কলকাতার ওয়েলেসলি স্কোয়ারে। বাঙ্গলার সাঁতারুরা সকল বিষয়ে সাফল্য লাভ ক'রে সাঁতারের ওপর জনসাধারণের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তোলেন।

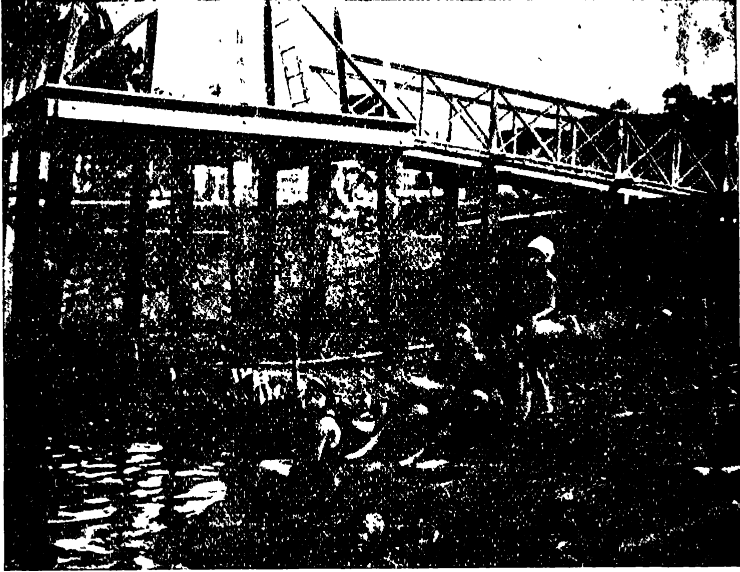
১৯২২ খৃষ্টাব্দ থেকে গঙ্গায় দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা সুরু করে আহিরিটোলা ক্লাব। ৬ মাইল প্রতিযোগিতা থেকে সুরু করে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে (বর্ত্তমানের আজাদ হিন্দ্ বাগে) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস 'ন্যাশন্যাল সুইমিং স্পোর্টস এসোসিয়েশন'-এর উদ্বোধন করেন। এই এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি ছিলেন শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এই ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশন বাঙ্গলাদেশে মহিলাদের প্রথম সাঁতার শেখবার ব্যবস্থা করেন।

মহিলাদের সাঁতারের বিভাগ ছাড়াও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দেই অনভিজ্ঞ ও শিশুদের সাঁতার শেখাবার জন্যে ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশন 'সেফ্টি এনক্লোজার' অর্থাৎ অল্পজলযুক্ত নিরাপদে সাঁতার শেখবার জায়গার ব্যবস্থা করেন।

এ ছাড়াও আজ মিটারে যে সাঁতার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা চালু আছে, এই মিটারে সাঁতার প্রতিযোগিতা, ভারতে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশনের সভ্য ডাঃ এস. কে. সরকার। আজাদ হিন্দ্ বাগে



অনভিজ্ঞ ও ছোট শিশুদের সাঁতার শেখবার জন্যে 'সেফটি এন্‌ক্লোজারের' প্রথম প্রবর্ত্তন করেন ন্যাশন্যাল সুইমিং ক্লাব। ছোট শিশুদের নির্ভয়ে জলে নামতে দেখা যাচ্ছে।

৫০'০ মিটার লম্বা এবং ১১'৭ মিটার চওড়া ও প্রত্যেক সাঁতারুর সাঁতারের জন্য ১'৮ মিটার চওড়া লেন-এর প্রবর্ত্তন করেন ডাঃ এস. কে. সরকার ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে।

ক্রমশঃই সাঁতারের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা লোকে বুঝতে থাকে এবং বিভিন্ন জেলায় সুইমিং এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এই সব বিভিন্ন জেলা-এসোসিয়েশনগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের পরিচালনার মধ্যে আনার জন্যে ক্যালকাটা সুইমিং এসোসিয়েশনের নাম পরিবর্ত্তন করে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল সুইমিং এসোসিয়েশন' রাখা হয়।

হরিধন দত্ত এই এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি এবং জে. এন. দাশগুপ্ত প্রথম সম্পাদক হিসাবে নির্ব্বাচিত হন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন-ই বাঙ্গলাদেশে

সাঁতারের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পরিচালনা করতেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল সুইমিং এসোসিয়েশন' বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কাছ থেকে বাঙ্গলা-দেশের সকল সাঁতার প্রতিযোগিতা ও পরিচালনার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন।



১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ এস. কে. সরকার প্রবর্ত্তিত সাঁতারের লেনের ছবি।

## সুইমিং ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া

সুইমিং ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া বর্ত্তমানে ভারতীয় সাঁতার প্রতিষ্ঠানগুলির সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে সুইমিং ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার সৃষ্টি হয়। এই ফেডারেশন গঠনের পেছনে এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে সাঁতারকে ভারতীয় অলিম্পিক গেমস্-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনই সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে সাঁতার প্রতিযোগিতা ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয়

অলিম্পিক এসোসিয়েশনকে আন্তর্জাতিক সুইমিং ফেডারেশন—যাকে 'ফেডারেশন ইণ্টারন্যাশন্যালি ডি ন্যাটেসান এমেচার' এবং আরও ছোট করে যাকে বলা হয় 'এফ. আই. এন. এ.' বা 'ফি-না'—তার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে 'ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন' এফ. আই. এন. এ.-র প্রয়োজনীয় চাঁদা না দেওয়ায় সভ্য থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশন এফ. আই. এন. এ.-র নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করে এফ. আই. এন. এ.-র কাছ থেকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার সকল অধিকার দখল করেন। ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশনকে এফ. আই. এন. এ. সভ্য হিসাবে গ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশনকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। এই দুইটি ভাগের একটিকে বলা হতো 'ফেডারেল সেক্সান' ও অপরটিকে বলা হতো 'ক্লাব সেক্সান'। ফেডারেল সেক্সানে ভারতের সাঁতার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় এবং ক্লাব সেক্সানে নিজেদের ক্লাবের উন্নতি ও প্রসারের চেষ্টা করা হতে থাকে।

এদিকে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনও ভারতীয় সাঁতার পরিচালনার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাবী করতে থাকেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের এ বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করবার কোন অধিকারই থাকে না।

ফলে ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশন এবং ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব নিয়ে ক্রমশঃই তিক্ততার সৃষ্টি হতে থাকে। এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্যে এবং উভয় এসোসিয়েশনের মধ্যে একটা মীমাংসায় উপনীত হবার জন্যে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মে কলিকাতায় ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশন প্যাভেলিয়নে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় অধিকাংশ বিষয়ে সকলে একমত হলেও সম্পূর্ণ মীমাংসা না হওয়ায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ২৩শে অক্টোবর দিল্লীতে পুনরায় আর একটি সভা আহ্বান করা হয়। পাতিয়ালার রাজা বীরেন্দ্র সিংজী এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। উপস্থিত অন্যান্য সভ্যেরা ছিলেন—এন. আমেদ ( বাঙ্গলা ), এস. কে. মুখার্জ্জী ( বোম্বাই ), মেজর এস্. ই. উইলসন ( আর্ম্মি স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ড ), নবাব হোসেন ( ইউ. পি. ), বি. এন. কাগল ( দিল্লী ), এস. বি. হামিদুদ্দিন ( দিল্লী ) এবং মইনুল হক ( বিহার ও ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন )।

এই সভাতেই ইণ্ডিয়ান সুইমিং ফেডারেশনের সৃষ্টি হয়। ন্যাশন্যাল সুইমিং

এসোসিয়েশনের সভাপতি এন. এফ. বারওয়েল এই ফেডারেশনের সভাপতি এবং জে. এন. দাসগুপ্ত সম্পাদক হিসাবে নির্ব্বাচিত হন।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দ থেকে ইণ্ডিয়ান সুইমিং ফেডারেশনের পরিচালনাতেই আন্তঃ-প্রাদেশিক প্রতিযোগিতা সুরু হয় এবং প্রথম বছরের প্রতিযোগিতা কলিকাতায় কলেজ স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় সাঁতারু দল পাঠাবার সময়ে আবার গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশন ভারতীয় সাঁতারু দল নির্ব্বাচনের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দাবী করেন যে, ভারতীয় সাঁতারু দল নির্ব্বাচনের একমাত্র অধিকারী তাঁরাই। কারণ তখনও ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশন এফ. আই. এন. এ.-র সভ্য।

যাই হোক ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ইণ্ডিয়ান সুইমিং ফেডারেশন এবং ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পুনরায় আর একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় 'সুইমিং ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া'। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারী আইন অনুযায়ী লিখিত-পড়িত ভাবে এই ফেডারেশন জন্মলাভ করে।

ইণ্ডিয়ান সুইমিং ফেডারেশন নামে যে প্রতিষ্ঠানটি ছিল সেই প্রতিষ্ঠানকে তুলে দেওয়া হয় এবং 'ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশন' এফ. আই. এন. এ.-র সভ্যের অধিকার সুইমিং ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার নামে পরিবর্ত্তন করে দেন।

## *অলিম্পিকে ভারতীয় সাঁতারু দল*

অলিম্পিকের সাঁতার প্রতিযোগিতায় ভারত আজ পর্য্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখাতে পারেনি। আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে ভারতীয় সাঁতারুদের মান অনেক নিম্নস্তরের, একথা বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফলের মধ্য দিয়ে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তবুও অভিজ্ঞতা লাভ করে ভারতীয় সাঁতারু দলের মান একদিন উন্নত হবে এই আশায় ভারতীয় সাঁতারু দলকে পাঠানো হয়েছে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ থেকে।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আম্ষ্টার্ডাম অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের সঙ্গে সঙ্গে ডি. ডি. মুলজীকে প্রথম ভারতীয় সাঁতারু হিসাবে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার জন্যে পাঠান হয়। কিন্তু মুলজীকে যাঁরা পাঠালেন তাঁদের একবারও একথা মনে এলো না যে, আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত না হলে কোন প্রতিযোগীকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে দেওয়া হয় না।

যাই হোক, মুলজী ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের অলিম্পিক দর্শক হয়েই দেখে এলেন। এদিকে ভারতে গুজব শোনা গেল মুলজী অসুস্থ—তাই তিনি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারেন নি। অলিম্পিক প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল দু'চার জন লোক প্রশ্ন করলেন, মুলজী অসুস্থ হয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে না পারেন, কিন্তু তাঁর নাম অলিম্পিক প্রতিযোগীদের তালিকায় ছাপা হলো না কেন? কর্ম্মকর্ত্তারা নীরব রইলেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ভুল আবার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেই কারণে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন সাঁতারের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'ফেডারেশন ইণ্টারন্যাশন্যালি ডি ন্যাটেসান এমেচার'—যাকে ইংরেজীতে ছোট করে বলা হয় 'এফ. আই. এন. এ.' বা 'ফি-না'—তার অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের লস এঞ্জেলস্ অলিম্পিকে নলিন মালিক প্রথম ভারতীয় সাঁতারু হিসেবে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিন অলিম্পিকের জন্যে অনেক রেষারেষির মধ্যে ভারতীয় দল গঠিত হলেও আর্থিক দুরবস্থার জন্যে কোন ভারতীয় সাঁতারুকেই এই অলিম্পিকে পাঠান হয় না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন অলিম্পিকের জন্যে এক বিরাট সাঁতারু দলকে নির্ব্বাচিত করা হয়। ব্যক্তিগত সাঁতার ছাড়াও দলগত প্রতি-যোগিতা হিসাবে রিলে এবং ওয়াটারপোলো খেলাতেও ভারতীয় দল যোগদান করে।

ভারতীয় সাঁতারু দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হন যামিনী দাশ। অন্যান্য বিভিন্ন ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার জন্যে নির্ব্বাচিত করা হয়ঃ—

শচীন নাগ—১০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রি-ষ্টাইল ও রিলে; কান্তি শা—১০০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোক ও রিলে; আইজ্যাক মনসুর—১০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল ও রিলে; দিলীপ মিত্র—১০০ মিটার ফ্রি-ষ্টাইল ও রিলে; প্রফুল্ল মল্লিক—২০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক; বিমল চন্দ্র—৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল; প্রতীপ মিত্র—১০০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোক।

ওয়াটারপোলো দলের জন্যে নির্ব্বাচিত করা হয়—যামিনী দাশ, গোরা শীল, শামু চ্যাটার্জ্জী, শচীন নাগ, জহর আহির, দুর্গাদাস, প্রফুল্ল মল্লিক, দিলীপ মিত্র, (বাঙ্গলা) কান্তি শা, আইজ্যাক মনসুর এবং ডি. মুরারজীকে (বোম্বাই)।

এ ছাড়াও ওয়াটারপোলো দলের জন্যে অতিরিক্ত সাঁতারু হিসাবে সুহাস

চ্যাটার্জ্জী, অজয় চ্যাটার্জ্জী এবং শম্ভুলাল বর্দ্ধনকেও দলের সঙ্গে নেওয়া হয়। বিমল ঘোষ ও পান্না আহির যুগ্ম-ম্যানেজার হিসাবে দলের সঙ্গে যান। সুশীল ঘোষ শিক্ষক হিসাবে এবং বীরেন পাল অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে নির্ব্বাচিত হলেও অনিবার্য্য কারণ বশতঃ দলের সঙ্গে যেতে পারেন নাই।

ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় কোন ভারতীয় সাঁতারুই এই অলিম্পিকে সাফল্য লাভ করতে পারেন নাই।

ওয়াটারপোলো খেলায় ভারতকে প্রথম 'সি' বিভাগে খেলতে হয়। অলিম্পিকের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বিভাগে তিনটি করে দল নেওয়া হয় এবং এই তিনটি দলের মধ্যে লীগ প্রথায় খেলা হবার পর প্রথম দুটি দলকে পরবর্ত্তী রাউণ্ডে খেলতে দেওয়া হয়।

ভারত হল্যাণ্ডের কাছে ১২-১ গোলে পরাজিত হয়ে এবং চিলির কাছে ৭-৪ গোলে জয়লাভ করে 'সি' বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় দ্বিতীয় রাউণ্ডে খেলবার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু দ্বিতীয় রাউণ্ডে ভারত হল্যাণ্ডের কাছে ১২-১ গোলে এবং স্পেনের কাছে ১১-১ গোলে পরাজিত হওয়ায় ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় গ্রহণ করে।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতীয় সাঁতারু দলকে পাঠান হয়। ভারতের দুইজন মহিলা সাঁতারুকেও মহিলাবিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচিত করা হয়।

ভারতীয় দলের জন্য নির্ব্বাচিত হন ঃ—

বীরেন বসাক (অধিনায়ক), শচীন নাগ, শম্ভু সাহা, কেদার সাহু, বিজয় বর্ম্মণ (ইনি এই সময়ে লণ্ডনে ছিলেন), মানু চ্যাটার্জ্জী এবং আরতি সাহা (বাঙ্গলা); আইজ্যাক মনসুর, কান্তি শা, ডেভিড সোফার, কে. ভারুচা, আর. চন্দানী, জে. নাইগমওয়ালা এবং ডলি নাজির (বোম্বাই)।

এই সাঁতারু দলের মধ্যে থেকে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার জন্য নির্ব্বাচিত করা হয়—

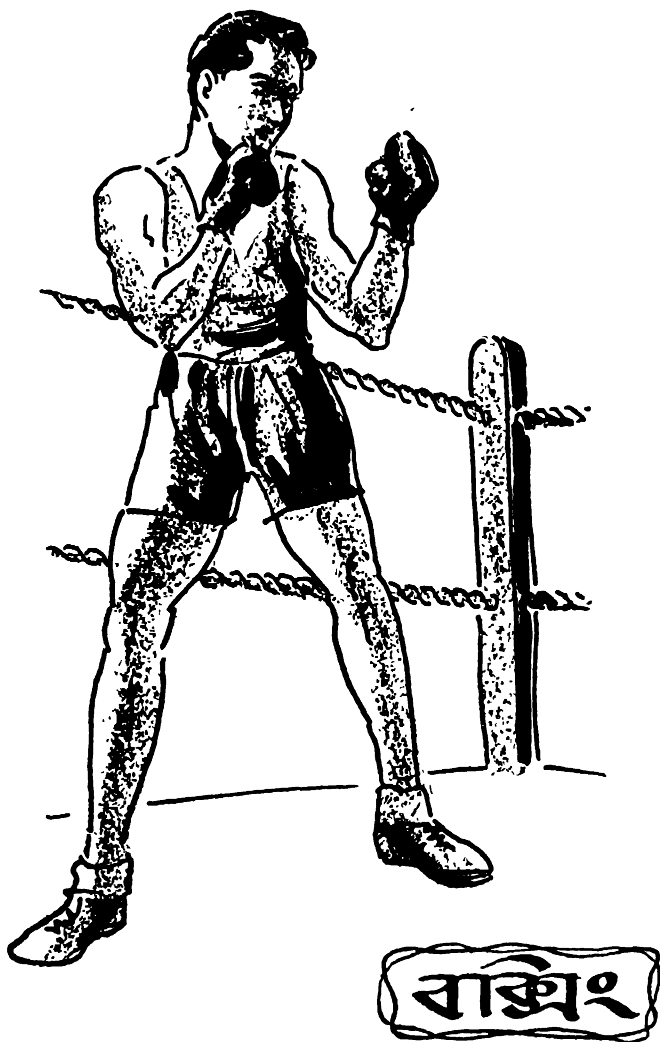
শচীন নাগ—১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল; বিজয় বর্ম্মণ—১০০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোক; আরতি সাহা—২০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক (মহিলা বিভাগ); আইজ্যাক মনসুর—১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল; কান্তি শা—১০০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোক; ডলি নাজির—১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল এবং ২০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক (মহিলা বিভাগ)। পান্না আহির ম্যানেজার হিসেবে এই দলের সঙ্গে যান।

ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় শচীন নাগ ভারতীয় দলের আশাস্থল ছিলেন। কিন্তু অলিম্পিক প্রতিযোগিতার আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ব্যক্তিগত প্রতি-যোগিতায় তিনি অবতীর্ণ হতে পারেন নাই। অন্য কোন বিভাগেই ভারতীয় কোন সাতারুই সাফল্য লাভ করতে পারেন নাই।

ওয়াটারপোলো খেলায় ভারতীয় দলকে ইটালী এবং ইউ. এস. এস. আর.-এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। ভারত ইটালীর নিকট ১৬-১ গোলে এবং ইউ. এস. এস. আর-এর নিকট ১২-০ গোলে পরাজয় বরণ করে।

ইটালী ও ইউ. এস. এস. আর.-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় ওয়াটারপোলো দল গঠিত হয়েছিল নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকেঃ— বীরেন বসাক, আইজ্যাক মনসুর, শচীন নাগ, শম্ভু সাহা, কেদার সাহু, কান্তি শা, ডেভিড সোফার, জে. নাইগমওয়ালা, বিজয় বর্ম্মণ এবং আর. চন্দানী।

অলিম্পিক ওয়াটারপোলো ছাড়াও ভারতীয় দল আরও ৫টি প্রীতি ওয়াটার-পোলো খেলায় অবতীর্ণ হয়। এই ৫টি খেলার মধ্যে ভারত ২টি খেলায় জয়ী হয়, ২টি খেলায় পরাজিত হয় এবং ১টি খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।



# বক্সিং

## বক্সিং-এর জন্ম ও বিস্তার

মুষ্টিযুদ্ধ বা বক্সিং যে পৃথিবীতে কবে থেকে সুরু হয়েছিল, সে কথা সঠিক বলা সম্ভব নয়। আজও এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। শুধু এইটুকুই বলা চলে, বর্ত্তমানে পৃথিবীতে বিভিন্নরূপ খেলাধুলার মধ্যে বক্সিং বা মুষ্টিযুদ্ধ বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম।

ঘুসাঘুসি করবার কৌশল বা মুষ্টিযুদ্ধকে ইংরেজীতে **পিউজিলিজম্** বলা হয়। ল্যাটিন শব্দ 'পিউজিল' থেকে এই শব্দটির উৎপত্তি। কোন কোন ঐতিহাসিক

সেই কারণে মনে করেন, প্রাচীন রোম এবং গ্রীসের লোকেরা প্রথম মুষ্টিযুদ্ধ সুরু করেছিল।

খৃষ্টজন্মের ১৭৫০ বছর আগে মেসোপটেমিয়ায় কিছু কিছু লোকের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ প্রচলিত ছিল বলে এক শ্রেণীর লোক দাবী করেন। গ্রীসে খৃষ্টজন্মের ৯০০ বছর আগে মুষ্টিযুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়।

রোমদেশের রাজা এগাস-এর পুত্র থেসাস একরকমের মুষ্টিযুদ্ধ প্রচলিত করেন। এই মুষ্টিযুদ্ধে দুইজন মুষ্টিযোদ্ধা দুটো পাথরের ওপর মুখোমুখি হয়ে বসতো। এত কাছাকাছি তারা বসতো, যাতে একজনের নাক আর একজনের নাক স্পর্শ করে। উভয় মুষ্টিযোদ্ধার হাতে চামড়া জড়ানো থাকতো। মুষ্টিযুদ্ধ সুরু করবার নির্দ্দেশ পেলেই একজন অপরজনকে আঘাত করতে থাকতো এবং যে-কোন একজন একেবারে মরে না যাওয়া পর্য্যন্ত এই মুষ্টিযুদ্ধের শেষ হতো না। কিন্তু একজন মুষ্টিযোদ্ধাকে একেবারে মেরে ফেলতে বেশ কিছুক্ষণ সময়ের প্রয়োজন হতো। রাজার ছেলে থেসাস একজন সাধারণ লোকের মৃত্যু দেখবার জন্য এত বেশী সময় ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করাকে সময় নষ্টের সামিল বলেই মনে করলেন। মুষ্টিযোদ্ধাদের মৃত্যু যাতে সহজেই হয়, সেই কারণে হাতে চামড়ার উপর উঁচু উঁচু ছুঁচালো পিতলের বা লোহার কাঁটা লাগিয়ে মুষ্টিযুদ্ধ সুরু হলো। পরপর দু'চারটি আঘাতেই যে-কোন মুষ্টিযোদ্ধা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগলো।

রোম থেকে গ্রীসে এই জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন হলো। এই সময়ে গ্রীসে থিয়াগিনী নামে এমন একজন বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন, যাঁকে সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এই থিয়াগিনীর ঘুসিতে এত জোর ছিল এবং এত দ্রুত তিনি বিপক্ষকে কোন সুযোগ না দিয়েই আঘাত করতে পারতেন যে, সকল মুষ্টিযোদ্ধাই তাঁর কাছে পরাজিত হতে বাধ্য হতো। থিয়াগিনী ১,৪২৫ জন মুষ্টিযোদ্ধাকে পরাজিত বা নিহত করেন।

ক্রমে রোমে এবং গ্রীসে পেশাদারী মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা প্রচলিত হলো। এই সব পেশাদারী মুষ্টিযোদ্ধাদের 'গ্লাডিয়েটার' বলা হতো। গ্লাডিয়েটারদের লড়াইতে জনসাধারণও অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করতো। যে সব মুষ্টিযোদ্ধারা জয়লাভ করতো তারা প্রচুর অর্থ, এমন কি রাজসম্মানও লাভ করতো। রোমের মুষ্টিযোদ্ধারা গ্রীসের মুষ্টিযোদ্ধাদের একের পর এক লড়াইতে পরাজিত করে এমন অবস্থা করে তুললো যে, গ্রীসে এমন কোন

মুষ্টিযোদ্ধা আর জীবিত থাকলো না, যে পুনরায় অন্য কোন লড়াইতে অবতীর্ণ হতে পারে। ফলে রোমের মুষ্টিযোদ্ধারা নিজেদের দেশের মুষ্টিযোদ্ধাদের সঙ্গেই লড়াই সুরু করে দিলো।

রোমের লোকেরা যখন নিজেদের দেশের লোকে মধ্যে বক্সিং সুরু করলো, তখন তারা নূতন নিয়মের প্রচলন করলো। এই নিয়মে একটা সীমাবদ্ধ বা নির্দ্দিষ্ট জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে মুষ্টিযোদ্ধাদের যুদ্ধ করতে হতো। অন্ধ কবি হোমারের লেখায় পাওয়া যায় যে, এই সময়ে বিভিন্ন মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরুষ-গাধা এবং যারা পরাজিত হতো তাদের দুই হ্যাণ্ডেল যুক্ত কাপ উপহার দেওয়া হতো।

থেসাস প্রবর্ত্তিত এই অমানুষিক ও বীভৎস মুষ্টিযুদ্ধ প্রায় ১০০ বছর পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ক্রমশঃ রোম এবং গ্রীসের পরবর্ত্তী রাজারা বুঝতে সুরু করলেন যে, এইভাবে দেশের শক্তিমান যুবকদের সামান্য রাজকীয় আনন্দ-লাভের জন্য মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। তাঁরা একে নরহত্যার সামিল বলে মনে করতে লাগলেন; ফলে খৃষ্টজন্মের সুরুতেই রোম এবং গ্রীসে এই জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে মুষ্টিযুদ্ধ ভীষণভাবে প্রচলিত হয়। প্রথম প্রথম ইংলণ্ডে যে-সব মুষ্টিযুদ্ধ হতো সেগুলি কোন বিশেষ নিয়মের মধ্যে হতো না। এই সময়ে ইংলণ্ডে ফিগ্ নামে খ্যাতিমান একজন মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন। এই ফিগ্ ১৫টি লড়াইয়ে পর পর জয়লাভ করবার পর ইংলণ্ডের কোন মুষ্টিযোদ্ধাই ফিগ্-এর সঙ্গে আর লড়তে রাজী না হওয়ার ফলে ফিগ্ বাধ্য হয়ে মুষ্টিযুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা দেওয়ার একটি স্কুল খুললেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে **ফিগ্ একাডেমী ফর বক্সিং** নামে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

পৃথিবীর মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা দেওয়ার স্কুল হিসাবে ফিগ্-এর স্কুলই সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলের নাম পরে 'ফিগ্স্ এ্যামপিথিয়েটার' হয়। লণ্ডনের টটেনহ্যাম কোর্টে এই এ্যামপিথিয়েটার অবস্থিত ছিল। ফিগ্-এর স্কুল থেকে বিভিন্ন ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করে নিজেরা আবার মুষ্টিযুদ্ধের স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। এইভাবে ১৭১৮-২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রায় ১২-১৪টি মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা দেওয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে দেখা যায়।

**এই ফিগ্-ই প্রথম মুষ্টিযুদ্ধের আইন তৈরী করেন।** ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফিগ্-এর আইন সমস্ত পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের পরে ব্রাউটন, ফিগ্-এর আইনের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে

ব্রাউটনের আইনকে আরও সংশোধন ও উন্নত করে **মার্কুইস্ অফ কুইনস্বেরী** আইন প্রচলিত হয়। এই আইনেই বর্ত্তমানে মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালিত হয়ে থাকে।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় মুষ্টিযুদ্ধের প্রচার হয়। বর্ত্তমানে আমেরিকাতেই মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন বোধ হয় সবথেকে বেশী।

## *ভারতে মুষ্টিযুদ্ধের প্রচার ও প্রতিষ্ঠান গঠন*

ভারতে মুষ্টিযুদ্ধ সুরু হয়েছিল ইংরেজরা এদেশে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু এই মুষ্টিযুদ্ধ উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি পর্য্যন্ত একমাত্র ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ভারতের এমেচার বা সৌখীন মুষ্টিযুদ্ধ সুরু করবার সবথেকে বেশী কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন রেলওয়েজ। বিভিন্ন রেলওয়েজ ইন্‌ষ্টিউট বক্সিং শিক্ষা এবং প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে মুষ্টিযুদ্ধকে ক্রমশঃই ভারতের মধ্যে প্রচার করেন। বিভিন্ন রেলওয়েজ ইন্‌ষ্টিটিউট-এর মধ্যে উত্তর-পশ্চিম রেলওয়েজের 'বার্ট ইন্‌ষ্টিটিউট' মুষ্টিযুদ্ধ শেখার প্রথম ব্যবস্থা করেন। বার্ট ইন্‌ষ্টিটিউট ছাড়া বি. এন্. রেলওয়েজের খড়গপুর শাখা এবং ই. আই. রেলওয়েজের জামসেদপুর শাখা মুষ্টিযুদ্ধ ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। জামসেদপুরের লরি কার এই সময়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন।

ক্রমশঃ মুষ্টিযুদ্ধ বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বোম্বাইতে পার্শী-ক্লাব মুষ্টিযুদ্ধে বিশেষ উৎসাহী হয়ে পড়েন।

প্রথম সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে সৌখীন মুষ্টিযোদ্ধাদের মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা সুরু করেন বার্ট ইন্‌ষ্টিটিউট। এই প্রতিযোগিতার নাম ছিল 'উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় বক্সিং প্রতিযোগিতা'।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের মুষ্টিযুদ্ধের সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান 'ইণ্ডিয়ান এমেচার বক্সিং ফেডারেশন' গঠিত হয় এবং ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে 'আন্তর্জাতিক বক্সিং ফেডারেশন'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। মেজর বেকার 'ইণ্ডিয়ান এমেচার বক্সিং ফেডারেশন'-এর প্রথম সভাপতি এবং এইচ. বি. পয়েন্টন সম্পাদক হিসেবে নির্ব্বাচিত হন।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দ থেকে ইণ্ডিয়ান এমেচার বক্সিং ফেডারেশন কর্ত্তৃক পরিচালিত জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য বক্সিং প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। এর আগে

ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন ভারতে মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা ও পরিচালনার সকল ব্যবস্থা করতেন।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধাদল অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

## বাংলাদেশে মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন ও প্রসার

বাঙ্গলাদেশে মুষ্টিযুদ্ধ সুরু করেন ইংরেজরা। ইংরেজদের কাছ থেকে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ প্রচারিত হয়।

বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে প্রকৃত মুষ্টিযুদ্ধ সুরু হয় ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। অবশ্য এর আগে জে. এন. ব্যানার্জ্জী বিলেত থেকে মুষ্টিযুদ্ধ শিখে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ প্রচারের কোন বিশেষ চেষ্টা করেন না।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বলরাম দে স্ট্রীটে যেখানে পুরানো মোহনবাগান ক্লাব ছিল, সেখানে বোসেদের বাড়ীতে শৈলেন বসু মাঝে মাঝে সৈন্যবিভাগের মুষ্টিযোদ্ধাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে মুষ্টিযুদ্ধের ব্যবস্থা করে বাঙ্গালী ছেলেদের উৎসাহিত করতেন। ইণ্টালীতে ও. এন. মুখার্জ্জীর বাড়ীতেও একটা মুষ্টিযুদ্ধের রিং ছিল এবং বেশীর ভাগ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেরা এখানে মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা করতেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মিণ্টন কিউব নামে একজন প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধার কাছে বলাই চ্যাটার্জ্জী, জে. কে. শীল, সন্তোষ দত্ত এবং বলাই মুখার্জ্জী বক্সিং শিখতে সুরু করেন। বলাই চ্যাটার্জ্জী এই সময়ে বাঙ্গালী মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে টমাস নামে একজন প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধাকে হারিয়ে বলাই চ্যাটার্জ্জীর নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। পরে তিনি ভারতের বিভিন্ন আর্মি, নেভি ও অন্যান্য মুষ্টিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে সুনাম অর্জ্জন করেন। বলাই চ্যাটার্জ্জী ছাড়া জে. কে. শীলও মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন।

এই সময়ে যে মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতাগুলি হতো, তাতে সৌখীন এবং পেশাদারী উভয়প্রকারের মুষ্টিযোদ্ধারাই যোগদান করতেন। পেশাদারী মুষ্টিযোদ্ধারা খালি গায়ে এবং সৌখীন মুষ্টিযোদ্ধারা গেঞ্জি গায়ে লড়তেন।

পি. এল. রায় এই সময়ে দীর্ঘদিন বিলেতে থাকার পর দেশে ফিরে আসেন। প্রথম বাঙ্গালী মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে তিনি ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের ব্যাণ্টাম ওয়েট বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব লাভ

করেছিলেন। পি. এল. রায় দেশে ফিরে নিজের বাড়ীতে একটা মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা দেওয়ার কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন মুষ্টিযোদ্ধাদের চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিয়ে আর্থিক সাহায্যেরও ব্যবস্থা করেন। ফলে মুষ্টিযুদ্ধ বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

বাঙ্গলাদেশে মুষ্টিযুদ্ধের রিং সৃষ্টি হওয়ার আগে সকল বড় বড় মুষ্টিযুদ্ধ হতো বিজু থিয়েটারে ( বর্ত্তমান গ্লোব ) এবং ওল্ড এম্পায়ার থিয়েটারে ( বর্ত্তমান রক্সি )। এই সকল মুষ্টিযুদ্ধ অবশ্য পেশাদারী মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। ফ্লেমিং এবং ফিশার নামে দুজন এ্যাংলোইণ্ডিয়ান এই সব মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতেন।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে পি. এল. রায় 'বেঙ্গল এমেচার বক্সিং এসোসিয়েশন ( লিমিটেড )' গঠন করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল বক্সিং এসোসিয়েশন' এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশন'-এর সৃষ্টি হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশন প্রাদেশিক মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা সুরু করেন।

মুষ্টিযুদ্ধের ভালো প্রথম রিং তৈরী হয় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচার ইন্‌ষ্টিটিউটে।

## *বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশন*

বর্ত্তমানে বাঙ্গালাদেশে বক্সিং পরিচালনার দায়িত্ব ও কর্ত্তৃত্ব বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশনের উপর ন্যস্ত। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে এই ফেডারেশনের সৃষ্টি হয়।

মুষ্টিযুদ্ধ বাঙ্গালাদেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকায় বিভিন্ন মুষ্টিযুদ্ধের ক্লাব সৃষ্টি হয়। এই সব বিভিন্ন ক্লাবকে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার মধ্যে আনার জন্যে ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে পি. এল. রায়ের চেষ্টাতে 'বেঙ্গল এমেচার বক্সিং এসোসিয়েশন ( লিমিটেড )' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। কিন্তু এই এসোসিয়েশন যে সব মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতেন, সেগুলিকে সৌখীন মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা বলা যায় না।

ফলে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল বক্সিং এসোসিয়েশন' নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডরেশন'-এর জন্ম হয়। এই ফেডারেশনের প্রথম সভাপতি হিসাবে ৺শৈলপতি চ্যাটার্জ্জী এবং রেক্স রিগ্যাল সম্পাদক হিসাবে নির্ব্বাচিত হন।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল বক্সিং এসোসিয়েশন' বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে সেন্ট জেভিয়ার্স থিয়েটারে প্রথম প্রাদেশিক মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়।



১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন অলিম্পিকে যোগদানকারী ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধাদল

## অলিম্পিকে ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধাদল

অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় প্রথম ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধাদল যোগদান করে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন অলিম্পিকে।

ভারতীয় দল গঠনের জন্যে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই মে প্রথম ট্রায়াল ফোর্ট উইলিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এই ট্রায়ালে ভারতীয় দল গঠিত হলেও, আইনগত ত্রুটী থাকায় ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন এই ট্রায়ালের ফলাফল গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ফলে ৫ই, ৬ই এবং ৭ই জুন ফোর্ট উইলিয়ামে দ্বিতীয় ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা হয় এবং এই ট্রায়ালের ফলাফলের উপর ভারতীয় দলের মুষ্টিযোদ্ধাদের নির্ব্বাচিত করা হয়। ভারতীয় দল গঠিত হয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে :—

বেবী এ্যারাটুন ( হেভি-ওয়েট—বাঙ্গালা ), ম্যাকজোয়াকিম ( লাইট হেভি-ওয়েট—বাঙ্গালা ), জনি নাটাল ( মিডিল-ওয়েট—বোম্বাই ), আর. ক্রানষ্টন ( ওয়েল্টার-ওয়েট—বাঙ্গালা ), জিনি রেমণ্ড ( লাইট-ওয়েট—বোম্বাই ), বি. বসু ( ফেদার-ওয়েট—বাঙ্গালা ), বব্‌লাল ( ব্যান্টম-ওয়েট—বাঙ্গালা ) এবং আর. ভট্টা ( ফ্লাই-ওয়েট—বাঙ্গলা )।

বেবী এ্যারাটুন ইরাণের লোক হওয়ায় এবং ইরাণ নিজের দেশের হয়ে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার জন্য এ্যারাটুনকে দাবী করায়, ভারতীয় দল থেকে এ্যারাটুনকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের অলিম্পিকে ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধারা খুব সাফল্যলাভ করতে না পারলেও আন্তর্জাতিক মুষ্টিযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ পেয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে পুনরায় ভারতীয় দল পাঠানো হয়। ভারতীয় দল নির্ব্বাচনের জন্য জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই জাতীয় প্রতিযোগিতার ফলাফলের উপর বেশী নজর রেখে ভারতীয় দল গঠন করা হয়। ভারতীয় দলের জন্যে নির্ব্বাচিত হন :—বি. বসু ( ফেদার-ওয়েট—বাঙ্গালা ), শক্তি মজুমদার ( ফ্লাই-ওয়েট—বাঙ্গালা ), রন নরিস্ ( ওয়েল্টার-ওয়েট—মধ্যপ্রদেশ ) এবং অস্কার ওয়ার্ড ( লাইট হেভি-ওয়েট—বাঙ্গলা )।

ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে রন নরিস্ এই অলিম্পিকে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। পর পর দুই রাউণ্ডে জয়লাভ করবার পর কোয়ার্টার ফাইন্যালে নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ভি. জরগিনসনের নিকট পরাজিত হওয়ায় ব্রোঞ্জ পদক লাভ করা থেকে বঞ্চিত হন। আন্তর্জাতিক বক্সিং ফেডারেশন রন নরিস্-এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উচ্চ আশা পোষণ করেন। ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধা দল বিদেশে সুনামের অধিকারী হন।

## *বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা*

বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা মুষ্টিযোদ্ধাদের দেহের ওজন অনুযায়ী ৮টি ভাগে ভাগ করে অনুষ্ঠিত হয়। এই ৮টি ভাগকে বলা হয় হেভি-ওয়েট, লাইট হেভি-ওয়েট, মিডিল-ওয়েট, ওয়েল্টার-ওয়েট, লাইট-ওয়েট, ফেদার-ওয়েট, ব্যাণ্টাম-ওয়েট এবং ফ্লাই-ওয়েট।

মার্কুইস অফ কুইনস্‌বেরী নিয়মে সকল বিভাগের প্রতিযোগিতাগুলি পরিচালিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় যে মুষ্টিযোদ্ধা যে বিভাগে বিজয়ী হন, তিনি সেই বিভাগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধার সম্মান লাভ করে থাকেন। বিভিন্ন বিভাগের প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নীচে দেওয়া হলো।

### হেভি-ওয়েট প্রতিযোগিতা

১৭৬ পাউণ্ডের বেশী দেহের ওজনের মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম হেভি-ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ৭ই সেপ্টেম্বর নিউ অরলিয়নস-এ। জেমস্‌ জে. করবেট এবং জন এল. সুলিভানের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। যদিও এটাকে প্রথম প্রতিযোগিতা বলা হয়, কিন্তু সুলিভান এই সময়ে করবেট থেকে অনেক উঁচুদরের মুষ্টিযোদ্ধা থাকায় সুলিভান রিং-এ প্রবেশ করা মাত্রই বিজয়ী বলে সাব্যস্ত হন। পরে যখন সুলিভান এবং করবেটে-এর মধ্যে লড়াই হয়, তখন করবেট ২১ রাউণ্ডের লড়াইতে সুলিভানকে নক্‌ আউটে পরাজিত করে বিশ্ববিজয়ী হওয়ার কৃতিত্ব লাভ করেন।

প্রথম প্রথম এই বিভাগের প্রতিযোগিতা নিয়মিত অনুষ্ঠিত না হলেও, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কেবলমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কয়েক বছর এই প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল।

### লাইট হেভি-ওয়েট প্রতিযোগিতা

এই বিভাগের মুষ্টিযোদ্ধাদের দেহের ওজন ১৬১ পাউণ্ড থেকে ১৭৬ পাউণ্ডের মধ্যে হয়।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ২৫শে নভেম্বর স্যানফ্রান্সিসকোতে জেমস্‌ ডব্লিউ. কফোর্থ বব ফিটজিমনস্‌ এবং জর্জ্জ গার্ডনারকে পরাজিত করে প্রথম লাইট হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়ানশিপ-এর গৌরব লাভ করেন। কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় কিছু কিছু লোক আপত্তি করায় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই জর্জ্জ রুক্‌ এবং জর্জ্জ গার্ডনারের

মধ্যে আর একটি লড়াই হয়। গার্ডনার ১২ রাউণ্ডে রুক্‌কে নক্ আউটে পরাজিত করে একই বছরে এই বিভাগে শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধার সম্মান লাভ করেন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের পর থেকে এই বিভাগের প্রতিযোগিতা প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

## মিডিল-ওয়েট প্রতিযোগিতা

এই বিভাগে কমপক্ষে ১৪৮ পাউণ্ড এবং বেশী হলে ১৬০ পাউণ্ডের মধ্যে মুষ্টিযোদ্ধাদের দেহের ওজন হওয়া চাই।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিডিল-ওয়েট বিভাগকে কোন আলাদা প্রতিযোগিতা বলে ধরা হতো না। কিন্তু এই বিভাগের দেহের ওজন অনুযায়ী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের আগেও কয়েকটি লড়াই হয়েছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৩ই এপ্রিল সানফ্রান্সিসকোতে এই বিভাগের প্রথম প্রতিযোগিতা হয় টম্ চ্যাণ্ডেলার এবং ডনি হ্যারিস্-এর মধ্যে। চ্যাণ্ডেলার ৩৩ রাউণ্ডে নক্ আউটে হ্যারিস্‌কে পরাজিত করে বিজয়ী হন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ, রুক্ চ্যাণ্ডেলারকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেন কিন্তু চ্যাণ্ডেলার এই আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় রুক্ নিজেকে বিশ্ববিজয়ী বলে ঘোষণা করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মাইক ডোনোভ্যান, রুক্‌কে পরাজিত করেন। ডোনোভ্যান ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বিভাগে বিশ্ববিজয়ী ছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ ফুলজেমস্ এই বিভাগের যে-কোন মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেন এবং এই বছরেই অর্থাৎ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিজয়ী হন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বিভাগের প্রতিযোগিতা নিয়মিত অনুষ্ঠিত না হলেও ১৯০৭ "থেকে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের পর থেকে প্রতিবছর এই বিভাগের প্রতিযোগিতা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

## ওয়েল্টার-ওয়েট প্রতিযোগিতা

এই বিভাগের মুষ্টিযোদ্ধাদের দেহের ওজন ১৩৭ পাউণ্ড থেকে ১৪৭ পাউণ্ডের মধ্যে হয়।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন ইংরেজ মুষ্টিযোদ্ধা নিজেদের ওয়েল্টার বিভাগের মুষ্টিযোদ্ধা বলে ঘোষণা করে পরস্পর প্রতিযোগিতা সুরু করেন। এই ওয়েল্টার কথাটির বিলেতে ঘোড়দৌড়ে প্রচলিত কথা থেকে উৎপত্তি।

প্যাডিংটন টম জোনস্ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সকল

প্রতিদ্বন্দ্বিদের পরাজিত করে এই বিভাগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রায় প্রতিবছর এই বিভাগের প্রতিযোগিতা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

## লাইট-ওয়েট প্রতিযোগিতা

এই বিভাগের মুষ্টিযোদ্ধাদের দেহের ওজন ১২৮ পাউণ্ড থেকে ১৩৬ পাউণ্ডেব মধ্যে হয়।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লাইট-ওয়েট বিভাগকে একটা ভিন্ন বিভাগ বলে গণ্য করা হতো না।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এ্যব্ হিকেন পিট্ ম্যাগুইরিকে পরাজিত করে এই বিভাগে প্রথম বিজয়ী হন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে এই বিভাগের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত না হলেও ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রায় প্রতিবছরই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

## ফেদার-ওয়েট প্রতিযোগিতা

এই বিভাগে মুষ্টিযোদ্ধাদের দেহের ওজন ১২০ পাউণ্ড থেকে ১২৭ পাউণ্ডের মধ্যে হয়।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আইক্ আয়ার নামে স্কটল্যাণ্ডের একজন মুষ্টিযোদ্ধা প্রথম এই বিভাগে বিজয়ী হন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে হ্যারি গিলমোর নামে একজন মুষ্টিযোদ্ধা আইক্ আয়ারকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেন, কিন্তু আইক্ লড়তে রাজী না হওয়ায় হ্যারি গিলমোর নিজেকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের পর থেকে এই বিভাগের প্রতিযোগিতা প্রায় প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

## ব্যাণ্টাম-ওয়েট প্রতিযোগিতা

এই বিভাগে মুষ্টিযোদ্ধাদের দেহের ওজন ১১৩ পাউণ্ড থেকে ১১৯ পাউণ্ডের মধ্যে হয়।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সবথেকে ছোট মাপের মুষ্টিযোদ্ধাদের 'ব্যাণ্টামস্' বা 'লিট্‌ল্ চিকেনস্' বলা হতো।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ মুষ্টিযোদ্ধা সাইমন্ ফিনিটি এবং আমেরিকার মুষ্টিযোদ্ধা

চার্লি লাইঞ্চ-এর মধ্যে প্রথম প্রতিযোগিতা হয়। লাইঞ্চ ৯৫ রাউণ্ড লড়ায়ের পর পরাজিত হন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে লাইঞ্চ ফিনিটিকে ৪৩ রাউণ্ড লড়ায়ের পর পরাজিত করে নিজেকে এই বিভাগের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রায় প্রতিবছরই এই বিভাগের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অবশ্য ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বিভাগে কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়নি।

## ফ্লাই-ওয়েট প্রতিযোগিতা

এই বিভাগের মুষ্টিযোদ্ধাদের দেহের ওজন ১১২ পাউণ্ডের মধ্যে হয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে ইংলণ্ডে এই বিভাগের প্রতিযোগিতা স্থরু হয়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল ইংলণ্ডের জিমি উইল্ডি, রোস্‌নারকে নক আউটে পরাজিত করে এই বিভাগে বিশ্ববিজয়ী হন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রায় প্রতিবছরই এই বিভাগের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

## *বিদেশী মুষ্টিযোদ্ধাদলের ভারত সফর*

**সিংহল দল**—১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ও ২৬শে আগষ্ট। সিংহল দলে ছিলেন এম. ভি. ওয়েলভিটিগোডা এবং আইভন বিভান।

**পাকিস্তান দল**—১৯৫২ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে। পাকিস্তান দলে ছিলেন খান মহম্মদ, সিড্ গ্রিবস্ এবং আনোয়ার পাশা।

**জাপান দল**—১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে। জাপান দলে ছিলেন মঞ্জো ইদেহারা, কিচিও মিয়াকি, টসিরো আউনুকি, হিরোউকি কাজি, টসিহিটো ইসিমারু এবং ইওচি স্থজুকি।

**পাকিস্তান দল**—১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে। পাকিস্তান দলে ছিলেন রহমৎ গুল, খান মহম্মদ, সিড্ গ্রিবস্ এবং মহম্মদ কাসিম।

**বার্ম্মা দল**—১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে। বার্ম্মা দলে ছিলেন আই কো, থেন মং, এল. মণ্টেন, ভি. জনসন, আর. এলিস ও মাউং মিণ্ট।




## কুস্তি বা মল্লযুদ্ধের জন্ম ও বিস্তার

পৃথিবীতে বর্ত্তমানে যতরকমের খেলাধুলা দেখা যায়, তার মধ্যে কুস্তি বা মল্লযুদ্ধ বোধ হয় সবথেকে প্রাচীন খেলা। বহুশত বছর আগে মানুষ যখন অসভ্য ছিল, যখন তারা বনে বাস করতো, তখন তাদের বিভিন্ন পশুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে অনেক সময় যুদ্ধ করতে হতো। তখনকার দিনে অস্ত্রপাতি বিশেষ ছিল না, ফলে অনেক সময় খালি হাতে তারা সেইসব পশুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতো। এইসব যুদ্ধকে একপ্রকারের মল্লযুদ্ধ বলা চলে।

একদিন বাঁচবার তাগিদে মানুষ যে কুস্তি বা মল্লযুদ্ধকে গ্রহণ করেছিল, আজ সেই বাঁচবার তাগিদ মিটে গেলেও আজকের মানুষও সেই কুস্তিকে ত্যাগ করেনি।

এই কুস্তি ঠিক কবে থেকে যে পৃথিবীতে সুরু হয়েছিল, সে কথা বলা শক্ত। এইটুকুই শুধু বলা চলে, পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি হবার পরেই কুস্তির সৃষ্টি হয়েছিল।

আজ বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিকেরা কুস্তির জন্মস্থান বলে বিভিন্ন দেশের নাম উল্লেখ করলেও ভারতেই এই কুস্তির প্রথম চর্চ্চা বা অনুশীলন হয়েছিল। রামায়ণ ও মহাভারতে এই কুস্তি বা মল্লযুদ্ধের কথা অনেক জায়গাতেই লেখা আছে। ভীম, ঘটোৎকচ, জরাসন্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, হনুমান, বালি এবং সুগ্রীব তখনকার দিনে বড় মল্লযোদ্ধা ছিলেন। ভারত থেকে রোমে এবং গ্রীসে কুস্তির প্রচার হয়েছিল।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে এক প্রত্নতত্ত্ববিদের দল মেসোপটেমিয়ায় ৫,০০০ বছর আগেকার এক পাথরে-খোদাই-করা কুস্তির ছবি আবিষ্কার করেন। বাগদাদের কাছে কায়াফজী মন্দির থেকে এই পাথরটি পাওয়া যায়।

গ্রীসে এর পরে কুস্তি ছড়িয়ে পড়ে এবং যারা ডিসকাস্ ছুঁড়তো তাদের গ্রীসের সবথেকে বড় এ্যাথলেট বলা হতো। ডিসকাস্ ছোঁড়ার পরই কুস্তিকে গ্রীসে স্থান দেওয়া হতো।

রোমের লোকেরা গ্রীস দখল করে নেবার পর কুস্তি রোমেও ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু গ্রীসে যে ধরণের কুস্তি হতো, রোমে ঠিক সে ধরণের কুস্তির প্রচলন হলো না। যে নিয়মে এখানে কুস্তি আরম্ভ হলো, একে একটু উন্নত ধরণের কুস্তি বলা চলে এবং একেই ইংরেজীতে 'গ্রীসো-রোমান ষ্টাইল' বলা হয়। আজও অলিম্পিকে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এই 'গ্রীসো-রোমান' নিয়মে কুস্তি হয়। এই নিয়মে কোনো কুস্তিগীর মাজার নিচে ধরতে পারে না।

ক্রমশঃ ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে কুস্তি জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে এই দুই দেশের মধ্যে অনেক কুস্তি প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। এর পর জাপানে কুস্তির চর্চ্চা আরম্ভ হয় এবং কুস্তিকে জাপানের জাতীয় খেলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ধীরে ধীরে এই কুস্তির উপকারিতা এবং আকর্ষণ বুঝতে সুরু করে। তার ফলে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আজ খোঁজ করলে খুব কম দেশই দেখা যাবে যেখানে কুস্তির চর্চ্চা হয় না।

## ভারতে কুস্তির প্রচলন ও প্রচার

পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই প্রথম মল্লযুদ্ধ বা কুস্তি সুরু হয়েছিল। সেই বহু প্রাচীনকালে, যাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা হয়, সেই সময় থেকেই কুস্তি ভারতের জনসাধারণের মধ্যে যে বিশেষভাবেই প্রচলিত ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ণে হনুমান, বালী, সুগ্রীব প্রভৃতি যে শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা

ছিলেন, এ কথা পরিষ্কারভাবেই লেখা আছে। মহাভারতেও 'শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, ভীম, ঘটোৎকচ, জরাসন্ধের নাম শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা হিসাবে লেখা আছে। রামায়ণ-মহাভারতের যুগের পরে শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা হিসাবে সারা পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করেছিলেন সোরাব এবং রুস্তম। এই রুস্তমের নাম অনুযায়ী পরবর্ত্তীকালে ভারতের শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধাকে **'রুস্তম-ই-হিন্দ'** উপাধি দেওয়া হতো।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই কুস্তির আখড়ার কথা শোনা যায়। যাই হোক, বর্ত্তমান যুগে ভারতে কুস্তির প্রচার ও উন্নতির সবথেকে বেশী সাহায্য করেন ভারতের রাজন্যবর্গ। এই সব রাজা-মহারাজারা যাবতীয় খরচ দিয়ে এবং মাহিনা দিয়ে বড় বড় কুস্তিগীরদের পুষতেন। ঐ সব বড় কুস্তিগীরদের বলা হতো 'পালোয়ান'। পালোয়ানেরা প্রত্যেকেই পেশাদার ছিলেন।

মাঝে মাঝে এক রাজার পালোয়ানের সঙ্গে অন্য রাজার পালোয়ানের লড়াই হতো। এই সব লড়াই বা কুস্তি প্রতিযোগিতাকে 'দঙ্গল' বলা হতো। বিভিন্ন দঙ্গলের সময় 'গুরুজ' রাখা হতো। হনুমানের হাতে যে গদার ছবি দেখা যায় ঐ গদাকে গুরুজ বলে। একটা রূপোর গোল লাঠির উপর একটা ফাঁপা রূপোর গোল বলের মত লাগিয়ে এই গুরুজ তৈরী হতো। কখনো কখনো গুরুজের মাথায় ঐ রূপোর বলটিতে নানা রকমের সোনার সুন্দর কাজ করা থাকতো।

যে রাজা বা মহারাজা এইজাতীয় মল্লযুদ্ধ বা কুস্তির ব্যবস্থা করতেন, তিনিই ঐ গুরুজ রাখতেন। যে পালোয়ান জয়ী হতেন, তিনি ঐ গুরুজটি চিরকালের মত লাভ করতেন এবং তাঁকে বলা হতো 'গুরুজ-বন্দ পালোয়ান' বা 'রুস্তম-ই-হিন্দ পালোয়ান'। গুরুজ-বন্দ বা রুস্তম-ই-হিন্দ পালোয়ানেরা শ্রেষ্ঠ পালোয়ান হিসেবে সম্মানিত হতেন। একই বছরে একাধিক লড়াইতেও গুরুজ রাখা হতো এবং দু'তিন জন পালোয়ানও একই বছরে গুরুজ-বন্দ পালোয়ানের সম্মান পেতেন। এই সব গুরুজ-বন্দ পালোয়ানের জন্যে লড়াই সবই হেভি-ওয়েট বা বেশী ওজনের পালোয়ানদের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হতো।

প্রথমদিকে সকল গুরুজ-বন্দ পালোয়ানেরাই হিন্দু ছিলেন। মুসলমান হয়ে প্রথম গুরুজ-বন্দ পালোয়ানের সম্মান লাভ করেন সাদিক পালোয়ান, রামদেব ও শুকদেব জেঠিকে হারিয়ে। এর পর থেকে ভারতের শ্রেষ্ঠ পালোয়ানের সম্মান অধিকাংশই মুসলমানেরাই পেয়ে এসেছেন।

আধুনিক কালে ভারতে কুস্তির চর্চ্চা সুরু হয় বরোদায়। বরোদার খাণ্ডেরাম মহারাজ নিজে একজন বড় পালোয়ান হওয়ায় কুস্তির উন্নতির জন্যে তিনি বিশেষ চেষ্টা করতে থাকেন। খাণ্ডেরাম মহারাজের আন্তরিক চেষ্টা ও উৎসাহের

ফলে বরোদায় আলিয়া, রামজী, ভগীরথ জেঠি ও বুট্টা পালোয়ানের ন্যায় বিখ্যাত পালোয়ানের সৃষ্টি হয়।

বরোদার পর আলোয়ারে কুস্তির চর্চ্চা আরম্ভ হয়। আলোয়ারের শ্রেষ্ঠ কুস্তীগীরদের মধ্যে ছোট আলিয়ার নাম ছিল সর্ব্বাধিক।

বরোদার পর মথুরার চৌবে ব্রাহ্মণেরা কুস্তির খুব চর্চ্চা সুরু করেন এবং এই চৌবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকে হীরা, দাও, নথু, গুলবী, গৰ্কী, চুচু, দোহারা, তপীয়া, খোসালা, চন্দন এবং বলদেওর ন্যায় পালোয়ানের সৃষ্টি হয়।

মথুরার চৌবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুস্তির চর্চ্চা একটু কমে যাওয়ার পর যোধপুরে পালোয়ান তৈরীর চেষ্টা করা হতে থাকে। ফলে সোলেমান, ইদা, ঠাকুর সিং এবং শোভা সিং-এর ন্যায় পালোয়ানেরা এখান থেকেই খ্যাতি লাভ করেন। জগদ্বিখ্যাত পালোয়ান গোলাম·পালোয়ানের শিক্ষা সুরু হয় এই যোধপুরেই। এ ছাড়াও কালু. রম্‌নী, করিম বক্স, লব্বু লোহারও পরে খুব সুনাম লাভ করেছিলেন।

যোধপুরের পর ইন্দোরে কুস্তির প্রচলন হয়। এই ইন্দোরেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পালোয়ান বড় গামা প্রথম সুনাম অর্জ্জন করেন। বড় গামা ছাড়াও আলি সাঁই, ইমাম বক্স এবং গোলাম কাদেরও তখনকার দিনে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পালোয়ান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

ইন্দোরের পর কোলাপুরে কুস্তির উন্নতির জন্যে চেষ্টা করা হয়। এই কোলাপুরেই ভারতে কুস্তির উন্নতির জন্যে রাজন্যবর্গের উৎসাহ ও সাহায্যের শেষ হয় বলা চলে। মাঝে মাঝে অবশ্য পাতিয়ালা, গয়া, তমলুক, ঝরিয়া প্রভৃতি জায়গায় কুস্তির 'দঙ্গল' বা প্রতিযোগিতা হতো সত্য, কিন্তু সেই সব দঙ্গল রাজাদের খুসীমত কখনো কখনো হতো বলা চলে।

ক্রমশঃ ভারতে পেশাদারী কুস্তি প্রতিযোগিতার ওপর সাধারণের আকর্ষণ কমে যেতে থাকে এবং সৌখীন কুস্তিগীর ও সৌখীন কুস্তি প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাঙ্গলায় ও ভারতে সৌখীন কুস্তি প্রতিযোগিতা প্রচলিত হয়।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন বা রেস্‌লিং ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার জন্ম হয়।

১৯৩৬, ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুস্তিগীরের দল যোগদান করে।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম বেসরকারী আন্তর্জাতিক কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ভারত ও জাপানের মধ্যে। ২রা মার্চ্চ থেকে তিনদিন ধরে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায় ন্যাশন্যাল ক্রিকেট ক্লাবের ইন্‌ডোর ষ্টেডিয়ামে।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বুখারেষ্টে যে বিশ্ব যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেই অনুষ্ঠানে ভারতীয় কুস্তিগীরের একটি দলকে পাঠান হয়। এই দলে নির্ব্বাচিত হন—কে. ডি. যাদব, সূর্যবংশী এবং শ্যামসুন্দর চ্যাটার্জ্জী। এই সফরে ভারতীয় কুস্তিগীরেরা খুব সাফল্য লাভ করতে পারেন না।

## *বাঙ্গলাদেশে কুস্তির প্রচলন ও প্রসার*

বাঙ্গলাদেশে কুস্তির প্রচলন ও প্রসার করবার জন্যে সবথেকে বেশী সাহায্য করেন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ এবং মুর্শিদাবাদের নবাব। মহারাজা নৃপেন্দ্র-নারায়ণের চেষ্টাতেই ভারতে প্রথম 'বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায় ১৮৯২ থেকে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। করিম বক্স ও টম্ ক্যানন্-এর মধ্যে এই লড়াই হয় এবং করিম বক্স এই লড়াইতে জয়লাভ করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে স্বীকৃত হন।

এইসব বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতা কিন্তু কোন এসোসিয়েশন মারফত হতো না। পালোয়ানের হয়ে কোন একজন লোক ঘোষণা করতেন যে, আমার অমুক নামের পালোয়ান পৃথিবীর যে-কোন পালোয়ানের সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত। এই ঘোষণা শুনে যে সব পালোয়ান লড়তে রাজী হতেন, তাঁদের মধ্যেই তখন লড়াই হতো।

মুর্শিদাবাদের নবাবও একটি বড় লড়াইয়ের ব্যবস্থা করেন রহিম পালোয়ান ও বালিওয়ালা গামুর সঙ্গে। বালিওয়ালা গামু এই লড়াইতে জয়লাভ করেছিলেন।

বাঙ্গলাদেশে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে কুস্তির প্রবর্ত্তন করেন অম্বিকাচরণ গুহ। এই সময়ে সাধারণ লোকের ধারণা ছিল যে—কুস্তি যারা করে, তাদের লেখাপড়া হয় না। অম্বিকাচরণ গুহ শিক্ষিত বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে কুস্তির প্রচলন করে প্রচলিত কুসংস্কারের পরিবর্ত্তন করেন।

অম্বিকাচরণ গুহ, জানবাজারের রাজা, ঝামাপুকুরের মিত্রবাড়ী, পাইক-পাড়ার জমিদার এবং ঝাড়গ্রামের রাজার চেষ্টায় কুস্তি বাঙ্গলাদেশে ক্রমশঃই প্রসারলাভ করতে থাকে।

বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গালী কুস্তিগীর হিসেবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীরের সম্মান

লাভ করেন গোবরবাবু। গোবরবাবুর আসল নাম যতীন্দ্রচরণ গুহ। গোবর-বাবুর প্রথম শিক্ষা সুরু হয় তাঁর নিজের জ্যাঠামশাই ক্ষেত্রচরণ গুহ এবং পিতা রামচরণ গুহের কাছ থেকে। পরে তিনি রমণী এবং কাল্লু পালোয়ানের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। ক্রমশঃ গোবরবাবুর খ্যাতি ভারতে এবং ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে।

আজ বাঙ্গলাদেশে কুস্তি বিশেষভাবে প্রচলিত হলেও এবং ১৯৪৮ ও ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের অলিম্পিকে ভারতীয় দলে দু'জন করে বাঙ্গালী কুস্তিগীর নির্ব্বাচিত হয়ে বাঙ্গলার সুনামকে বাড়িয়ে তুললেও, বাঙ্গালী ছেলেদের কুস্তির মান ক্রমশঃই অন্যান্য খেলাধুলার মত নেমে যাচ্ছে, এ কথা জোর করেই বলা চলে।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দের অলিম্পিকে যে দু'জন ভারতীয় কর্ম্মকর্ত্তা আন্তর্জাতিক কুস্তি ফেডারেশন কর্ত্তৃক সম্মানিত হয়েছেন, তাঁহারাও বাঙ্গালী। একজন হলেন গোবরবাবুর সুযোগ্য পুত্র মানিক গুহ ও অপর ব্যক্তি হলেন ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের সম্পাদক বি. বি. রায়। মানিক গুহ 'রেফারী' ও 'বিচারক' হিসেবে এবং বি. বি. রায় 'জুরি ডি এ্যাপিল' হিসেবে এই সম্মান লাভ করেন।

## *বাঙ্গলায় এবং ভারতে সৌখীন কুস্তি প্রতিযোগিতার সৃষ্টি*

ভারতে কুস্তি প্রতিযোগিতা বলতে যে পেশাদারী কুস্তি প্রতিযোগিতাই বোঝাতো, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। ভারতের রাজা-মহারাজারাই এই পেশাদারী কুস্তিগীর এবং পেশাদারী কুস্তি প্রতিযোগিতার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

কিন্তু ক্রমশঃই রাজা-মহারাজাদের কুস্তির 'পরে আকর্ষণ কমে যাওয়ায় পেশাদারী পালোয়ান বৃত্তির ওপর স্বভাবতঃই আকর্ষণ কমে যায়। অন্যদিকে ভারতের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কুস্তির প্রচার হওয়ায় বহু শিক্ষিত লোক শুধুমাত্র শরীর গঠন ও সুনাম লাভের আশায় কুস্তি সুরু করেন। ফলে বহু সৌখীন কুস্তিগীরের সৃষ্টি হয়। এই আবহাওয়া শুধু ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা একমাত্র সৌখীন সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় পেশাদারী কুস্তিগীরদের যোগদান বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারতে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, সেই প্রতিযোগিতার নাম দেওয়া হয় 'এ্যামেচার রেস্‌লিং চ্যাম্পিয়ানশিপ অফ ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ ভারতের সৌখীন কুস্তিগীরদের প্রতিযোগিতা। কোন পেশাদারী কুস্তিগীরই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারেন না। আজও এই নিয়মই চালু রয়েছে।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দেই বাঙ্গলাদেশেও 'এ্যামেচার চ্যাম্পিয়ানশিপ অফ বেঙ্গল' নাম দিয়ে প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে 'এ্যামেচার রেস্‌লিং চ্যাম্পিয়ানশিপ অফ ইণ্ডিয়া'—যাকে বর্ত্তমানে জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতা বলা হয়—সুরু হয় দিল্লীতে। প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব প্রথম এবং বাঙ্গলা দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতি একবছর অন্তর ভারতীয় অলিম্পিক •প্রতিযোগিতার সঙ্গে এই জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন ঠিক করেন যে, এই প্রতিযোগিতা প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হবে। ফলে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রতিবছরই এই 'জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য কুস্তি প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

## *রেস্‌লিং ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া*

বর্ত্তমানে ভারতে কুস্তি পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব যে প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত, তাকে ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন বা ইংরেজীতে 'রেস্‌লিং ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া' বলা হয়।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে কুস্তি পরিচালনার কোন সর্ব্বভারতীয় বা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ছিল না। ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনই ভারতের প্রধান কুস্তি প্রতিযোগিতাগুলি পরিচালনা করতেন। প্রতি একবছর অন্তর ভারতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বভারতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময় বাঙ্গলার এন. আমেদ-এর উৎসাহ এবং চেষ্টাতেই 'রেস্‌লিং ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া' বা ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন গঠিত হয়। এন. আমেদ এই ফেডারেশনের প্রথম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। এই সভাতেই ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় আইনও তৈরী করা

হয়। বাঙ্গলা, বোম্বাই, দিল্লী, পাঞ্জাব, কোলাপুর, মধ্যপ্রদেশ, পাতিয়ালা, রাজপুতনা, এস. এস. সি. বি., হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ এবং মহীশূর এই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রত্যেকটি রাজ্য-এসোসিয়েশনকে ৫০৲ টাকা বাৎসরিক চাঁদা দিয়ে ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এবং প্রতি একবছর অন্তর ফেডারেশনের সাধারণ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হবে বলেও এই সভা আইন তৈরী করেন।

## কোন্ কোন্ ভারতীয় কুস্তিগীর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন

আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীরদের ক্রমপর্য্যায়ে পেশাদারী কুস্তিগীরদের স্থান দেওয়া হয় না, এমন কি অলিম্পিকের কুস্তি প্রতিযোগিতাতেও পেশাদারী কুস্তিগীরদের যোগদান করবার অধিকার নেই। কিন্তু একদিন ছিল যখন সৌখীন কুস্তিগীরদের কোন স্থান ছিল না। কুস্তিগীর বা পালোয়ান বলতে পেশাদারী পালোয়ানদেরই বোঝাতো। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে সম্মান লাভ করতে হলে বিভিন্ন পেশাদারী কুস্তি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হতো।

এই পেশাদারী প্রতিযোগিতায় যে চারজন ভারতীয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন—তাঁরা হলেন করিম বক্স, গোলাম পালোয়ান, বড় গামা এবং গোবরবাবু। এই চারজন পালোয়ানের মধ্যে অবশ্য গোলাম পালোয়ান ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

করিম বক্স মাত্র একটি লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই এই শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েছিলেন। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের চেষ্টায় কলকাতায় এই প্রতিযোগিতা হয়েছিল টম ক্যানন্ ও করিমবক্স-এর মধ্যে। করিম বক্স, টম ক্যানন্‌কে পরাজিত করে, প্রথম ভারতীয় হিসাবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীরের সম্মান লাভ করেছিলেন।

কিন্তু গোলাম পালোয়ান, বড় গামা ও গোবরবাবুকে এই সম্মান লাভ করতে পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীরদের পরাজিত করতে হয়েছিল। বিদেশে সমর্থকহীন অবস্থায় এই মল্লযোদ্ধারা একের পর এক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীরদের হারিয়ে সারা বিশ্বকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন। সকল দেশ গোলাম পালোয়ান, বড় গামা ও গোবরবাবুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে বরণ করে নিয়েছিল।

১৯০০ সালে প্যারিসে যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয়, সেই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলার প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা থাকে। মতিলাল নেহেরু গোলাম পালোয়ানকে সঙ্গে করে নিয়ে যান তখনকার বিশ্ববিজয়ী তুরস্কের কাদের আলীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে। গোলাম ১৫ মিনিটের মধ্যেই 'ধোপিয়া পাট পঁ্যাচে' কাদের আলীকে ভারতীয় প্রথায় 'চিৎ' করে ফেললেও ঐ দেশের আইন অনুযায়ী দুটি কাঁধ মাটিতে না লাগায় ঐ 'চিৎ' গ্রাহ্য হয় না এবং পুরাপুরি তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত কোন জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয় না। ফলে পুনরায় লড়াই সুরু হয় এবং এই লড়াই সুরু হবার আগে রেফারী ও জুরীরা ঘোষণা করেন যে, যার হাঁটু-দুটি প্রথম 'ম্যাট' স্পর্শ করবে সেই পরাজিত হবে। গোলাম পালোয়ান ১৫ মিনিটের মধ্যে কাদের আলীকে ভূতলশায়ী করে বিশ্ববিজয়ী বলে ঘোষিত হন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে হার্মষ্টন নামে এক বিলিতি সার্কাস কলকাতায় খেলা দেখাতে আসে। গোবরবাবু ও রম্‌নী পালোয়ান ঐ সার্কাস দেখতে গিয়ে দেখেন পিটার ব্যানন নামে একজন অষ্ট্রেলিয়ান কুস্তিগীর যে-কোন ভারতীয় কুস্তিগীরের সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করছেন। এই দাম্ভিক ঘোষণা শুনে ভারতীয় হিসেবে গোবরবাবু ও রম্‌নী পালোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বলেন যে, তাঁরা তখনই লড়তে প্রস্তুত। কিন্তু পুলিশ কমিশনার অনুমতি না দেওয়ায় পিটার ব্যানন ভারতীয় কুস্তিগীরদের হাতে পরাজয়ের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পান।

যাই হোক, এই সুযোগে ঐ সার্কাসের অন্যতম কর্ত্তা বেঞ্জামিন ও হ্যামিল-টনের সঙ্গে গোবরবাবুর যোগাযোগ হয়। হ্যামিলটন ও বেঞ্জামিনের আর্থিক সাহায্যেই ১৯১০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বড় গামা, ইমামবক্স, আমেদবক্স, শরৎচন্দ্র মিত্র, গামু পালোয়ান, বাগ্‌লা খলিফা এবং গোবরবাবু ইউরোপের পথে যাত্রা করেন। গোবরবাবু বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়ায় শীঘ্রই দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন।

এই সফরে প্রথম বড় লড়াই হয় সুইজারল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ মল্লবীর জন লেমস্-এর সঙ্গে ইমামবক্স-এর। ইমামবক্স সহজেই জন লেমস্‌কে হারিয়ে দেন। ভারতীয় কুস্তিগীরদের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

এর পরের লড়াই হয় বড় গামা ও তখনকার আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মল্লবীর ডাঃ রোলা-র সঙ্গে। প্রথম লড়াইতে ডাঃ রোলা পরাজিত হবার পর আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব ভারতীয় কুস্তিগীরদের কাছে লুণ্ঠিত হলো দেখে ডাঃ রোলা দ্বিতীয়বার বড় গামার সঙ্গে লড়তে চান। বড় গামা একই দিনে অতি

সহজেই দ্বিতীয়বারেও ডাঃ রোলা-কে হারিয়ে দিয়ে ভারতীয় কুস্তির মান যে কত উঁচু, পুনরায় সেটা প্রমাণিত করেন। কিন্তু তখনও বিদেশী কুস্তিগীরেরা বড় গামাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে স্বীকার করতে রাজী হন না। তাই ঠিক হয় যে, পোল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর জিবিস্কোকে যদি বড় গামা হারাতে পারেন, তাহলে তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হবে।

বড় গামা তাতেই রাজী হন। প্রথম দিনের লড়াই হয় ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ধরে, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কেউ কাউকে হারাতে পারেন না। ফলে ঠিক হয়, এক সপ্তাহ পরে আবার লড়াই হবে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে জিবিস্কোকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে আর্থিক গোলোযোগ হওয়ায় জিবিস্কো লড়াইতে উপস্থিত হন না। ফলে বড় গামাকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়, এবং 'জন বুল চ্যাম্পিয়ানশিপ বেল্ট' দেওয়া হয়। ১৯২৮ সালে পাতিয়ালাতে পাতিয়ালার মহারাজের চেষ্টায় জিবিস্কো ও গামার মধ্যে ভারতীয় প্রথায় পুনরায় লড়াই হয় এবং গামা তিন ৩ মিনিটের মধ্যে জিবিস্কোকে পরাজিত করে বিশ্ববিজয়ীর গৌরব লাভ করেন।



গোবরবাবু

বড় গামার এই সাফল্যে গোবরবাবুর মনও নেচে ওঠে বিশ্ববিজয়ের

আকাঙ্ক্ষায়। দেশে ফিরে এসে কঠোর অনুশীলনের মধ্যে নিজেকে তৈরী করতে থাকেন। এইভাবে দীর্ঘ দুই বছর সাধনা করবার পর ১৯১২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ এম্পায়ার চ্যাম্পিয়ানশিপ এবং ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার জন্যে গোবরবাবু ইউরোপের পথে যাত্রা করেন।

গ্লাসগো-তে প্রথম বিখ্যাত লড়াই হয় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে স্কটল্যাণ্ডের চ্যাম্পিয়ান জিমি ক্যাম্বেল-এর সঙ্গে। ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ধরে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর গোবরবাবু জয়লাভ করেন। এই জয়লাভে গোবরবাবুর উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। এক সপ্তাহ পর বৃটিশ এম্পায়ার চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্যে শেষ লড়াই হয় এডিনবরায় জিমি এসেন-এর সঙ্গে। প্রথম দিনের লড়াই ৩৫ মিনিট ধরে চলবার পর গোবরবাবু জিমি এসেনকে পরাজিত করেন। একই দিনে পুনরায় আবার লড়াই হয় এবং এই লড়াইতে জিমি এসেন অবৈধ উপায়ে লড়াই করতে চেষ্টা করায় পরিচালকেরা জিমি এসেনকে অযোগ্য বিবেচনা করে গোবরবাবুকে জয়ী বলে ঘোষণা করেন। এই লড়াইয়ের পরেই গোবরবাবুকে বৃটিশ এম্পায়ার চ্যাম্পিয়ান কুস্তিগীর বলে ঘোষণা করা হয়। এর পর গোবরবাবু জার্ম্মানীর শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর কার্ল স্থাফ্‌টকে পরাজিত করে সমস্ত ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীরের সম্মান লাভ করে দেশে ফিরে আসেন।

গোবরবাবু ভারতের ও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে এই সময়ে স্বীকৃত হলেও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে স্বীকৃত হন না।

ফলে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার পথে যাত্রা করেন বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভের জন্য। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই বিখ্যাত লড়াই হয় সানফ্রান্সিস্‌কোতে এ্যাড স্যান্টেল-এর সঙ্গে। এ্যাড স্যান্টেল এই সময়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লাইট হেভি-ওয়েট কুস্তিগীর হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট ধরে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গোবরবাবু এ্যাড স্যান্টেলকে পরাজিত করে দীর্ঘদিনের বিশ্ববিজয়ের আশাকে বাস্তবে রূপায়িত করেন। গোবর-বাবুকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

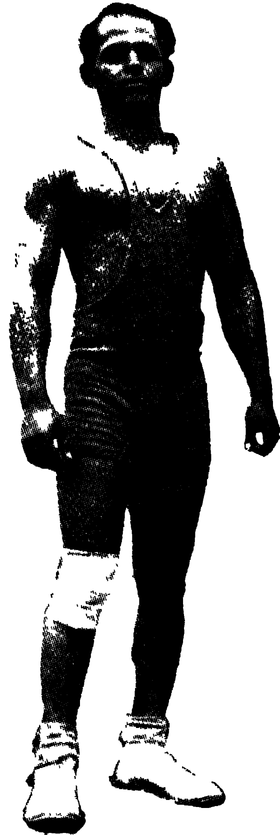
## *অলিম্পিকে ভারতীয় কুস্তিগীরদের কথা*

১৯২০ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করে আসছে। কিন্তু একমাত্র হকি ছাড়া অন্য কোন প্রতিযোগিতায় ভারতের কোন প্রতিনিধি ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান লাভ করে সোনার, রূপার বা ব্রোঞ্জের পাদক লাভ করতে পারেন নি। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয়

কুস্তিগীর কে. ডি. যাদব প্রথম ভারতীয় হিসাবে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে এন্টিওয়ার্প অলিম্পিকে প্রথম ভারত থেকে ৪ জন এ্যাথলেট ও ২ জন কুস্তিগীরকে পাঠান হয়। এই দুইজন কুস্তিগীর ছিলেন ন্যাভ্‌লি এবং সিন্ধে। আন্তর্জাতিক কুস্তি প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুস্তিগীরদের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা ছিল না এবং ভারতীয় কুস্তিগীরেরা গদির 'পরে কুস্তি করতে কোন দিনই অভ্যস্ত ছিলেন না। এই সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ন্যাভ্‌লি এবং সিন্ধে উভয়েই অলিম্পিকে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। সিন্ধে সেমিফাইন্যালে পরাজিত হন।

এর পর ১৯২৪, ১৯২৮ ও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে কোন ভারতীয় কুস্তিগীরকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় পাঠন হয় না। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে যে ভারতীয় কুস্তিগীরের দল পাঠান হয়, তাতে নির্ব্বাচিত হন উত্তরপ্রদেশের আনোয়ার রসিদ, পাঞ্জাবের করম রসুল এবং বরোদার খোরাট। কোন কুস্তিগীরই ব্যক্তিগত সাফল্য লাভ করতে না পারলেও সুনাম অর্জ্জন করেন।


কে. ডি. যাদব

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে 'ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন' গঠিত হবার পর পুনরায় ভারতীয় কুস্তিগীর-দের লণ্ডন অলিম্পিকে পাঠান হয়। অধিকাংশ ছাত্রদের নিয়েই এই দল গঠিত হয়। ভারতীয় দলের জন্য নির্ব্বাচিত হন কে. পি. রায়, নির্ম্মল বসু, এ. আর. ভার্গব, কে. ডি. যাদব ও বান্তা সিং। বান্তা সিং ছাড়া আর সকলেই ছাত্র ছিলেন।

ভারতীয় কুস্তিগীরেরা জুতা পায়ে কুস্তি করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সকল প্রতিযোগীকে জুতা পায়ে লড়তে হওয়ায় ভারতীয় কুস্তিগীরদের বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। ফলে কে. ডি. যাদব মাত্র এই অলিম্পিকে ১ পয়েন্ট লাভ করেন।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতীয় কুস্তিগীরদের আর একটি দল পাঠান হয়। ভারতীয় দলের জন্যে নির্ব্বাচিত হন কে. ডি. যাদব, এন. বসু, এন. দাশ, এস. যাদব এবং কে. ডি. ম্যান্‌গাভে।

ব্যাণ্টাম-ওয়েট বিভাগের প্রতিযোগিতায় প্রথম রাউণ্ডে ক্যানাডার গল্‌কুইনকে, দ্বিতীয় রাউণ্ডে মেক্সিকোর লিওনার্ডো রাস্তুরটোকে এবং তৃতীয় রাউণ্ডে জার্ম্মানীর স্মিট্‌জকে পয়েন্টে পরাজিত করে কে. ডি. যাদব ৪ পয়েন্ট এবং সেমিফাইন্যালে উঠবার কৃতিত্ব লাভ করে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় হিসেবে যাদব এই প্রথম সম্মান লাভ করেন।

ফেদার-ওয়েট বিভাগে কে. ডি. ম্যান্‌গাভে ৩ পয়েন্ট লাভ করে অল্পের জন্যই ব্রোঞ্জ পদক লাভ করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন।

## *কোন্ কোন্ বিভাগে কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়*

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বর্ত্তমানে কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৮টি বিভাগে ভাগ করে। এই সব বিভিন্ন বিভাগ কুস্তিগীরদের দেহের ওজন অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হয়। যে কুস্তিগীরের দেহের ওজন যেরূপ, তিনি সেই ওজনের বিভাগেই লড়তে পারেন।

১। ফ্লাই-ওয়েট—দেহের ওজন ১১৪½ পাউণ্ডের মধ্যে।

২। ব্যাণ্টাম-ওয়েট—দেহের ওজন ১১৪½ পাউণ্ডের বেশী এবং ১২৫½ পাউণ্ডের মধ্যে।

৩। ফেদার-ওয়েট—দেহের ওজন ১২৫½ পাউণ্ডের বেশী এবং ১৩৬½ পাউণ্ডের মধ্যে।

৪। লাইট-ওয়েট—দেহের ওজন ১৩৬½ পাউণ্ডের বেশী এবং ১৪৭½ পাউণ্ডের মধ্যে।

৫। ওয়েল্টার-ওয়েট—দেহের ওজন ১৪৭½ পাউণ্ডের বেশী এবং ১৬০½ পাউণ্ডের মধ্যে।

৬। মিডিল-ওয়েট—দেহের ওজন ১৬০½ পাউণ্ডের বেশী এবং ১৭৪ পাউণ্ডের মধ্যে।

৭। লাইট-হেভি-ওয়েট—দেহের ওজন ১৭৪ পাউণ্ডের বেশী এবং ১৯১ পাউণ্ডের মধ্যে।

৮। হেভি-ওয়েট—দেহের ওজন ১৯১ পাউণ্ডের বেশী যে-কোন ওজন।



# সাইক্লিং

## *সাইকেলের জন্ম ও বিস্তার*

মানুষ বহুদিন ধরে একটা ছু'চাকার গাড়ীর কথা ভাবলেও ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের আগে কোন ছু'চাকার গাড়ী আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। **১৬৯০ খৃষ্টাব্দে এম. ডি. সিভরাক নামে একজন ফরাসী প্যারিস-এ এই গাড়ী আবিষ্কার করেন।** এ-গাড়ীর চেহারাটি ছিল—ছুটো কাঠের গোল চাকা, ঐ গোল চাকা-ছুটোর সঙ্গে ছুটো লম্বা কাঠ উপরের দিকে উঁচু করে লাগানো এবং ঐ উঁচু কাঠ-ছুটোকে আর একটা লম্বা কাঠ দিয়ে জোড়া দেওয়া। এই গাড়ীতে কোনো প্যাডেল না থাকায় চালককে মাটিতে পা দিয়ে ঠেলে-ঠেলে চালাতে

হতো। এইজাতীয় গাড়ীতে বিশেষ কিছু সুবিধা না হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই এই গাড়ীর প্রচলন উঠে যায়।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আর একজন ফরাসী ভদ্রলোক কিছুটা উন্নত ধরণের সাইকেল আবিষ্কার করেন। **১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ব্লানচার্ড ও ম্যাগুইরিয়ার নামে দুজন ফরাসী ভদ্রলোক 'তিন-চাকার সাইকেল' আবিষ্কার করেন।** ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ডেনিস জনসন নামে একজন ইংরেজ এই তিন-চাকার আরও উন্নত ধরণের গাড়ী আবিষ্কার করেন।

**১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ব্যারন ডি. স্যাভারব্রাম সাইকেলের 'গীয়ার' আবিষ্কার করেন।** কিন্তু তিনি যে-জাতীয় গাড়ী আবিষ্কার করেন তার সামনের চাকার উচ্চতা ছিল ৬৪ ইঞ্চি এবং পেছনের চাকার উচ্চতা ছিল ১২ ইঞ্চি। অনেক আরোহী এইজাতীয় সাইকেল চড়তে গিয়ে আহত হতে থাকেন।

**১৮২১ খৃষ্টাব্দে লুইস গম্পার্টজ নামে একজন ইংরেজ সাইকেলের 'চেন' এবং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কির্ক্‌প্যাট্রিক ম্যাকমিলান নামে একজন স্কটল্যাণ্ডের কর্ম্মকার সাইকেলের 'প্যাডেল' আবিষ্কার করেন।** ক্রমশঃ বিভিন্ন দেশে সাইকেলকে আরও উন্নত করার চেষ্টা হতে থাকে এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লোহার ও কাঠের চাকার পরিবর্ত্তে সাইকেলের চাকাতে শক্ত রবারের 'টায়ার' লাগানো আরম্ভ হয়।

**বর্ত্তমানে যে সাইকেল চড়তে দেখা যায়, এইজাতীয় সাইকেল প্রথম আবিষ্কার করেন জে. কে. ষ্টার্লে নামে একজন ইংরেজ। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জে. বি. ডানলপ নামে একজন পশুচিকিৎসক বর্ত্তমানে প্রচলিত 'টায়ার' ও 'টিউব'-এর আবিষ্কার করেন।**

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এইচ. এল. কোর্টিস অবিরাম ২৪ ঘণ্টা সাইকেল চালিয়ে রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ২৪ ঘণ্টায় তিনি ২০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে সমর্থ হন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে স্প্রিংফিল্ড-এ **প্রথম সাইকেল প্রতিযোগিতা** অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে টমাস স্টিভেন্স দু'বছর ধরে সাইকেল চালিয়ে **বিশ্ব ভ্রমণ** করেন।

এই সময়ে গ্রেটবৃটেনে সাইকেল প্রতিযোগিতা জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণের সৃষ্টি করে। রাস্তায় সাইকেল প্রতিযোগিতা হতে থাকায় অনেক পথচারী আহত, এমন কি নিহত হওয়ার ফলে জনসাধারণের চলাচলের পথে সাইকেল প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিউইয়র্কে ছয়দিনব্যাপী (১৪২ ঘণ্টা) অবিরাম সাইকেল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ১৪২ ঘণ্টাকে ১৪৩ ঘণ্টা এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ঐ সময়কে আরও বাড়িয়ে ১৪৪ ঘণ্টা করা হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়।

**১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এথেন্সে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে সাইকেল প্রতিযোগিতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।**

## *ভারতে সাইকেল চালনার ইতিহাস*

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে সাইকেল প্রতিযোগিতা সরকারীভাবে কোন এসোসিয়েশন মারফত অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা যায় না। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সিড্‌নীতে অনুষ্ঠিত 'প্রথম বৃটিশ এম্পায়ার গেমস্'-এ ভারতীয় সাইকেল-চালক জানকী দাশ প্রথম যোগদান করেন। এই সময়ে ভারতে সাইকেল চালনার কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান না থাকায় জানকী দাশের নির্ব্বাচনে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন-এর মধ্যে তীব্র মতবিরোধ এবং অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, যার ফলে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন-এর সম্পাদক জি. ডি. সোন্ধী পদত্যাগ করেন।

সিড্‌নীতে জানকী দাশ আন্তর্জাতিক সাইকেল চালনার প্রতিষ্ঠান 'ইউনিয়ান সাইক্লিস্ট ইণ্টারন্যাশন্যালি'-র যুগ্ম-সম্পাদক ই. জে. সাউথকোটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অষ্ট্রেলিয়া থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর জানকী দাশ ভারতে সাইকেল-চালনা প্রতিযোগিতার প্রচারের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের ম্যানেজার স্বামী জগন্নাথের চেষ্টায় জানকী দাশ বিভিন্ন প্রাদেশিক অলিম্পিক এসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে সাইকেল প্রতিযোগিতাকে অন্তর্ভুক্ত করাতে সমর্থ হন।

ক্রমশঃ সাইকেল প্রতিযোগিতা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন সাইকেল প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেন। কিন্তু ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন-এর পরিচালকমণ্ডলীর সাইকেল প্রতিযোগিতা পরিচালনার অভিজ্ঞতা না থাকায়, তাঁরা এ্যাথলেটিকস্-এর নিয়ম অনুযায়ী সাইকেল প্রতিযোগিতা পরিচালনা করতে থাকেন এবং সেই কারণেই ভারতীয় সাইকেল-চালকদের সাইকেল-চালনার মানের বিশেষ উন্নতি সম্ভব হয় না। ফলে সাইকেল-চালনায় অভিজ্ঞ

লোকেদের নিয়ে গঠিত একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে দেখা দেয়।

পাঞ্জাব সাইক্লিষ্ট এসোসিয়েশন সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে সাইকেল প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্বামী জগন্নাথ এই এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। পাঞ্জাবের পরে 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সী সাইক্লিং ইউনিয়ন' এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে সাইকেল চালনার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান 'দি ন্যাশন্যাল সাইক্লিষ্ট ফেডারেশন্ অফ ইণ্ডিয়া' গঠিত হয়। স্বামী জগন্নাথ এই ফেডারেশনের সভাপতি এবং জানকী দাশ সম্পাদক হিসাবে নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে 'ন্যাশন্যাল সাইক্লিষ্ট ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া' মিলান কংগ্রেসের অধিবেশনে আন্তর্জাতিক সাইকেল চালনার প্রতিষ্ঠান 'ইউনিয়ন সাইক্লিষ্ট ইণ্টার-ন্যাশন্যালি'-র অন্তর্ভুক্ত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে ন্যাশন্যাল সাইক্লিষ্ট্ ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার কাজকর্ম্ম অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বামী জগন্নাথ এবং অন্যান্য অনেক কর্ম্মকর্ত্তা যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় ফেডারেশনের কাজকর্ম্ম একরূপ বন্ধ হয়ে যায় বললেই চলে। ফলে জানকী দাশ সহায়সম্বলহীন অবস্থায় উপায়ান্তর না দেখে সোরাব এইচ. ভূত-এর হাতে ন্যাশন্যাল সাইক্লিষ্ট্ ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আবার ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সাইকেল প্রতিযোগিতার উৎসাহ বেড়ে যায়, ফলে সাইকেল চালনার মানেরও ধীরে ধীরে উন্নতি হতে দেখা যায়। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সাইকেল চালকদের একটি দলকে সুইজারল্যাণ্ডে 'বিশ্ব সাইকেল প্রতিযোগিতা'য় যোগদানের জন্যে পাঠান হয়।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে আমস্টার্ডামে পুনরায় বিশ্ব সাইকেল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় সাইকেল চালকেরা যোগদান করেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সাইকেল চালকেরা প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের লণ্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় সাইকেল চালকের দল গঠিত হয়—এম. হাভেওয়ালা, আর. মেহেরা, ই. মিস্ত্রী, এইচ. প্যাভ্রী, এন. সি বসাক, আর. মুল্লা ফিরোজ এবং আর. নোবেল-কে নিয়ে।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ন্যায় ন্যাশন্যাল সাইক্লিষ্ট ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া ১৯৫২ খৃষ্টাব্দেও হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতীয় সাইকেল চালকদের একটি দলকে

পাঠান। বাঙ্গলাদেশ থেকেই সকল প্রতিযোগীরা নির্ব্বাচিত হন। ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—রাজকুমার মেহেরা, এস. চক্রবর্ত্তী, এন. সি. বসাক ও টি. কে. শেঠ।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে বুখারেষ্ট-এ বিশ্ব যুব সম্মেলনেও ভারতীয় সাইকেল চালকেরা যোগদান করেন।

১৯৫৫ সালে বিশ্ব সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় এবং 'আন্তর্জাতিক প্রাগ-বার্লিন-ওয়ারশ রোড রেস প্রতিযোগিতা'য় যোগদানের জন্য ৯ জন ভারতীয় সাইকেল চালকের একটি দলকে পাঠান হয়।

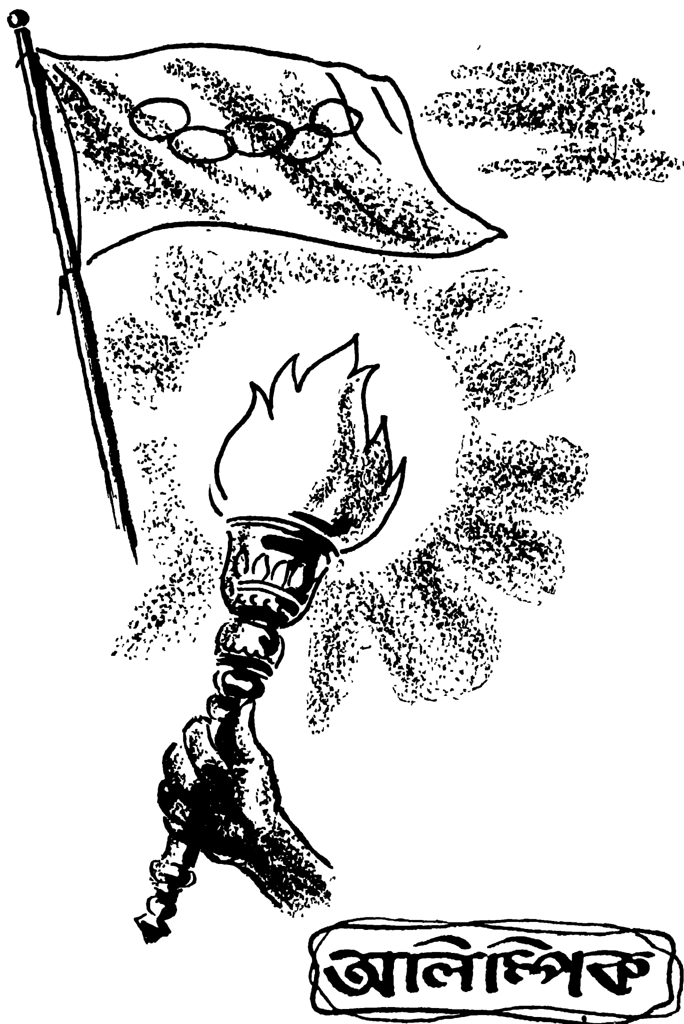
## বাঙ্গলাদেশে সাইকেল চালনার প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা

বাঙ্গলাদেশে সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতা যে কবে থেকে প্রথম সুরু হয়েছিল, সে কথা বলা সম্ভব নয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন সাইকেল প্রতিযোগিতাকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার অংশ হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আগে যে সকল সাইকেল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো, সেগুলো কোন বিশেষ ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা করতেন।

বাঙ্গলাদেশে প্রথম সাইকেল চালনার প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় 'বেঙ্গল সাইক্লিষ্ট ইউনিয়ন' নামে। কিন্তু ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের আগে বেঙ্গল সাইক্লিষ্ট ইউনিয়ন কোন সাইকেল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে পারেন না। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের পর বেঙ্গল সাইক্লিষ্ট ইউনিয়নের বিশেষ কোন কার্য্যপদ্ধতি দেখা যায় না। একমাত্র তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে কয়েকজন সাইকেল চালক বিভিন্ন সাইকেল প্রতিযোগিতায় প্রতিবছর যোগদান করে থাকেন।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে 'ন্যাশন্যাল সাইক্লিং এসোসিয়েশন' নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে এবং এই প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর সাইকেল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে থাকেন।

বেঙ্গল সাইক্লিষ্ট ইউনিয়ন এবং ন্যাশন্যাল সাইক্লিং এসোসিয়েশন উভয়েই বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত। বাঙ্গালা রাজ্যের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন বা রাজ্য সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতার সকল দায়িত্বই আজও বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের উপর ন্যস্ত।




## প্রাচীন অলিম্পিকের ইতিহাস

শান্তিতে বাস করবার স্বাভাবিক ইচ্ছা মানুষের জন্মগত। মানুষ যুগে যুগে শান্তিতে বাস করতে চেয়েছে, কিন্তু সেই শান্তির প্রার্থনার মাঝেও কখনও কখনও অশান্তির কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। চরম অত্যাচার, নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার মাঝে যখন জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, তখন শান্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজন মানুষ আরও বেশী করে অনুভব করেছে।

খেলাধুলার অর্থ শুধু খানিকটা দৌড়-ঝাঁপ নয়, বা খেলাধুলার উদ্দেশ্য একমাত্র শারীরিক উন্নতিসাধন নয়। এই খেলাধুলার মধ্য দিয়ে পরস্পরের

মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক, যে সৌভ্রাত্রের বন্ধন সৃষ্টি করা যায়, এ অন্য কিছুতেই সম্ভব নয়। এই প্রাঞ্জল সত্য শুধু আজকের মানুষই স্বীকার করেনি, যুগে যুগে



এথেন্সের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মাঝে অলিম্পিকের মাঙ্গলিক শিখাকে মন্ত্রঃপূত করছেন প্রধান যাজক।

এই শাশ্বত সত্য স্বীকৃত হয়েছে। তাই দেশের চরম অমঙ্গল, অশান্তি বা যুদ্ধের উন্মত্ততার মাঝে মানুষ খেলাধুলার জ্যোতির্ম্ময় রূপকে যুগে যুগে স্মরণ করেছে।

অলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা সৃষ্টির ইতিহাস সেই অশান্তি ও অমঙ্গলের মাঝে খেলাধুলার মাধ্যমে শান্তি ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

গ্রীস-এর অগণিত দলপতি ও ছোট ছোট দেশনায়কদের সামান্য স্বার্থের প্রয়োজনে যখন যুদ্ধের লেলিহান শিখা সমস্ত গ্রীসকে গ্রাস করে ফেলেছিল—অত্যাচার, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনায় যখন গ্রীস-এর আপামর জনসাধারণের জীবন-যাপন করা দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠেছিল, তখন তারা এই খেলাধুলার জ্যোতির্ম্ময়রূপ অলিম্পিক ক্রীড়ার স্মরণাপন্ন হয়েছিল। এই সার্ব্বজনীন ক্রীড়ার মাধ্যমেই শতধাবিভক্ত যুদ্ধোন্মাদ গ্রীস-এ শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের মধ্যে অলিম্পিকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই অলিম্পিক অনুষ্ঠান ঠিক কবে যে আরম্ভ হয়, সে কথা সঠিক জানা না গেলেও, খুব সম্ভব খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৫৩-তে অথবা সমসাময়িক কালে প্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠান হয়েছিল বলে মনে হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ৭৭৬ বছর আগে থেকে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায়।

অলিম্পিক যখন প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল, তখন কিন্তু অনুষ্ঠানকেন্দ্রে খেলাধুলার আসর বসতো না। 'অলিম্পিয়াড' বা চার বছরের মধ্যে যে সব গ্রীক মারা যেতো তাদের পরলোকগত আত্মার তুষ্টিবিধানের জন্যে চার বছর অন্তর এক একটা বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হতো। এই সব বিচিত্রানুষ্ঠানে, সেই সব মৃত ব্যক্তি যে-সব জিনিস ভালোবাসতেন, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করার ব্যবস্থা করা হতো। সাধারণতঃ খেলাধুলা, সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং ভোজন প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকতো।

খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৫৩-এর আগে গ্রীসকে বলা হতো 'হেলাস্'। এই সময়ে হেলাস্ ছিল বহু খণ্ডে বিভক্ত। এই সব বিভিন্ন খণ্ডের রাজাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকায় গ্রীস-এ শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্যে পিসা-র রাজা সিলোসথেনস্, স্পার্টা-র রাজা লাইকারজাস্ এবং এলিস-এর রাজা হিফিটাস্ খৃষ্টজন্মের ৭৭৬ বছর আগে এই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রবর্ত্তন করেন।

গ্রীসের দক্ষিণদিকে এথেন্স শহর থেকে ১২৫ মাইল দূরে সুন্দর সমতলভূমি ছিল। ঐ সমতল ভূমির একদিকে অ্যালফিয়াস ও ক্ল্যাডিয়াস নদীর মোহানা এবং অন্য তিনদিকে সবুজ গাছপালাযুক্ত পাহাড়। এই জায়গাটির নাম ছিল অলিম্পিয়া। কোন নগরের সীমানার কাছাকাছি না থাকায় এইখানেই প্রথম অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে গ্রীকেরা ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান বলে মনে করতো। সেই

কারণে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা স্থরু করবার আগে ৬০ ফুট উঁচু থিয়াসের সোনারপাত মোড়া অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত পবিত্র মূর্ত্তির সামনে সূর্য্যরশ্মির



সূর্য্যরশ্মি থেকে অলিম্পিকের নর্ত্তকীরা অলিম্পিক মশাল জ্বালিয়ে দিচ্ছেন

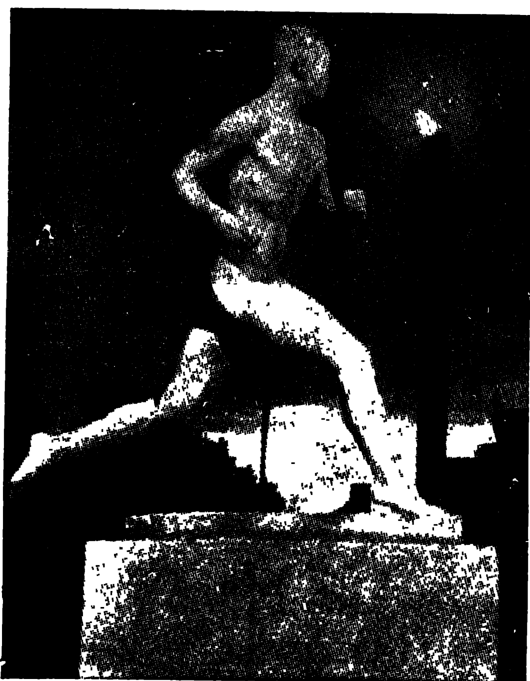
সাহায্যে যে অগ্নি জ্বালানো হতো, সেই অগ্নিকে সাক্ষী করে সমস্ত প্রতিযোগী ও বিচারকের দলকে ন্যায়, নিষ্ঠা ও পরস্পর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের শপথ নিতে হতো। এই শপথ কখনো কোন প্রতিযোগী বা বিচারক ভঙ্গ করেছেন বলে শোনা যায় না।

এরপর স্থরু হতো পাঁচদিন ব্যাপী অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান। শপথ গ্রহণ, কুচকাওয়াজ ও উদ্বোধনী ভাষণের পর দ্বিতীয় দিন থেকে খেলার কর্ম্মসূচী স্থরু



প্রাচীন গ্রীস-এর কুস্তি প্রতিযোগিতা

হতো। প্রথম -হতো রথ চালনা এবং তারপর হতো পেণ্টাথেলন। এই পেণ্টাথেলন প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক প্রতিযোগীকে দৌড়, লং জাম্প, লৌহ-চাকতি ছোঁড়া, বর্শা ছোঁড়া এবং কুস্তি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হতো। যে প্রতিযোগী সবথেকে বেশী পয়েন্ট সংগ্রহ করতো, সে-ই জয়ী হতো। তৃতীয় দিন সকালে চলতো মিছিল ও পূজা এবং বিকালে ছোট ছেলেদের দৌড়, মুষ্টিযুদ্ধ এবং কুস্তি। চতুর্থ দিন সকালে বিভিন্ন দৌড়ের প্রতিযোগিতার পর বিকেলে মুষ্টিযুদ্ধ এবং কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো।



অলিম্পিক বিজয়ীর স্মৃতিস্তম্ভ

পঞ্চম বা শেষ দিন ভোজ, পরস্পর মেলামেশা, গানবাজনা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর প্রতিযোগিতা পরিসমাপ্ত হলো বলে ঘোষণা করা হতো।

এই সময়ে অলিম্পিক বিজয়ীদের পুরস্কার হিসেবে হাতে দেওয়া হতো তালপাতা এবং মাথায় পরিয়ে দেওয়া হতো অলিভ গাছের পাতার তৈরী মুকুট। এই সব বিজয়ীরা সকল সময়েই রাজকীয় মর্য্যাদা লাভ করতেন। সেকালে হেলাস-এর প্রতিটি নগর যুদ্ধবিগ্রহের ভয়ে বিশাল পাথরের প্রাচীর

দিয়ে ঘেরা থাকতো। অলিম্পিক বিজয়ীরা যখন দেশে ফিরতেন, তখন ঐসব পাথর খুঁড়ে গর্ত্ত করে প্রবেশপথ তৈরী করা হতো। যে নগরের প্রাচীরে এরূপ গর্ত্তের সংখ্যা বেশী থাকতো, সেই নগরের মর্য্যাদা তত বেশী হতো। অলিম্পিক বিজয়ীরা দেশে ফিরবার পর তাঁদের সম্মানের জন্যে বিভিন্ন ভোজ-সভা ও সম্বর্দ্ধনা-সভার আয়োজন করা হতো। অলিম্পিক বিজয়ীরা নগরের যে কোনো অংশে একটি স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করতে পারতেন। এই স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণে অর্থাভাব ঘটলে জনসাধারণ অর্থ সাহায্য করতে কার্পণ্য করতো না।

এই সময়ে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা দেখার অধিকার নারীদের ছিল না। কোন নারী যদি কখনো দূর থেকে গোপনে অলিম্পিক অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে ধরা পড়তেন, তাহলে তাঁকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করা হতো। কতদিন পর্যন্ত নারীদের প্রবেশ অধিকার ছিল না, তা বলা যায় না। নারী-দর্শক হয়ে প্রথম ছদ্মবেশে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা দেখতে এসে ধরা পড়েন মুষ্টিযোদ্ধা পিসিডোরাস-এর মাতা ফেরনিস। ফেরনিস পিসিডোরাস-এর শিক্ষকের ছদ্মবেশে প্রবেশ করেন, কিন্তু সন্তানের সাফল্যে নিজের ছদ্ম-বেশের কথা বিস্মৃত হয়ে যাওয়ায় ধরা পড়েন। বিচারের সময়ে ফেরনিস স্নেহ, মমতা ও মাতৃত্বের প্রশ্ন তুলে বিচারকদের কাছে নারীদের অলিম্পিক প্রতিযোগিতা দেখবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন।


প্রাচীন গ্রীস-এর মহিলা এ্যাথলেটের প্রস্তরমূর্ত্তি

অবশ্য এর আগেই জিয়াস-পত্নী দেবরাজ্ঞী হেরা-র সম্মানে প্রতি চার বছর অন্তর মহিলাদের স্বতন্ত্র অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো এবং এই অনুষ্ঠানকে বলা হতো হেরেয়া'। গ্রীক-নেত্রী হিপ্পোডেমিয়া এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করেছিলেন।

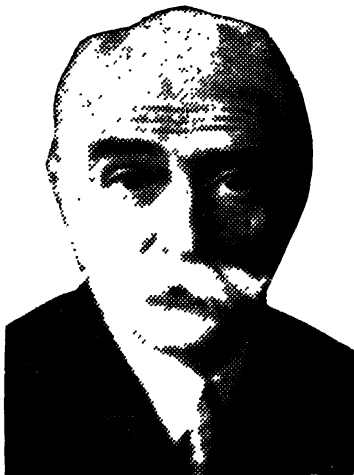
অলিম্পিক প্রতিযোগিতার প্রথম দিকে প্রতিযোগীরা সিংহের চামড়ার ছোট ছোট বহির্বাস ব্যবহার করতেন, কিন্তু খৃষ্টজন্মের ৭২০ বছর আগে থেকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে হতো।

রোম গ্রীস অধিকার করে নেবার পরেও কয়েকটি অলিম্পিকে শুধু মাত্র গ্রীস এর প্রতিযোগীরাই যোগদান করেছিল। ক্রমশঃ রোমের লোকেরা অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে সুরু করে। কয়েকটি অলিম্পিক নির্ব্বিঘ্নে হয়ে যাবার পর রোমের লোকেরা অসৎ উপায়ে প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে থাকায় রোম এবং গ্রীসএর প্রতিযোগীদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ফলে পরবর্ত্তী এক অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময়ে রোমানরা অলিম্পিয়ার বিরাট ষ্টেডিয়ামে এবং গ্রীক প্রতিযোগীদের বিশ্রামস্থানগুলিতে আগুন ধরিয়ে ভেঙেচুরে একেবার বিনষ্ট করে দেয়।

বিভিন্ন জাতির প্রীতির সম্পর্ক, সৌভ্রাত্রের বন্ধন দৃঢ়তর করার মিলনকেন্দ্র এইভাবে বিনষ্ট হয়। অবস্থা এমন চরমে পৌঁছে যে, তখনকার রোমের সম্রাট থিওডিসিয়াস আইন করে খৃষ্টজন্মের ৩৯৪ বছর আগে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দেন।

## আধুনিক অলিম্পিকের ইতিহাস

অলিম্পিকের আত্মা অমর। অলিম্পিক মশালের শিখা অনির্ব্বাণ। তাই খৃষ্টজন্মের ৩৯৪ বছর আগে রোমসম্রাট থিওডিসিয়াস যে অলিম্পিক অনুষ্ঠান আইনের সাহায্যে বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সেই অমর আত্মার আহ্বানে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের ব্যারণ পিয়ারি দ্য কুবার্ত্তিন অলিম্পিক ক্রীড়া পুনরনুষ্ঠানের জন্যে উদ্যোগী হন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে কুবার্ত্তিন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। ইতালি, স্পেন এবং সুইডেন ছাড়া অন্য কোন দেশ এই আহ্বানে সাড়া দেয় না। যাই হোক, যোগদান কারী দেশগুলিকে নিয়ে এক অলিম্পিক কমিটি তৈরী হয়।

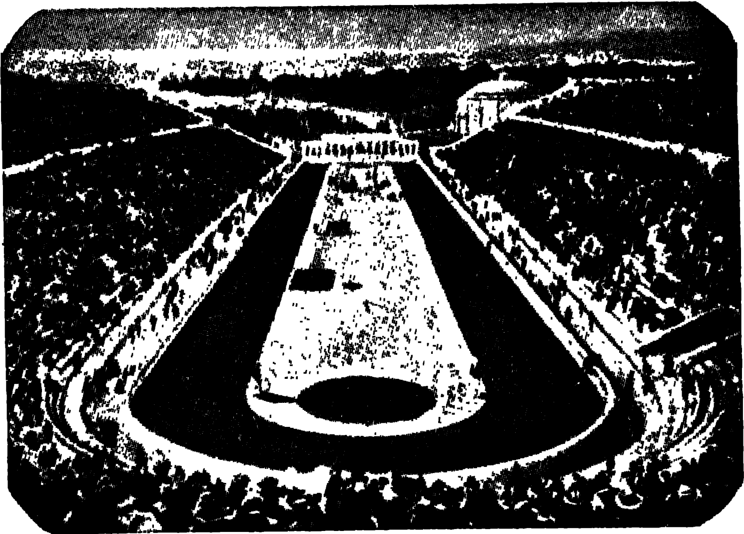


ব্যারণ পিয়ারি দ্য কুবার্ত্তিন

প্রাচীন অলিম্পিকের স্থান অলিম্পিয়াতেই আবার অলিম্পিক সুরু করবার জন্যে সকলেই আগ্রহী হন। কিন্তু অলিম্পিয়ায় তখন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নেই। ফলে এথেন্সেই অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচিত করা হয়। গ্রীসের যুবরাজ কনষ্টানটাইন সহায় হন। আলেকজেন্দ্রিয়ার গ্রীক বণিক আভেরফ ষ্টেডিয়াম নির্মাণ করবার জন্যে ২০ লাখ ড্রাক্‌মা দান করেন। এথেন্সের ষ্টেডিয়ামের ধ্বংসাবশেষের ওপর নূতন ষ্টেডিয়াম নির্মিত হয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আধুনিক অলিম্পিক আবার চালু হয়। প্রতি চার বছর অন্তর অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে থাকে, কিন্তু যুদ্ধের জন্যে ১৯১৬, ১৯৪০ এবং ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে কোন অলিম্পিকের আয়োজন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু অলিম্পিকের অনুষ্ঠান না হলেও গুণতির হিসাবে অলিম্পিক বন্ধ থাকে না। তাই গত ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের হেলসিঙ্কি অলিম্পিক প্রকৃতপক্ষে দ্বাদশ অলিম্পিক হলেও, ঐ অলিম্পিককে পঞ্চদশ অলিম্পিক বলা হয়।

## প্রথম অলিম্পিক (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে—এথেন্স)

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল এক শুভদিনে এথেন্সের নবনির্মিত অশ্বখুরাকৃতি ষ্টেডিয়ামে গ্রীসের রাজা আধুনিক অলিম্পিকের উদ্বোধন করেন। ১০টি বিভিন্ন



এথেন্সের অশ্বখুরাকৃতি মার্বেল ষ্টেডিয়াম

রাষ্ট্রের ৩৫০ জন প্রতিযোগী এই অলিম্পিকে যোগদান করেন। অধিকাংশ

প্রতিনিধিই অবশ্য ক্লাব, বিশ্ববিদ্যালয় বা ব্যক্তিগত ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। কয়েকপ্রকারের দৌড়, সাইক্লিং, ফেন্সিং, জিমনাষ্টিক, লন টেনিস, গুলী ছোঁড়া, সাঁতার এবং ভারোত্তোলন এই প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল। বিভিন্ন এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার মধ্যে আমেরিকা ৯টিতে এবং গ্রেটবৃটেন ২টিতে বিজয়ী হয়। ম্যারাথন দৌড়ে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন গ্রীসের এক মেষপালক। মেষপালক স্পিরিডন লুয়েস্ যখন ষ্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর দুইদিকে গ্রীসের দুই রাজকুমার শেষ সীমারেখা পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যান। একমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

## দ্বিতীয় অলিম্পিক (১৯০০ খৃষ্টাব্দে—প্যারিস)

দ্বিতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় কুবার্ত্তিনের দেশ প্যারিস শহরে। ১৪ই থেকে ২২শে জুলাই পর্য্যন্ত এই অলিম্পিকের অনুষ্ঠান চলে। ১৩টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এই অলিম্পিকে যোগদান করেন। আমেরিকার প্রতিযোগীরা অধিকাংশ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন।

## তৃতীয় অলিম্পিক (১৯০৪ খৃষ্টাব্দে—সেণ্ট লুই)

তৃতীয় অলিম্পিকের স্থান নির্বাচিত করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেণ্ট লুই শহরে। ২৯শে আগষ্ট থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ট্রাক ও ফিল্ড এবং এ্যাথলেটিকসের অনুষ্ঠান চলে। বৃটেন ও ফ্রান্স এই অলিম্পিকে যোগ না দেওয়ায় মাত্র ৮টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দৌড় এবং এ্যাথলেটিকস-এ দুইটি বিষয় ছাড়া আমেরিকার প্রতিনিধিরা সকল বিষয়গুলিতে জয়লাভ করেন। আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলেটরা এই প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করে হার্ডলস-এ বিজয়ী হবার কৃতিত্ব লাভ করেন। ম্যারাথন দৌড়ে একজন প্রতিযোগী অতি দ্রুত এসে পৌঁছানোতে সকলের সন্দেহ হয় এবং ঐ প্রতিযোগী স্বীকার করেন যে অর্দ্ধেক পথ তিনি মোটরে অতিক্রম করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

## চতুর্থ অলিম্পিক (১৯০৮ খৃষ্টাব্দে—লণ্ডন)

চতুর্থ অলিম্পিকের জন্যে স্থান নির্ব্বাচিত করা হয় রোমে। কিন্তু ইতালি শেষ পর্য্যন্ত এই বিরাট দায়িত্ব নিতে অক্ষমতা জানানোর ফলে ইংলণ্ড এই দায়িত্ব বহন করতে স্বীকৃত হয়।

২২টি দেশ এই অলিম্পিকে যোগদান করে। ১৩ই জুলাই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়ে ২৫শে জুলাই শেষ হয়। ইংরেজেরা এই অলিম্পিকে অর্দ্ধেকের

বেশী বিষয়ে সাফল্য লাভ করে। এই অলিম্পিকেই যোগদানকারী বিভিন্ন দেশগুলি নিজ নিজ জাতীয় পাতাকা সহ প্রথম মার্চ্চ পাষ্টে যোগদান করে।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির দ্বারা সর্বপ্রথম এই অলিম্পিক প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়। ম্যারাথন দৌড়ের দূরত্ব ২৬ মাইল এই অলিম্পিকেই নির্দিষ্ট হয়।

## পঞ্চম অলিম্পিক (১৯১২ খৃষ্টাব্দে—ষ্টকহলম্)

পঞ্চম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় ষ্টকহলম্-এ। ২৬টি দেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। 'শিল্প, সঙ্গীত, অঙ্কন প্রভৃতি প্রতিযোগিতা' এই অলিম্পিকে প্রথম অঙ্গীভূত করা হয়। ইলেকট্রিক টাইমিং এবং ফটো ফিনিশের প্রবর্ত্তন করা হয়। মহিলারা সর্বপ্রথম এই অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেন। আধুনিক পেণ্টাথেলন এবং অশ্বারোহণ প্রতিযোগিতাও প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান জিমি থর্প, ডেকাথেলন ও পেণ্টাথেলন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলেও, শ্বেতাঙ্গদের ঈর্ষ্যার ষড়যন্ত্রে পেশাদারিত্বের অপবাদে তাঁকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয় না। বক্সিং, কুস্তি, হকি, পোলো এবং সাইকেল প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিকে অনুষ্ঠিত হয় না।

## সপ্তম অলিম্পিক (১৯২০ খৃষ্টাব্দে—এণ্টোয়ার্প)

প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় না। যুদ্ধবিধ্বস্ত বেলজিয়ামে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই সপ্তম অলিম্পিকের ব্যবস্থা হয়। ১৪ই আগষ্ট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়ে ১২ই সেপ্টেম্বর সরকারীভাবে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ২৬টি দেশের প্রতিনিধিরা ২১টি বিভাগের ১১৭টি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ফিনল্যাণ্ডের প্যাভো নূর্মী ১০,০০০ মিটার দৌড় ও ক্রসকান্ট্রি রেসে বিজয়ী হন।

ভারত এই অলিম্পিকে প্রথম যোগদান করে।

## অষ্টম অলিম্পিক (১৯২৪ খৃষ্টাব্দে—প্যারিস)

প্যারিসের নবনির্ম্মিত কলম্বেস ষ্টেডিয়ামে ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট ডুমার্গে ও বৃটেনের দুইজন রাজকুমারের উপস্থিতিতে অষ্টম অলিম্পিক সুরু হয়। ৫ই জুলাই থেকে ২৭শে জুলাই পর্য্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলে। ৪৫টি দেশের প্রতিনিধিরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। আমেরিকা সবথেকে বেশী স্বর্ণপদক লাভ করলেও ফিনল্যাণ্ডের প্যাভো নূর্মী মাত্র ২ ঘণ্টার মধ্যে ১,৫০০ মিটার

এবং ৫,০০০ মিটার দৌড়ে নূতন রেকর্ড করেন এবং ১০,০০০ মিটার ক্রসকান্ট্রি রেসে বিজয়ী হয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দৌড়ানিয়া হিসাবে স্বীকৃত হন।

## নবম অলিম্পিক ( ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে—আমষ্টার্ডাম )

৪৩টি দেশের চারহাজার প্রতিযোগী এই আমষ্টার্ডাম অলিম্পিকে যোগদান করেন। ২৮শে জুলাই থেকে ১২ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এই অলিম্পিকের অনুষ্ঠান চলে। এই অলিম্পিকে দর্শকের ভীড় এত বেশী হয় যে, প্রথম দিনে ফিনল্যাণ্ডের প্রতিযোগীদের পাঁচিল টপকে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। মহিলারা প্রথম দৌড় এবং বিভিন্ন এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

## দশম অলিম্পিক ( ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে—লস এঞ্জেলস্ )

৩৭টি দেশের ১৭০০ জন প্রতিযোগী লস এঞ্জেলস্ অলিম্পিকে যোগদান করেন। ১৬টি বিশ্ব রেকর্ড এবং ২৫টি অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকার নিগ্রো প্রতিযোগীদের জয়-জয়কার হয়। ৩০শে জুলাই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়ে ১৪ই আগষ্ট পরিসমাপ্ত হয়।

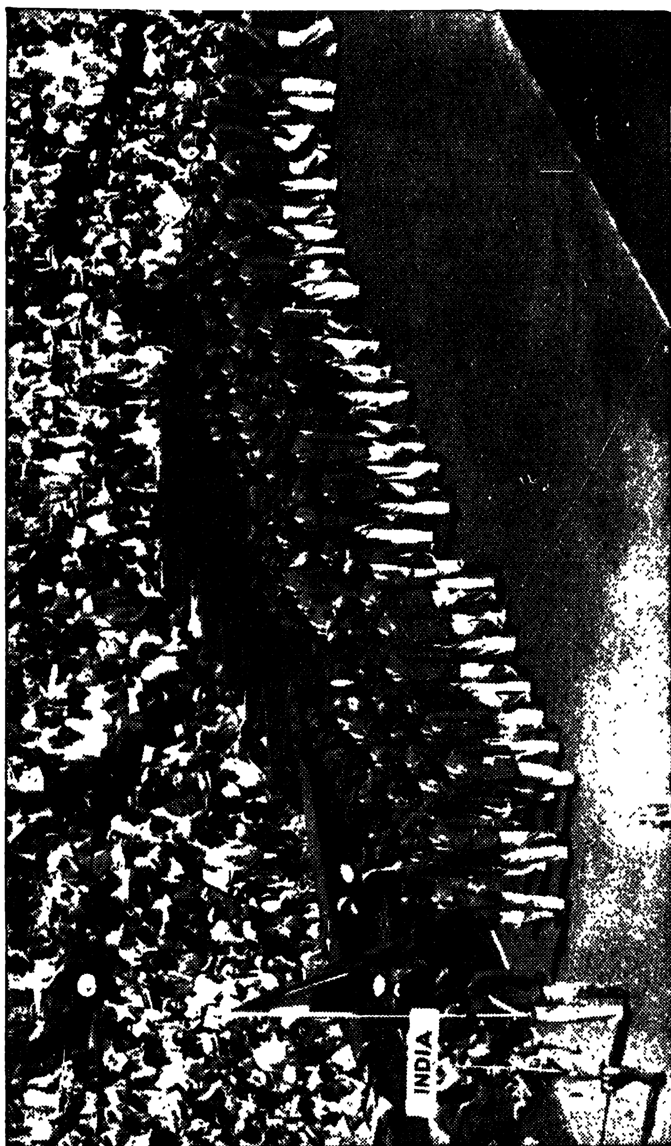
## একাদশ অলিম্পিক ( ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে—বার্লিন )

বার্লিনের একাদশ অলিম্পিক আগের সকল অলিম্পিক প্রতিযোগিতাগুলিকে ম্লান করে দেয়। ৫১টি দেশের ৪,০৬৯ জন প্রতিযোগী এবং ঐ সংখ্যার মধ্যে ১২০০ জন মহিলা এই অলিম্পিকে যোগদান করেন। ১লা আগষ্ট থেকে ১৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলে। গ্রীসের অলিম্পিয়া গ্রাম থেকে ৩০০০ জন দৌড়বীর পর্য্যায়ক্রমে দৌড়ে অলিম্পিক মশাল বহন করে আনেন। ৫৮টি নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র ১৫০০ মিটার দৌড়ে পাঁচবার নূতন রেকর্ড হয়। জেসি ওয়েন্স রিলে রেস ছাড়া ৩টি স্বর্ণপদক লাভ করেন।

## চতুর্দ্দশ অলিম্পিক ( ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে—লণ্ডন )

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে ১৯৪০ ও ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় না। যুদ্ধ থেমে যাবার পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ ওয়েম্বলী ষ্টেডিয়ামে চতুর্দ্দশ অলিম্পিকের উদ্বোধন করেন। ৫৯টি দেশের ৪,১৪৬ জন প্রতিযোগী ১৩৬টি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। আমেরিকার প্রতিযোগীরা সর্ব্বাধিক সাফল্য লাভ করলেও নেদারল্যাণ্ডের ফ্যানী ব্লাঙ্কার্স কোয়েন একাকী ৪টি স্বর্ণপদক লাভ করে সকলকে বিস্মিত করে দেন।

ভারত থেকে ৮৬ জন প্রতিযোগী এবং ৫২ জন কর্ম্মকর্ত্তা এই অলিম্পিকে




১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় দলের মার্চ পাষ্ট

যোগদান করেন। ১৪ই আগষ্ট এই অলিম্পিক প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি হয়।

**পঞ্চদশ অলিম্পিক ( ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে—হেলসিঙ্কি )**

৭১টি দেশের প্রায় ৬,০০০ প্রতিনিধি এই হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যোগদান করেন। ১৯ জুলাই থেকে ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলে। আমেরিকা ৪৪টি স্বর্ণপদক লাভ করে ব্যক্তিগত এবং দলগত প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। দীর্ঘ ব্যবধানের পর রাশিয়া এই অলিম্পিকে যোগদান করে ২২টি স্বর্ণপদক লাভ করে সকলকে বিস্মিত করে দেয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার এমিল জ্যাটোপেক ৫,০০০ মিটার, ১০,০০০ মিটার এবং ম্যারাথন দৌড়ে জয়লাভ করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন।

ভারত থেকে ৮২ জন প্রতিযোগী এবং ১৮ জন কর্ম্মকর্ত্তা হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যোগদান করেন। মল্লযুদ্ধে ভারতীয় কুস্তিগীর কে. ডি. যাদব ভারতীয় হিসাবে প্রথম ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

## *ভারতীয় এ্যাথলেটরা কে, কবে, কোন্ অলিম্পিকে যোগদান করেছেন*

আলেকজ্যাণ্ডার এম. ওয়েয়াণ্ড লিখিত 'অলিম্পিক পেজাণ্ট' নামে অধুনা প্রকাশিত একখানি বই থেকে দেখা যায় যে ১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিকে ডব্লিউ. জি. প্রিচার্ড নামে একজন ভারতীয় যোগদান করে ২০০ মিটার দৌড় ও ২০০ মিটার হার্ডেলসে ২য় স্থান অধিকার করেন। কিন্তু তিনি ভারতীয় ছিলেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষেরা এ বিষয়ে আজও কোন আলোকপাত করতে পারেন নি। ঐ একই বইয়েতে দেখা যায় যে ১৯০৪ সালের অলিম্পিকেও ফ্রাঙ্ক পিয়ার্স নামে একজন ভারতীয় ম্যারাথন রেসে যোগদান করেন কিন্তু ফ্রাঙ্ক পিয়ার্স সত্যই ভারতীয় ছিলেন কি না অথবা কি ভাবে তিনি যোগদান করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সঠিক সংবাদ ভারতের কোন কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে আজও স্বীকৃত হয়নি।

**( ১৯২০ )**

যাই হোক বিভিন্ন নথীপত্র থেকে যতদূর জানা যায় তাতে দেখা যায় যে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আগে ভারত কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। ভারতীয় এ্যাথলেটরা যে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের উপযোগী, একথা প্রথম বলেন বোম্বায়ের গভর্ণর সার জর্জ্জ ডয়েড। স্যার

ডোরাব জি. টাটার চেষ্টাতেই ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারত প্রথম এণ্টোয়ার্প অলিম্পিকে যোগদান করে।

৪ জন এ্যাথলেটকে এণ্টোয়ার্প অলিম্পিকে পাঠান হয়। এ্যাথলেটরা কে কোন্ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তার তালিকা নীচে দেওয়া হল :—

৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়—পি. সি. ব্যানার্জ্জী ; ম্যারাথন দৌড়—চোগল ও দাতার ; অন্যান্য দৌড়ের জন্য—কাইকাদী।

ভারতীয় এ্যাথলেটরা এই অলিম্পিকে বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাতে সমর্থ হন না। চোগল ম্যারাথন দৌড়ে সম্পূর্ণ পথ অতিক্রম করেন।

## ( ১৯২৪ )

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ৯ জন এ্যাথলেটকে প্যারিস অলিম্পিকে পাঠান হয়। নীচে দেওয়া তালিকা অনুযায়ী এ্যাথলেটরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন :—

২০০ মিটার দৌড়—জে. এস. হল, টি. কে. পিট্ ও ডব্লিউ. আর. হিল্ড্রেথ ; ১০০ মিটার দৌড়—জে. এস. হল ও টি. কে. পিট্ ; ৪০০ মিটার দৌড়—টি. কে. পিট্ ; ১৫০০ মিটার দৌড়—ভেঙ্কটরাম স্বামী ; হাই হার্ডলস—লক্ষ্মণন ; ব্রড জাম্প—দলীপ সিং।

ভারতীয় এ্যাথলেটদের মধ্যে দলীপ সিং ব্রড জাম্পে সপ্তম স্থান লাভ করা ছাড়া অন্য কেউ কোন বিষয়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন না।

## ( ১৯২৮ )

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আমষ্টার্ডাম অলিম্পিকে যে সব ভারতীয় এ্যাথলেটরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাঁরা হলেন :—

১১০ মিটার হার্ডলস—আব্দুল হামিদ ; লং জাম্প—দলীপ সিং ; ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়—আর. এল. বার্ণস ; ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়—জে. এস. হল ; ৮০০ ও ১৫০০ মিটার দৌড়—মার্ফি ; ৫,০০০ ও ১০,০০০ মিটার দৌড়—গুরুবচন সিং ; ম্যারাথন দৌড়—ডি. ভি. চ্যাভান।

ভারতীয় এ্যাথলেটদের মধ্যে একমাত্র জে. এস. হল ৪০০ মিটার দৌড়ে সেমিফাইন্যাল পর্য্যন্ত পৌঁছান।

## ( ১৯৩২ )

ভারতের ৩ জন এ্যাথলেট লস-এঞ্জেলস্ অলিম্পিকে পর পৃষ্ঠায় লিখিত বিভাগগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন :—

১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়—আর. এ. ভারনিয়ক্স ; ১০০ মিটার দৌড় ও ১১০ মিটার হার্ডলস—এম. স্যাটন ; হপ্ ষ্টেপ এ্যাণ্ড জাম্প—মেহেরচাঁদ।

( ১৯৩৬ )

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিন অলিম্পিকেও ৩ জন ভারতীয় এ্যাথলেট যোগদান করেন, কিন্তু কেউই কোন বিষয়ে সাফল্য লাভ করতে পারেন না। এ্যাথলেটরা ছিলেন :—

ম্যারাথন দৌড়—সি. এস. এ. স্বামী ; ৫,০০০ ও ১০,০০০ মিটার দৌড়—রাওনাক সিং ; হপ্ ষ্টেপ এ্যাণ্ড জাম্প—নিরঞ্জন সিং।

( ১৯৪৮ )

দীর্ঘ দিনের ব্যবধানের পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ১০ জন এ্যাথলেটের একটি শক্তিশালী দল লণ্ডন অলিম্পিকের জন্যে পাঠান হয়। ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন :—

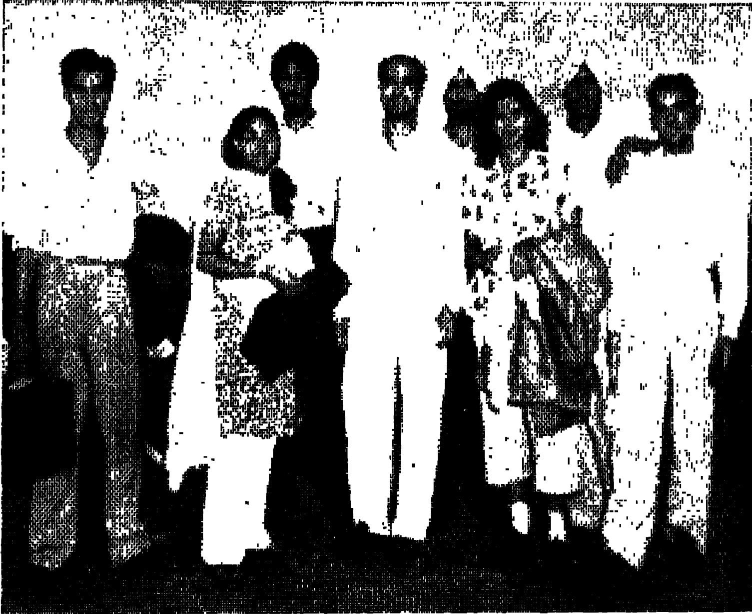
হ্যামার থ্রো, ডিসকাস থ্রো এবং সট্‌পাট—সোমনাথ ( অধিনায়ক—পাতিয়ালা ) ; ১০০ মিটার দৌড়—ই. ফিলিপস্ ( মাদ্রাজ ) ; ম্যারাথন দৌড়—ছোটা সিং ( পাতিয়ালা ) ; ষ্টিপিল চেজ—নাজির সিং ( পাতিয়ালা ) ; ১১০ মিটার হার্ডলস—জে. ভিকার্স ( বোম্বাই ) ; হপ্ ষ্টেপ এ্যাণ্ড জাম্প—এইচ. রেবেলো ( মহীশূর ) ; হাই জাম্প—গুরুনাম সিং ( পাতিয়ালা ) ; পোল ভল্ট—মুসারফ হোসেন ( ইউ. পি. ) ; ব্রড জাম্প ও ডেকাথেলন—বলদেও সিং ( বোম্বাই ) ; ১০,০০০ মিটার ভ্রমণ—সুবোধ সিংহ ( বাঙ্গলা )।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের অলিম্পিকে ভারতীয় এ্যাথলেটরা কোন বিষয়ে বিজয়ী হতে না পারলেও সকলেই সুনাম অর্জ্জন করেন। হাই জাম্পে গুরুনাম সিং ফাইন্যালে পৌঁছান, হার্ডলস-এ ভিকার্স্ সেমিফাইন্যালে পরাজিত হন এবং হপ্ ষ্টেপ এ্যাণ্ড জাম্পে রেবেলো ফাইন্যালে নিশ্চিত বিজয়ী হবেন বলে যখন সকলে আশা করছিলেন, সেই শেষ লাফের সময়ে তাঁর পায়ের শিরা ছিঁড়ে যাওয়ায় ভারত দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বর্ণপদক লাভ থেকে বঞ্চিত হয়।

( ১৯৫২ )

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকেও ভারতীয় এ্যাথলেটের দল পাঠান হয়। এই অলিম্পিকে প্রথম দুইজন ভারতীয় মহিলা এ্যাথলেট যোগদান

করেন। কে কোন্ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তার তালিকা নীচে দেওয়া হল :—



১৯৫২ খৃষ্টাব্দের অলিম্পিকে যোগদানকারী ভারতীয় এ্যাথলেট দল

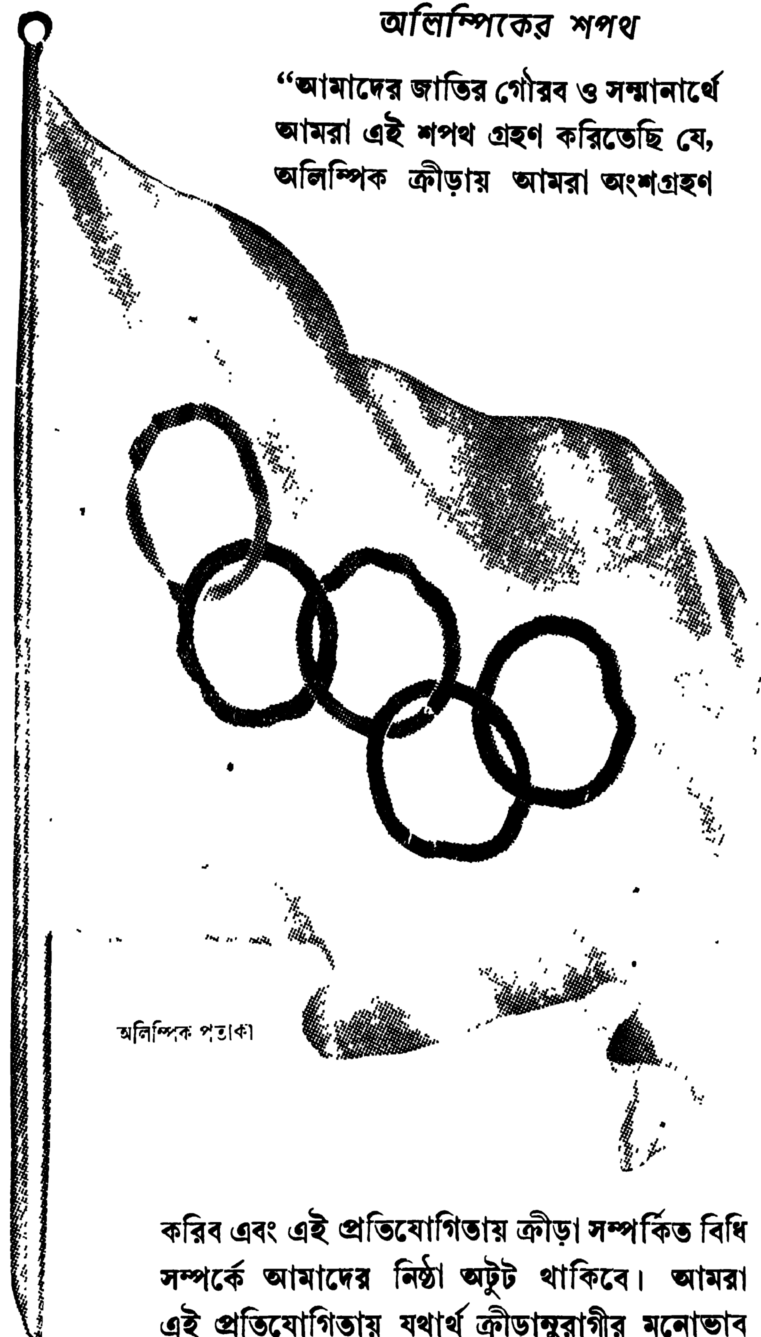
৮০ মিটার হার্ডলস (মহিলা)—নীলিমা ঘোষ; ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় (মহিলা)—মেরী ডি. সুজা; ম্যারাথন দৌড়—সুরথ সিং; ৮০০ মিটার দৌড়—সোহন সিং; ৩,০০০ মিটার ষ্টিপিল চেজ দৌড়—গুলজারা সিং; হাই জাম্প—মেহেঙ্গা সিং; ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়—লেভি পিণ্টো।

ভারতের লেভি পিণ্টো ছাড়া কোন এ্যাথলেটই কোন বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে সমর্থ হন না।

---

## অলিম্পিকের শপথ

"আমাদের জাতির গৌরব ও সম্মানার্থে আমরা এই শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, অলিম্পিক ক্রীড়ায় আমরা অংশগ্রহণ



অলিম্পিক পতাকা

করিব এবং এই প্রতিযোগিতায় ক্রীড়া সম্পর্কিত বিধি সম্পর্কে আমাদের নিষ্ঠা অটুট থাকিবে। আমরা এই প্রতিযোগিতায় যথার্থ ক্রীড়ানুরাগীর মনোভাব বজায় রাখিতে অভিলাষী।"

## অলিম্পিকের আদর্শ

**"অলিম্পিক ক্রীড়ায় জয়লাভ নহে, অংশ গ্রহণই বড় কথা।**

**জীবনের বড় কথা বিজয় লাভ নহে—সংগ্রাম।**

**প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা লক্ষ্য নহে, সততার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই লক্ষ্য।"**

**—ব্যারণ কুবার্ত্তিন**



প্রাচীন অলিম্পিকে বিজয়ীর পুরস্কার



আধুনিক অলিম্পিকে বিজয়ীর স্বর্ণপদক



আধুনিক অলিম্পিকে বিজয়ীর স্বর্ণপদক

## ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এসোসিয়েশন

১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্যার ডোরাব জে. টাটার উৎসাহ এবং চেষ্টাতেই ভারতের প্রতিনিধিরা প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। এই সময়ে ভারতে কোন জাতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন না থাকায় স্যার ডোরাব নিজের

চেষ্টাতে বোম্বাই, পুনা এবং কলকাতার বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এন্টোয়ার্প অলিম্পিকে ভারতীয় দল পাঠাতে সমর্থ হন।



স্যার ডোরাব জে. টাটা

১৯২০ খৃষ্টাব্দে এন্টোয়ার্প অলিম্পিক শেষ হবার পর আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সমিতির সভাপতি ব্যারণ পিয়ারি ডি. কুবার্ত্তিন অলিম্পিকের আদর্শ যাতে আরও বহুদেশে ও বহুজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, সে জন্যে চেষ্টা করতে থাকেন। বিভিন্ন দেশ যাতে জাতীয় ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তন করে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় পাঠাতে পারে, সেই জন্যে কুবার্ত্তিন বিভিন্ন দেশের ফিজিক্যাল ডাইরেক্টারদের আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করেন এবং অলিম্পিক কমিটির এক সভা আহ্বান করেন। অলিম্পিক কমিটির এই সভায় ভারত, বর্মা ও সিংহলের প্রতিনিধিত্ব করেন ডাঃ এ. জি. নোরেন।

ডাঃ নোরেন ভারতে ফিরে এসে অলিম্পিক কমিটির ব্যবস্থা কার্য্যকরী করার জন্যে লক্ষ্ণৌতে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের ফিজিক্যাল ডাইরেক্টারদের এক সভা

আহ্বান করেন। এর পর ডাঃ নোরেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সফর করে ওয়াই. এম. সি. এ.-র সাহায্যে বিভিন্ন প্রদেশে অলিম্পিক এসোসিয়েশন গঠন করতে সমর্থ হন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ঐ সব বিভিন্ন অলিম্পিক এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের মিলিত সভায় ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন গঠিত হয়। স্যার ডোরাব জে. টাটা সভাপতি, ডাঃ নোরেন সম্পাদক এবং পুনার ডেকান জিমখানার সম্পাদক ভগবত সহকারী সম্পাদক হিসাবে নির্ব্বাচিত হন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালনায় প্রথম অলিম্পিক গেমস্ অনুষ্ঠিত হয়।

## *বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন*

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকাল ৫-৩০ মিনিটে গভর্ণমেণ্ট হাউসে (বর্ত্তমান রাজভবনে) বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের জন্ম হয়। বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন এ্যাথলেটিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা পি. সি. মিত্রের সভাপতিত্বে গভর্ণমেণ্ট হাউসে মিলিত হয়ে বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার উন্নতির জন্যে এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিস অলিম্পিকে ভারতীয় দল নির্ব্বাচনের জন্যে দিল্লীতে যে অলিম্পিক গেমস্ অনুষ্ঠিত হবে, সেই অনুষ্ঠানে বাঙ্গলাদেশের এ্যাথলেটদের নির্ব্বাচন করবার উদ্দেশ্যে 'বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন' গঠন করবার প্রস্তাব এই সভাতেই গৃহীত হয়।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ২৫শে সেপ্টেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংস-এ পরবর্ত্তী সাধারণ সভায় বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের প্রয়োজনীয় আইন পাস করা হয়। প্রথম বছরের বিভিন্ন কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে নির্ব্বাচিত হন :—

সভাপতি—বর্দ্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব। সম্পাদক—ডি. এন. বসু, এইচ. জি. বিল এবং এইচ. ডব্লিউ. বি. মরেনো। কোষাধ্যক্ষ—ই. জি. ডিক্সন ও জি. জি. ফ্রিক।

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালনায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা কোন্ খৃষ্টাব্দ থেকে সুরু হয়, তার তালিকা নীচে দেওয়া হল :—

প্রাদেশিক এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা—১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী থেকে ১৬ই জানুয়ারী।

প্রাদেশিক সন্তরণ প্রতিযোগিতা—১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে, কলেজ স্কোয়ারে।

প্রাদেশিক কুস্তি প্রতিযোগিতা—১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারী, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে।

প্রাদেশিক সাইক্লিং প্রতিযোগিতা—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে।

প্রাদেশিক কবাডি প্রতিযোগিতা—১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে।

## *এশিয়ান গেমস*

খেলধুলার মাধ্যমে এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক দৃঢ়তর করবার জন্যে এশিয়ান গেমসের সৃষ্টি।

১৯৩৪ সালে দিল্লীতে 'ওয়েষ্টার্ণ এশিয়াটিক গেমস' সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবার পর জি. ডি. সোন্ধী এশিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে এই জাতীয় একটা প্রতিযোগিতা করবার কথা ভাবতে থাকেন। কিন্তু ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এ পথে বেশীদূর এগুতে পারেন না। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে দিল্লীতে 'এশিয়ান রিলেশান কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হবার আগে সোন্ধী ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি পাতিয়ালার মহারাজা যাদবেন্দ্র সিংজীকে এক চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে এশিয়ান রিলেশান কনফারেন্সে আগত বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 'এশিয়ান গেমস ফেডারেশন' গঠন করবার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রতিনিধিদের কাছে বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করবার দায়িত্ব সোন্ধী গ্রহণ করতে চান।

পাতিয়ালার মহারাজা আনন্দের সঙ্গেই সোন্ধীর প্রস্তাব গ্রহণ করায় সোন্ধী বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এশিয়ান গেমস ফেডারেশন গঠন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন। ফলে অধিকাংশ প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাব আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন এবং কোন কোন প্রতিনিধি এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুও এই প্রস্তাব আনন্দের সঙ্গে সমর্থন করেন এবং এই প্রতিযোগিতার নাম এশিয়াটিক গেমসের পরিবর্তে 'এশিয়ান গেমস' করবার জন্যে অনুরোধ করেন।

ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কাছে প্রস্তাবিত এশিয়ান গেমস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করবার প্রয়োজনীয় অনুমতি চাওয়া হয় এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে লক্ষ্ণৌ-এ অনুষ্ঠিত ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সাধারণ বার্ষিক সভায় প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া হলেও ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন এ বিষয়ে অন্য কোন চেষ্টাই করেন না।

ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের তরফ থেকে কোন উৎসাহ বা চেষ্টা না দেখতে পেয়ে সোন্ধী তাঁর এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানের প্রস্তাব সংশোধন ও সংক্ষিপ্ত করে একমাত্র 'এশিয়ান এ্যাথলেটিক (ট্রাক ও ফিল্ড) চ্যাম্পিয়ানশিপ' অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করেন। কারণ একমাত্র ট্রাক ও ফিল্ডে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করবার জন্যে 'এমেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া'র প্রয়োজনীয় অনুমতি লাভই যথেষ্ট ছিল। এমেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত সভায় সোন্ধীর প্রস্তাব শুধু সমর্থন করেন না, সভা ফেডারেশনের সভাপতি হিসাবে সোন্ধীকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করেন।

কোন বৃহৎ কাজ সুরু করবার আগে কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা প্রথম প্রয়োজন মনে করে সোন্ধী প্রথম এশিয়ান এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানশিপের কার্য্যকরী সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য পাতিয়ালার মহারাজাকে প্রথম অনুরোধ করেন। পাতিয়ালার মহারাজা এ বিষয়ে সম্মতি দেওয়ার পর ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের কাছে কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি হিসাবে পাতিয়ালার মহারাজা ও চেয়ারম্যান হিসাবে সোন্ধীর স্বাক্ষরযুক্ত নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠান হয়।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের লণ্ডন অলিম্পিকের ঠিক আগেই এই জাতীয় চেষ্টা করায় বিভিন্ন দেশ থেকে তেমন উৎসাহ পাওয়া যায় না। কারণ এই সময়ে সকল দেশই লণ্ডন অলিম্পিকের জন্য বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকে। যাই হোক সোন্ধী এতে নিরুৎসাহ না হয়ে লণ্ডনে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে পুনরায় অগ্রসর হতে পারবেন বলে আশা করেন।

১৯৪৮ সালে লণ্ডনে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময়ে ৮ই আগষ্ট মাউণ্ট রয়্যাল হোটেলে সোন্ধী কোরিয়া, চীন, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, বার্ম্মা, সিংহল, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাণ, ইরাক, লেবানন ও সিরিয়ার প্রধান ম্যানেজারদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সভায় সোন্ধীর নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুটি আলোচিত হয়—

(১) ১৯৪৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে প্রথম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠান।

(২) এশিয়ান গেমস ফেডারেশন গঠন।

এশিয়ান গেমস ফেডারেশন গঠন করবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং এশিয়ান এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় আইন তৈরী করবার জন্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সাবকমিটি গঠন করা হয়—

১। জি. হো. ( চীন ), ২। কে. সি. সিন ( কোরিয়া ), ৩। সি. সি. বার্টলোম অথবা জি. বি. ভার্গাস ( ফিলিপাইনস ) এবং ৪। জি. ডি. সোন্ধী ( ভারত )। এই সাবকমিটি ১১ই আগষ্ট লণ্ডনের মাউন্ট রয়্যাল হোটেলে জর্জ বি. ভার্গাসের ঘরে মিলিত হয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেন—

(১) এশিয়ান-এমেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন ( পরে এই নাম দিল্লীর সভায় এশিয়ান গেমস ফেডারেশন ) এই নামকরণ করা হয়।

(২) ১৯৫০ সাল থেকে সুরু করে প্রতি চার বছর অন্তর এই এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ অনুষ্ঠিত হবে এবং সকল বিভাগের প্রতিযোগিতাগুলিই আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হবে বলে স্থির হয়।

(৩) ট্রাক ও ফিল্ড এ্যাথলেটিকস, সাঁতার, টেনিস ( ডাবলস ও সিঙ্গিলস ), বেসবল, হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল, এসোসিয়েশন ফুটবল, বক্সিং, কুস্তি ও ওয়েট লিফটিং বা ভারোত্তোলন এই প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হবে বলে সভা স্থির করেন।

ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৯ সালের ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতেই এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের বিভিন্ন আইন-কানুন গৃহীত হয় এবং নিম্নলিখিত প্রতি-যোগিতাগুলি একমাত্র অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়।

এ্যাথলেটিকস ( ট্রাক ও ফিল্ড ), সাঁতার, ডাইভিং ও চিত্রাঙ্কন—এই প্রতিযোগিতাগুলি ছাড়াও যদি কোন ৪টি দেশ কোন প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তন করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে সেই প্রতিযোগিতাও অন্তর্ভুক্ত হবে বলে স্থির করা হয়। বিভিন্ন কর্ম্মকর্ত্তাও এই সভাতে নির্ব্বাচিত করা হয়—

সভাপতি—পাতিয়ালার মহারাজা যাদবেন্দ্র সিং ( ভারত )

সহ সভাপতি—জর্জ বি. ভার্গাস ( ফিলিপাইনস )

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—জি. ডি. সোন্ধী ( ভারত )

আফগানিস্তান, বার্ম্মা, সিংহল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, ফিলিপাইনস এবং থাইল্যাণ্ডের ৩ জন করে প্রতিনিধি, সিঙ্গাপুরের ২ জন প্রতিনিধি এবং ইরাণের ১ জন প্রতিনিধি কাউন্সিলের সভ্য হিসাবে মনোনীত করা হয়।

১৯৫১ সালের ৪ঠা থেকে ১১ই মার্চ্চ দিল্লীতে প্রথম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়। এশিয়ার ১৩টি দেশ—আফগানিস্তান, বার্ম্মা, সিংহল, ভারত, ইরাণ, ইন্দোনেশিয়া, ইসরাইল, জাপান, নেপাল, ফিলিপাইনস, সিরিয়া ও থাইল্যাণ্ড প্রথম এশিয়ান গেমস প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

১৯৫৪ সালে ১লা থেকে ৯ই মে ফিলিপাইনস এর অন্তর্গত ম্যানিলায় দ্বিতীয় এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়।

আফগানিস্তান, বার্ম্মা, কম্বোডিয়া, সিংহল, জাতীয়তাবাদী চীন, হংকং, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইসরাইল, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়, উত্তর বোর্ণিও, পাকিস্তান, ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড ও ভিয়েৎনামের ১,০৩১ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

———

## ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

| প্রতি-যোগিতার নাম | ১৮৯৬ | ১৯০০ | ১৯০৪ | ১৯০৮ | ১৯১২ | ১৯২০ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০০ মিটার দৌড় | টি. ই. বার্ক (ইউ. এস. এ.) ১২ সেঃ | এফ. ডব্লিউ. জার্ভিস (ইউ. এস. এ.) ১০⅘ সেঃ | এ. হান (ইউ. এস. এ.) ১১ সেঃ | আর. ই. ওয়াকার (সাউথ আফ্রিকা) ১০'৮ সেঃ | আর. সি. ক্রেগ (ইউ. এস. এ.) ১০'৮ সেঃ | সি. ডব্লিউ. প্যাডক (ইউ. এস. এ.) ১০'৮ সেঃ |
| ২০০ মিটার দৌড় | ... | জে. ডব্লিউ. আর. টিউকেসবেরী (ইউ. এস. এ.) ২২'২ সেঃ | এ. হান (ইউ. এস. এ.) ২১'৬ সেঃ | আর. কার (ক্যানাডা) ২২'৬ সেঃ | আর. সি. ক্রেগ (ইউ. এস. এ.) ২১'৭ সেঃ | এ. উডরিং (ইউ. এস. এ.) ২২ সেঃ |
| ৪০০ মিটার দৌড় | টি. ই. বার্ক (ইউ. এস. এ.) ৫৪'২ সেঃ | এম. ডব্লিউ. লং (ইউ. এস. এ.) ৪৯'৪ সেঃ | এইচ. এল. হিলম্যান (ইউ. এস. এ.) ৪৯'২ সেঃ | ডব্লিউ. হলসওয়েল (গ্রেট বৃটেন) ৫০'০ সেঃ | সি. ডি. রিডপাথ (ইউ. এস. এ.) ৪৮'২ সেঃ | বি. জি. ডি. রাড (সাউথ আফ্রিকা) ৪৯'৬ সেঃ |
| ৮০০ মিটার দৌড় | ই. এইচ. ফ্লাক (অষ্ট্রেলিয়া) ২ মিঃ ১১'০ সেঃ | এ. ই. টিসো (গ্রেট বৃটেন) ২ মিঃ ১'২ সেঃ | জে. ডি. লাইটবডি (ইউ. এস. এ.) ১ মিঃ ৫৬ সেঃ | এম. ডব্লিউ. সেফার্ড (ইউ. এস. এ.) ১ মিঃ ৫২'৮ সেঃ | জে. ই. মার্ডিথ (ইউ. এস. এ.) ১মিঃ ৫১'৯ সেঃ | এ. জি. হিল্ (গ্রেট বৃটেন) ১ মিঃ ৫৩'৪ সেঃ |
| ১,৫০০ মিটার দৌড় | ই. এইচ. ফ্লাক (অষ্ট্রেলিয়া) ৪ মিঃ ৩৩'২ সেঃ | সি. বেনেট (গ্রেট বৃটেন) ৪ মিঃ ৬ সেঃ | জে. ডি. লাইটবডি (ইউ. এস. এ.) ৪ মিঃ ৫'৪ সেঃ | এম. ডব্লিউ. সেফার্ড (ইউ. এস. এ.) ৪ মিঃ ৩'৪ সেঃ | এ. এন. এস. জ্যাকসন (গ্রেট বৃটেন) ৩মিঃ ৫৬'৮ সেঃ | এ. জি. হিল্ (গ্রেট বৃটেন) ৪ মিঃ ১'২ সেঃ |
| ৫,০০০ মিটার দৌড় | ... | ... | ... | ... | এইচ. কোলেম্যানন (ফিনল্যাণ্ড) ১৪ মিঃ ৩৬'৬ সেঃ | জে. গুইলিমট (ফ্রান্স) ১৪ মিঃ ৫৫'৬ সেঃ |
| ১০,০০০ মিটার দৌড় | ... | ... | ... | ... | এইচ. কোলেম্যানন (ফিনল্যাণ্ড) ৩১মিঃ ২০'৮ সেঃ | প্যাভো নুর্মী (ফিনল্যাণ্ড) ৩১ মিঃ ৪৫'৮ সেঃ |
| ম্যারাথন দৌড় | (২৪ মাইল) এস. লুইস (গ্রীস) ২ ঘঃ ৫৫ মিঃ ২০ সেঃ | (২৫ মাইল) এম. থিয়াটো (ফ্রান্স) ২ ঘঃ ৫৯ মিঃ ৪৫ সেঃ | (২৪ মাইল) টি. জে. হিকস্ (ইউ. এস. এ.) ৩ ঘঃ ২৮ মিঃ ৫৩ সেঃ | (২৬ মাইল) জে. জে. হেস (ইউ. এস. এ.) ২ ঘঃ ৫৫ মিঃ ১৮'৪ সে. | (২৪ মাইল) কে. কে. ম্যাকআর্থার (সাউথ আফ্রিকা) ২ঘঃ ৩৬ মিঃ ৫৪'৮ সেঃ | (২৬ মাইল) এইচ. কোলেম্যানন (ফিনল্যাণ্ড) ২ ঘঃ ৩২ মিঃ ৩৫'৮ সেঃ |
| ৪ × ১০০ মিটার রিলে | ... | ... | ... | ... | গ্রেট বৃটেন ৪২'৪ সেঃ | ইউ. এস. এ. ৪২'২ সেঃ |
| ৪ × ৪০০ মিটার রিলে | ... | ... | ... | ... | ইউ. এস. এ. ৩ মিঃ ১৬'৬ সেঃ | গ্রেট বৃটেন ৩ মিঃ ২২'২ সেঃ |

# অলিম্পিকে ট্র্যাক ও ফিল্ডে বিজয়ীদের তালিকা

| ১৯২৪ | ১৯২৮ | ১৯৩২ | ১৯৩৬ | ১৯৪৮ | ১৯৫২ |
|---|---|---|---|---|---|
| এইচ. এম.<br>এব্রাহাম<br>(গ্রেট বৃটেন)<br>১০'৬ সেঃ | পি. উইলিয়ামস্<br>(ক্যানাডা)<br>১০'৮ সেঃ | এ্যাডি টোলান<br>(ইউ. এস. এ.)<br>১০'৩ সেঃ | জ্যাসি ওয়েন্স<br>(ইউ. এস. এ.)<br>১০'৩ সেঃ | হ্যারিসন ডিলার্ড<br>(ইউ. এস. এ.)<br>১০'৩ সেঃ | এল. রেমিনগো<br>(ইউ. এস. এ.)<br>১০'৪ সেঃ |
| জে. ভি. স্কলজ্<br>(ইউ. এস. এ.)<br>২১'৬ সেঃ | পি. উইলিয়ামস্<br>(ক্যানাডা)<br>২১'৮ সেঃ | এ্যাডি টোলান<br>(ইউ. এস. এ.)<br>২১'২ সেঃ | জ্যাসি ওয়েন্স<br>(ইউ. এস. এ.)<br>২০'৭ সেঃ | এম. ই. প্যাটন<br>(ইউ. এস. এ.)<br>২১'১ সেঃ | এ. ষ্ট্যানফিল্ড<br>(ইউ. এস. এ.)<br>২০'৭ সেঃ |
| ই. এইচ. লিডেল<br>(গ্রেট বৃটেন)<br>৪৭'৬ সেঃ | আর. বারবুটি<br>(ইউ. এস. এ.)<br>৪৭'৮ সেঃ | ডব্লিউ. এ. কার<br>(ইউ. এস. এ.)<br>৪৬'২ সেঃ | এ. এফ.<br>উইলিয়ামস্<br>(ইউ. এস. এ.)<br>৪৬'৫ সেঃ | আর্থার উইণ্ট<br>(জ্যামাইকা)<br>৪৬'২ সেঃ | জি. রোডেন<br>(জ্যামাইকা)<br>৪৫'৯ সেঃ |
| ডি. জি. এ. লো<br>(গ্রেট বৃটেন)<br>১ মিঃ ৫২'৪ সেঃ | ডি. জি. এ. লো.<br>(গ্রেট বৃটেন)<br>১ মিঃ ৫১'৮ সেঃ | টি. হ্যাম্পসন<br>(গ্রেট বৃটেন)<br>১ মিঃ ৪৯'৮ সেঃ | জে. উডরাফ<br>(ইউ. এস. এ.)<br>১ মিঃ ৫২'৯ সেঃ | এম. জি. হুইটফিল্ড<br>(ইউ. এস. এ.)<br>১ মিঃ ৪৯'২ সেঃ | এম. জি. হুইটফিল্ড<br>(ইউ. এস. এ.)<br>১ মিঃ ৪৯'২ সেঃ |
| প্যাভো নুর্মী<br>(ফিনল্যাণ্ড)<br>৩ মিঃ ৫৩'৬ সেঃ | এইচ. ই. লার্ভা<br>(ফিনল্যাণ্ড)<br>৩ মিঃ ৫৩'২ সেঃ | এল. বিকালি<br>(ইটালী)<br>৩ মিঃ ৫১'২ সেঃ | জে. ই. লাভলক<br>(নিউজিল্যাণ্ড)<br>৩ মিঃ ৪৭'৮ সেঃ | এইচ. এরিকসন<br>(সুইডেন)<br>৩ মিঃ ৪৯'৮ সেঃ | জে. বার্টডেল<br>(লুক্সেমবার্গ)<br>৩ মিঃ ৪৫'২ সেঃ |
| প্যাভো নুর্মী<br>(ফিনল্যাণ্ড)<br>১৪ মিঃ ৩১'২সেঃ | ভি. রিটোলা<br>(ফিনল্যাণ্ড)<br>১৪ মিঃ ৩৮ সেঃ | এল. এ. লেথিনেন<br>(ফিনল্যাণ্ড)<br>১৪ মিঃ ৩০ সেঃ | জি. হকার্ট<br>(ফিনল্যাণ্ড)<br>১৪ মিঃ ২২'২ সেঃ | জি. রিফ্<br>(বেলজিয়াম)<br>১৪ মিঃ ১৭'৬ সেঃ | এ্যমিল জ্যাটোপেক<br>(চেকোশ্লোভাকিয়া)<br>১৪ মিঃ ৬'৬ সেঃ |
| ভি. রিটোলা<br>(ফিনল্যাণ্ড)<br>৩০ মিঃ ২৩'২সেঃ | প্যাভো নুর্মী<br>(ফিনল্যাণ্ড)<br>৩০ মিঃ ১৮'৮ সেঃ | জে. কুসোসিনিস্কি<br>(পোল্যাণ্ড)<br>৩০ মিঃ ১১'৪ সেঃ | আই. সলোমন<br>(ফিনল্যাণ্ড)<br>৩০ মিঃ ১৫ সেঃ | এ্যমিল জ্যাটোপেক<br>(চেকোশ্লোভাকিয়া)<br>২৯ মিঃ ৫৯'৬ সেঃ | এ্যমিল জ্যাটোপেক<br>(চেকোশ্লোভাকিয়া)<br>২৯ মিঃ ১৭ সেঃ |
| (২৬ মাইল)<br>এ. ষ্টেনরস<br>(ফিনল্যাণ্ড)<br>২ ঘঃ ৪১ মিঃ<br>২২'৬ সেঃ | (২৬ মাইল)<br>ই. এল. কোয়াফী<br>(ফ্রান্স)<br>২ ঘঃ ৩২ মিঃ<br>৫৭ সেঃ | (২৬ মাইল)<br>জে. সি. জ্যাবালা<br>(আর্জেন্টিনা)<br>২ ঘঃ ৩১ মিঃ<br>৩৬ সেঃ | (২৬ মাইল)<br>কে. সন<br>(জাপান)<br>২ ঘঃ ২৯ মিঃ<br>১৯'২ সেঃ | (২৬ মাইল)<br>ডি. ক্যাবরেরা<br>(আর্জেন্টিনা)<br>২ ঘঃ ৩৪ মিঃ<br>৫১'৬ সেঃ | (২৬ মাইল)<br>এ্যমিল জ্যাটোপেক<br>(চেকোশ্লোভাকিয়া)<br>২ ঘঃ ২৩ মিঃ ৩'২ সেঃ |
| ইউ. এস. এ.<br>৪১ সেঃ | ইউ. এস. এ.<br>৪১ সেঃ | ইউ. এস. এ.<br>৪০ সেঃ | ইউ. এস. এ.<br>৩৯'৮ সেঃ | ইউ. এস. এ.<br>৪০'৩ সেঃ | ইউ. এস. এ.<br>৪০'১ সেঃ |
| ইউ. এস. এ.<br>৩ মিঃ ১৬ সেঃ | ইউ. এস. এ.<br>৩ মিঃ ১৪'২ সেঃ | ইউ. এস. এ.<br>৩ মিঃ ৮'২ সেঃ | গ্রেট বৃটেন<br>৩ মিঃ ৯ সেঃ | ইউ. এস. এ.<br>৩ মিঃ ১০'৪ সেঃ | জ্যামাইকা<br>৩ মিঃ ৩'৯ সেঃ |

## ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

| প্রতি-যোগিতার নাম | ১৮৯৬ | ১৯০০ | ১৯০৪ | ১৯০৮ | ১৯১২ | ১৯২০ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১০ মিটার হার্ডলস | টি. পি. কার্টিস (ইউ. এস. এ.) ১৭·$\frac{৩}{৫}$ সেঃ | এ. সি. ক্রাঞ্জলীন (ইউ. এস. এ.) ১৫·৪ সেঃ | এফ. ডব্লিউ. স্কিউল (ইউ. এস. এ.) ১৬ সেঃ | এফ. সি. স্মিথসন (ইউ. এস. এ.) ১৫ সেঃ | এফ. ডব্লিউ. কেলী (ইউ. এস. এ.) ১৫·১ সেঃ | ই. জে. থমসন (ক্যানাডা) ১৪·৮ সেঃ |
| ৪০০ মিটার হার্ডলস | ... | জে. ডব্লিউ. বি. টিউকেসবেরী (ইউ. এস. এ.) ৫৭·৬ সেঃ | এইচ. এল. হিলম্যান (ইউ. এস. এ.) ৫৩ সেঃ | সি. জে. বেকন (ইউ. এস. এ.) ৫৫ সেঃ | ... | এফ. এফ. লুমিস (ইউ. এস. এ.) ৫৪ সেঃ |
| হাই জাম্প | ই. এইচ. ক্লার্ক (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ৫ ফিঃ ১১$\frac{১}{৪}$ ইঃ | আই. কে. বক্সটার (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ৬ ফিঃ ২$\frac{৪}{৫}$ ইঃ | এস. এস. জোন্স (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ৫ ফিঃ ১১ ইঃ | এইচ. এফ. পোর্টার (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ৬ফিঃ ৩ইঃ | এ. ডব্লিউ. রিচার্ড (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ৬ ফিঃ ৪ ইঃ | আর. ডব্লিউ. ল্যাণ্ডন (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ৬ ফিঃ ৪$\frac{১}{৫}$ ইঃ |
| লং জাম্প | ই. এইচ. ক্লার্ক (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ২০ ফিঃ ৯$\frac{৩}{৪}$ ইঃ | এ. সি. ক্রাঞ্জলীন (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ২৩ ফিঃ ৬$\frac{৩}{১০}$ ইঃ | এম. প্রিন্সটিন (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ২৪ ফিঃ ১ ইঃ | এফ. সি. আয়রনস (ইউ. এস. এ.) দূবত্ব ২৪ ফিঃ ৬$\frac{১}{২}$ ইঃ | এ. এল. গুটারসন (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ২৪ ফিঃ ১১$\frac{১}{৪}$ ইঃ | ডব্লিউ. পিটারসন (সুইডেন) দূরত্ব ২৩ ফিঃ ৫$\frac{১}{২}$ ইঃ |
| হপ, ষ্টেপ এ্যাণ্ড জাম্প | জে. বি. কনোলী (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ৪৫ ফিঃ | এম. প্রিন্সটিন (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ৪৭ ফিঃ ৪$\frac{১}{৪}$ ইঃ | এম. প্রিন্সটিন (ইউ. এস. এ.) দূবত্ব ৪৭ ফিঃ ২ ইঃ | টি. জে. আর্ন (গ্রেট বৃটেন) দুবত্ব ৪৮ ফিঃ ১১$\frac{১}{৪}$ ইঃ | জি. লিণ্ডব্লম (সুইডেন) দূরত্ব ৪৮ ফিঃ ৫$\frac{১}{৪}$ ইঃ | ভি. টুলস (ফিনল্যাণ্ড) দূরত্ব ৪৭ ফিঃ ৭$\frac{১}{৮}$ ইঃ |
| পোল ভল্ট | ডব্লিউ. ডব্লিউ. হয়েট (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ১০ ফিঃ ৯$\frac{৩}{৪}$ ইঃ | আই.কে. বাক্সটার (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ১০ ফিঃ ৯$\frac{৯}{১০}$ ইঃ | সি. ই. ডিভোরাক (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ১১ ফিঃ ৬ ইঃ | ই. টি. কুক এবং এ. সি. গিলবার্ট (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ১২ ফিঃ ২ ইঃ | এইচ. এস. ব্যাবকক (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ১২ ফিঃ ১১$\frac{১}{২}$ ইঃ | এফ. কে. ফস্ (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ১৩ ফিঃ ৫ ইঃ |
| পুটিং দি ওয়েট বা সট পাট | আর. এস. গ্যারেট (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ৩৬ ফিঃ ২ ইঃ | আর. শীল্ডন (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ৪৬ ফিঃ ৩$\frac{১}{৮}$ ইঃ | আর. ডব্লিউ. রস্ (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ৪৮ ফিঃ ৭ ইঃ | আব. ডব্লিউ. রোজ (ইউ. এস. এ.) দুবত্ব ৪৬ ফিঃ ৭$\frac{১}{২}$ ইঃ | পি. জে. ম্যাকডোনাল্ড (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ৫০ ফিঃ ৩০·৯ ইঃ | ভি. পোরোলা (ফিনল্যাণ্ড) দূরত্ব ৪৮ ফিঃ ৭$\frac{১}{৮}$ ইঃ |
| ডিসকাস ছোঁড়া | আর. এস. গ্যারেট (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ৯৫ ফিঃ $\frac{১}{২}$ ইঃ | আর. বয়ার (হাঙ্গেরী) দূরত্ব ১১৮ ফিঃ ২$\frac{৯}{১০}$ ইঃ | এম. জে. স্যারিডন (ইউ. এস. এ.) দূবত্ব ১২৮ ফিঃ ১০$\frac{১}{২}$ ইঃ | এম. জে. স্যারিডন (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ১২৪ ফিঃ ৮ ইঃ | এ. আর. টাইপেল (ফিনল্যাণ্ড) দূরত্ব ১৪৮ ফিঃ ৩·৯ ইঃ | ই. নিকল্যাণ্ডার (ফিনল্যাণ্ড) দূরত্ব ১৪৬ ফি. ৭$\frac{৩}{১০}$ ইঃ |
| হাতুড়ি ছোঁড়া | ... | জে.জে. ফ্লানগ্যান (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ১৬৭ ফিঃ ৪ ইঃ | জে. জে. ফ্লানগ্যান (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ১৬৮ ফিঃ ১ ইঃ | জে.জে. ফ্লানগ্যান (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ১৭০ ফিঃ ৪$\frac{১}{৪}$ ইঃ | এম. জে. ম্যাকগ্রাথ (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ১৭৯ ফিঃ ৭·৩ ইঃ | পি. জে. রেয়ন (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ১৭৩ ফিঃ ৫$\frac{৫}{৮}$ ইঃ |

পূর্ব্বে আরও কতকগুলি প্রতিযোগিতা ছিল, সেগুলি বর্ত্তমানের অলিম্পিক প্রতিযোগিতা থেকে বাদ হয়ে

# অলিম্পিকে ট্র্যাক ও ফিল্ডে বিজয়ীদের তালিকা

| ১৯২৪ | ১৯২৮ | ১৯৩২ | ১৯৩৬ | ১৯৪৮ | ১৯৫২ |
|---|---|---|---|---|---|
| ডি. কিনসে (ইউ. এস. এ.) ১৫ সেঃ | এস. জে. এম. এ্যাটকিনসন (সাউথ আফ্রিকা) ১৪.৮ সেঃ | জি. জে. সেলিঙ্গ (ইউ. এস. এ.) ১৪.৬ সেঃ | এফ. জি. টাউন্স্ (ইউ. এস. এ.) ১৪.২ সেঃ | ডব্লিউ. এফ. পোর্টার (ইউ. এস. এ.) ১৩.৯ সেঃ | হ্যারিসন ডিলার্ড (ইউ. এস. এ.) ১৩.৭ সেঃ |
| এফ. এম. টেলর (ইউ. এস. এ.) ৫২.৬ সেঃ | লর্ড বার্গলে (গ্রেট বৃটেন) ৫৩.৪ সেঃ | আর. এম. এন. টিসডল (আয়ার্ল্যাণ্ড) ৫১.৮ সেঃ | জি. এফ. হার্ডিন (ইউ. এস. এ.) ৫২.৪ সেঃ | আর. বি. কচ্‌র‍্যান (ইউ. এস. এ.) ৫১.১ সেঃ | সি. এইচ. মুর (ইউ. এস. এ.) ৫০.৮ সেঃ |
| এইচ. এম. ওসবর্ন (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ৬ ফিঃ ৬ ইঃ | আর. ডব্লিউ. কিং (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ৬ ফিঃ ৪ ৩/৮ ইঃ | ডি. ম্যাকনার্টন (ক্যানাডা) উচ্চতা ৬ ফিঃ ৫ ৫/৮ ইঃ | সি. সি. জনসন (ইউ, এস. এ.) উচ্চতা ৬ ফিঃ ৭ ১৫/১৬ ইঃ | জে. এ. উইন্টার (অষ্ট্রেলিয়া) উচ্চতা ৬ ফিঃ ৬ ইঃ | ডব্লিউ. ডেভিস (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ৬ ফিঃ ৮ ৩/৪ ইঃ |
| ডি. এইচ. হাবার্ড (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ২৪ ফিঃ ৫ ১/৮ ইঃ | ই. বি. হ্যাম (ইউ. এস. এ.) দূবত্ব ২৫ ফিঃ ৪ ৩/৪ ইঃ | ই. এল. গর্ডন (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ২৫ ফিঃ ৩/৪ ইঃ | জ্যাসি ওয়েন্স (ইউ. এস. এ.) দূবত্ব ২৬ ফিঃ ৫ ৫/১৬ ইঃ | ডব্লিউ. এস. ষ্টিল (ইউ. এস. এ.) দূবত্ব ২৫ ফিঃ ৮ ইঃ | জে. সি. বিফ্‌ল (ইউ. এস. এ.) দূবত্ব ২৪ ফিঃ ১০ ১/৮ ইঃ |
| এ. ডব্লিউ. উইণ্টার (অষ্ট্রেলিয়া) দূরত্ব ৫০ ফিঃ ১১ ১/৮ ইঃ | এম. ওডা (জাপান) দূরত্ব ৪৯ ফিঃ ১০ ১৩/১৬ ইঃ | সি. নাম্বু (জাপান) দূবত্ব ৫১ফিঃ ৭ইঃ | এন. তাজিমা (জাপান) দূরত্ব ৫২ফিঃ ৫ ১/৮ ইঃ | এ. আহমন্ (সুইডেন) দূবত্ব ৫০ ফিঃ ৬ ১/৪ ইঃ | এ. এফ. ডি সিল্‌ভা (ব্রেজিল) দূবত্ব ৫৩ ফিঃ ২ ১/২ ইঃ |
| এল. এস. বারুলেস (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ১২ ফিঃ ১১ ১/২ ইঃ | এস. ডব্লিউ. কার (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ১৩ ফিঃ ৯ ৩/৮ ইঃ | ডব্লিউ. ডব্লিউ. মিলার (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ১৪ ফিঃ ১ ৭/৮ ইঃ | ই. মেডোস (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ১৪ ফিঃ ৩ ১/৪ ইঃ | ও. জি. স্মিথ (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ১৪ ফিঃ ১ ১/৪ ইঃ | আর রিচার্ডস (ইউ. এস. এ.) উচ্চতা ১৪ ফিঃ ১১ ১/৮ ইঃ |
| এল. সি. হাউসার (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ৪৯ ফিঃ ২ ৩/৮ ইঃ | জে. এইচ. কার্ক (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ৫২ ফিঃ ৩/৪ ইঃ | এল. সেক্সটন (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ৫২ ফিঃ ৬ ৩/১৬ ইঃ | এইচ. উইল্কি (জার্ম্মানী) দূবত্ব ৫৩ ফিঃ ১ ৩/৪ ইঃ | ডব্লিউ. থম্পসন (ইউ. এস. এ.) দূবত্ব ৫৬ ফিঃ ২ ইঃ | পি. ওব্রিয়েন (ইউ. এস. এ.) দূবত্ব ৫৭ ফিঃ ১ ৩/৮ ইঃ |
| এল. সি. হাউসার (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ১৫১ ফিঃ ৫ ১/৮ ইঃ | এল. সি. হাউসার (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ১৫৫ ফিঃ ২ ৩/৪ ইঃ | জে. এফ. এ্যাণ্ডারসন (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ১৬২ ফিঃ ৪ ৭/৮ ইঃ | কে. কারপেণ্টার (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ১৬৫ ফিঃ ৭ ৩/৮ ইঃ | এ. কনসোলিনি (ইটালী) দূরত্ব ১৭৩ ফিঃ ২ ইঃ | এস. ইনেস (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ১৮০ ফিঃ ৬ ১/২ ইঃ |
| এফ. ডি. টোটেল (ইউ. এস. এ.) দূরত্ব ১৭৪ ফিঃ ১০ ১/৮ ইঃ | পি. ওকালাগ্যান (আয়ার্ল্যাণ্ড) দূরত্ব ১৬৮ ফিঃ ৭ ১/২ ইঃ | পি. ওকালাগ্যান (আয়ার্ল্যাণ্ড) দূরত্ব ১৭৬ ফিঃ ১১ ১/৮ ইঃ | কে. হেন (জার্ম্মানী) দূবত্ব ১৮৫ ফিঃ ৪ ৩/১৬ ইঃ | আই. নিমিথ (হাঙ্গেরী) দূরত্ব ১৮৩ ফিঃ ১১ ১/২ ইঃ | জে. ইসারস্যাক (হাঙ্গেরী) দূরত্ব ১৯৭ ফিঃ ১১ ৫/৮ ইঃ |

যাওয়ায় সেই প্রতিযোগিতাগুলির রেকর্ড এখানে দেওয়া হলো না।

## ট্রাক ও ফিল্ডে ভারতের জাতীয় রেকর্ড, এশিয়ান রেকর্ড, অলিম্পিক রেকর্ড এবং বিশ্ব রেকর্ডের তুলনামূলক তালিকা

| প্রতিযোগিতার নাম | জাতীয় রেকর্ড | এশিয়ান রেকর্ড | অলিম্পিক রেকর্ড | বিশ্ব রেকর্ড |
|---|---|---|---|---|
| ১০০ মিটার দৌড় | এল. পিন্টো ( বোম্বাই )<br>সময়—১০'৬ সেঃ | এ. খালেক ( পাকিস্তান )<br>সময়—১০'৬ সেঃ | জে. সি. ওয়েন্স ( ইউ. এস. এ. )<br>সময়—১০'২ সেঃ | জে. সি. ওয়েন্স ( ইউ. এস. এ. )<br>হ্যারল্ড ডেভিস ( ইউ. এস. এ. )<br>এল. লা বিচ ( পানামা )<br>এন. এইচ. ইয়েল ( ইউ. এস. এ. )<br>ই. ম্যাকবেলী ( ইউ. কে. )<br>সময়—১০'২ সেঃ |
| ২০০ মিটার দৌড় | এল. পিন্টো ( বোম্বাই )<br>সময়—২১'৭ সেঃ | শরিফ বাট ( পাকিস্তান )<br>সময়—২১'৬ সেঃ | জে. সি. ওয়েন্স ও এ. ষ্টানফিল্ড ( ইউ. এস. এ. )<br>সময়—২০'৭ সেঃ | এম. ই. প্যাটন ( ইউ. এস. এ. )<br>সময়—২০'২ সেঃ |
| ৪০০ মিটার দৌড় | যোগিন্দর সিং ( সার্ভিসেস )<br>সময়—৪৮ সেঃ | এ. কাউজি ( জাপান )<br>সময়—৪৮'৫ সেঃ | এল. জি. রোডেন ( জ্যামাইকা )<br>সময়—৪৫'৯ সেঃ | এল. জি. রোডেন ( জ্যামাইকা )<br>সময়—৪৫'৮ সেঃ |
| ৮০০ মিটার দৌড় | সোহন সিং ( সার্ভিসেস )<br>সময়—১ মিঃ ৫২'৫ সেঃ | এম. যে. টাকা ( জাপান )<br>সময়—১ মিঃ ৫৪'৫ সেঃ | এম. হুইটফিল্ড ( ইউ. এস. এ. )<br>সময়—১ মিঃ ৪৯'২ সেঃ | আর. হার্ব্বিগ ( জার্ম্মানী )<br>সময়—১ মিঃ ৪৬'৬ সেঃ |
| ১,৫০০ মিটার দৌড় | মাখন সিং ( সার্ভিসেস )<br>সময়—৩ মিঃ ৫৮'২ সেঃ | চো উন চিল ( কোরিয়া )<br>সময়—৩ মিঃ ৫৬'২ সেঃ | আর. ম্যাকমিলান ( আমেরিকা ) ;<br>টি. বার্থেল ( লুক্সেমবার্গ )<br>সময়—৩ মিঃ ৪৫'২ সেঃ | জে. ল্যাণ্ডি ( অষ্ট্রেলিয়া )<br>সময়—৩ মিঃ ৪১'৮ সেঃ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৩,০০০ মিটার ষ্টিপিল্ চেজ | মুনিস্বামী ( সার্ভিসেস )<br>সময়—৯ মিঃ ৩০'৪ সেঃ | তাকাসি সুসুমু ( জাপান )<br>সময়—৯ মিঃ ১৫ সেঃ | এইচ. এ্যাসেনফেল্টার ( ইউ. এস. এ. )<br>সময়—৮ মিঃ ৪৫'৪ সেঃ | ও. রিনটিনপা ( ফিনল্যাণ্ড )<br>সময়—৮ মিঃ ৪৪'৪ সেঃ |
| ৫,০০০ মিটার দৌড় | রোনাক সিং ( পেপসু )<br>সময়—১৫ মিঃ ৩০'৪ সেঃ | ইলো ও সামু ( জাপান )<br>সময়—১৫ মিঃ ০'২ সেঃ | এ্যমিল জ্যাটোপেক (চেকোশ্লোভাকিয়া)<br>সময়—১৪ মিঃ ০'২ সেঃ | এ্যমিল জ্যাটোপেক (চেকোশ্লোভাকিয়া)<br>সময়—১৩ মিঃ ৫৭'২ সেঃ |
| ১০,০০০ মিটার দৌড় | বুটা সিং ( সার্ভিসেস )<br>সময়—৩১ মিঃ ১৮'২ সেঃ | চোই চ্যা শিথ ( কোরিয়া )<br>সময়—৩৩ মিঃ ০'৬ সেঃ | এ্যমিল জ্যাটোপেক<br>( চেকোশ্লোভাকিয়া )<br>সময়—২৯ মিঃ ১৭ সেঃ | এ্যমিল জ্যাটোপেক<br>( চেকোশ্লোভাকিয়া )<br>সময়—২৮ মিঃ ৫৪'২ সেঃ |
| ১১০ মিটার হার্ডলস | শ্রীচাঁদ সিং ( সার্ভিসেস )<br>সময়—১৪'৯ সেঃ | সারওয়ান সিং ( ভারত )<br>সময়—১৪'৭ সেঃ | হ্যারিসন ডিলার্ড ( ইউ. এস. এ. )<br>জে. ডেভিস ( " )<br>সময়—১৩'৭ সেঃ | আর. এইচ. এট্‌লসি ( ইউ. এস. এ. )<br>সময়—১৩'৫ সেঃ |
| ৪০০ মিটার হার্ডলস | জগদেব সিং ( পাঞ্জাব )<br>সময়—৫৩'৬ সেঃ | মির্জ্জা খাঁ ( পাকিস্তান )<br>সময়—৫৪'১ সেঃ | সি. এইচ. মুর ( ইউ. এস. এ. )<br>সময়—৫০'৮ সেঃ. | জে. লিটুয়েভ ( রাশিয়া )<br>সময়—৫০'৪ সেঃ |
| ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ | রাঘবীর সিং ( সার্ভিসেস )<br>সময়—৫ ঘঃ ৩ মিঃ ৪৭'২ সেঃ | বক্তার সিং ( ভারত )<br>সময়—৫ ঘঃ ৪৪ মিঃ ৭'৪ সেঃ | জি. দর্দনি ( ইটালী )<br>সময়—৪ ঘঃ ২৮ মিঃ ৭'৮ সেঃ | এ. রোকা ( হাঙ্গেরী )<br>সময়—৪ ঘঃ ২৬ মিঃ ১৮'২ সেঃ |
| ১০,০০০ মিটার ভ্রমণ | নায়েক হরনাক সিং ( সার্ভিসেস )<br>সময়—৫০ মিঃ ২৬'৬ সেঃ | মহাবীর প্রসাদ ( ভারত )<br>সময়—৫২ মিঃ ৩১'৪ সেঃ | জে. এফ. মিকেলসন ( সুইডেন )<br>সময়—৪৫ মিঃ ২'৮ সেঃ | ভি. হার্ডমো ( সুইডেন )<br>সময়—৪২ মিঃ ৩৯'৬ সেঃ |
| ৪ × ১০০ মিটার রিলে | পাঞ্জাব ও সার্ভিসেস<br>সময়—৪৩ সেঃ | জাপান<br>সময়—৪১'২ সেঃ | ইউ. এস. এ.<br>সময়—৩৯'৮ সেঃ | ইউ. এস. এ.<br>সময়—৩৯'৮ সেঃ |
| ৪ × ৪০০ মিটার রিলে | ( সার্ভিসেস )<br>সময়—৩ মিঃ ২২ সেঃ | জাপান<br>সময়—৩ মিঃ ১৭'৪ সেঃ | জ্যামাইকা<br>সময়—৩ মিঃ ৩'৯ সেঃ | জ্যামাইকা<br>সময়—৩ মিঃ ৩'৯ সেঃ |
| ম্যারাথন দৌড় | ছোটা সিং ( পাতিয়ালা )<br>সময়—২ ঘঃ ৩৩ মিঃ ২১'৪ সেঃ | ছোটা সিং ( ভারত )<br>সময়—২ ঘঃ ৪২ মিঃ ৫৮'৬ সেঃ | এ্যমিল জ্যাটোপেক (চেকোশ্লোভাকিয়া)<br>সময়—২ ঘঃ ২৩ মিঃ ৩'২ সেঃ | জে. এইচ. পিটার্স ( গ্রেট বৃটেন )<br>সময়—২ ঘঃ ১৮ মিঃ ৩৪'৮ সেঃ |

# মহিলাদের বিভাগ

| প্রতিযোগিতার নাম | জাতীয় রেকর্ড | এশিয়ান রেকর্ড | অলিম্পিক রেকর্ড | বিশ্ব রেকর্ড |
|---|---|---|---|---|
| ১০০ মিটার দৌড় | এম. ডি' সুজা ( বোম্বাই )<br>সময়—১২'৩ সেঃ | এ. নাম্বু ( জাপান )<br>সময়—১২'৫ সেঃ | মার্জ্জারি জ্যাকসন ( অষ্ট্রেলিয়া )<br>সময়—১১'৫ সেঃ | মার্জ্জারি জ্যাকসন ( অষ্ট্রেলিয়া )<br>সময়—১১'৪ সেঃ |
| ২০০ মিটার দৌড় | এম. ডি' সুজা ( বোম্বাই )<br>সময়—২৬'১ সেঃ | ওকামোটো কিকিমো ( জাপান )<br>টি. মিডোরী ( „ )<br>সময়—২৬ সেঃ | মার্জ্জারি জ্যাকসন ( অষ্ট্রেলিয়া )<br>সময়—২৩'৪ সেঃ | মার্জ্জারি জ্যাকসন ( অষ্ট্রেলিয়া )<br>সময়—২৩'৪ সেঃ |
| ৮০ মিটার হার্ডলস | ভায়োলেট পিটার্স ( বোম্বাই )<br>সময়—১২'১ সেঃ | ইয়ামটো মিচিকা ( জাপান )<br>সময়—১১'৭ সেঃ | এস. বি. ডি' লা হান্টি ( অষ্ট্রেলিয়া )<br>সময়—১০'৯ সেঃ | এস. বি. ডি' লা হান্টি ( অষ্ট্রেলিয়া )<br>সময়—১০'৯ সেঃ |
| ৪ × ১০০ মিটার রিলে | বোম্বাই<br>সময়—৫২'২ সেঃ | ভারত<br>সময়—৪৯'৫ সেঃ | আমেরিকা<br>সময়—৪৫'৯ সেঃ | রাশিয়া<br>সময়—৪৫'৬ সেঃ |
| হাই জাম্প | ইউ. লায়নস ( পাঞ্জাব )<br>উচ্চতা—৪ ফিঃ ১১$\frac{৩}{৪}$ ইঃ | এম. ক্রাউচ আহুভা<br>( ইসরাইল )<br>উচ্চতা—৫ ফিঃ ১ ইঃ | জে. টেলার ( গ্রেট বৃটেন ) ও<br>এ. কোচম্যান ( ইউ. এস. এ. )<br>উচ্চতা—৫ ফিঃ ৬$\frac{১}{২}$ ইঃ | এ. সুদিনা<br>( রাশিয়া )<br>উচ্চতা—৫ ফিঃ ৮ ইঃ |
| লং জাম্প | সি. ব্রাউন ( বোম্বাই )<br>দুরত্ব—১৭ ফিঃ ৫ ইঃ | সুগিমুরা কিয়কো ( জাপান )<br>দূবত্ব—১৯ ফিঃ ৫ ইঃ | ওয়াই. উইলিয়ামস্ ( নিউজিল্যাণ্ড )<br>দুরত্ব—২০ ফিঃ ৫$\frac{৩}{৪}$ ইঃ | ওয়াই. উইলিয়ামস ( নিউজিল্যাণ্ড )<br>দুরত্ব—২০ ফিঃ ৭$\frac{১}{২}$ ইঃ |
| সট্ পাট | এম. ডি. ইয়েটস ( ইউ. পি. )<br>দুরত্ব—৩১ ফিঃ ১০$\frac{১}{২}$ ইঃ | জোসিনো টোয়োকো ( জাপান )<br>দুরত্ব—৪০ ফিঃ ৪$\frac{১}{২}$ ইঃ | আই. জিবিনা ( রাশিয়া )<br>দুবত্ব—৫০ ফিঃ ১$\frac{১}{২}$ ইঃ | আই. জিবিনা ( রাশিয়া )<br>দুবত্ব—৫৩ ফিঃ ১$\frac{৩}{৪}$ ইঃ |
| ডিসকাস ছোঁড়া | এম. গিলবার্ট ( বোম্বাই )<br>দুরত্ব—৯২ ফিঃ ১০$\frac{৩}{৪}$ ইঃ | জোসিনো টোয়াকো ( জাপান )<br>দুরত্ব—১৪০ ফিঃ ৭$\frac{১}{২}$ ইঃ | এন. রোমাসকোভা ( রাশিয়া )<br>দুবত্ব—১৬৮ ফিঃ ৮$\frac{৩}{৪}$ ইঃ | এন. ডাম্বেজ ( রাশিয়া )<br>দুরত্ব—১৮৭ ফিঃ ১$\frac{১}{২}$ ইঃ |
| বর্শা ছোঁড়া | ই. জে. ডেভেনপোর্ট ( বিহার )<br>দুরত্ব—১১৩ ফিঃ | কুরিহারা আকিকো<br>( জাপান )<br>দুরত্ব—১৪৪ ফিঃ ৬$\frac{১}{২}$ ইঃ | ডি. জেটোপেকোভা<br>( চেকোশ্লোভাকিয়া )<br>দুরত্ব—১৬৫ ফিঃ ৭ ইঃ | এন. কোনজিভা<br>( আমেরিকা )<br>দুরত্ব—১৮২ ফিঃ |

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রেকর্ডগুলির তালিকা উপরে দেওয়া হলো।

## ট্রাক ও ফিল্ডে ভারতের জাতীয় রেকর্ড, এশিয়ান রেকর্ড, অলিম্পিক রেকর্ড এবং বিশ্ব রেকর্ডের তুলনামূলক তালিকা

| প্রতিযোগিতার নাম | জাতীয় রেকর্ড | এশিয়ান রেকর্ড | অলিম্পিক রেকর্ড | বিশ্ব রেকর্ড |
|---|---|---|---|---|
| হাই জাম্প | দয়াল সিং ( সার্ভিসেস )<br>উচ্চতা—৬ ফিঃ ৪ ইঃ | অজিত সিং ( ভারত )<br>উচ্চতা—৬ ফিঃ ৪$\frac{৩}{৪}$ ইঃ | ডব্লিউ. ডেভিস ( ইউ. এস. এ. )<br>উচ্চতা—৬ ফিঃ ৮$\frac{৩}{৮}$ ইঃ | ডব্লিউ. ডেভিস ( ইউ. এস. এ. )<br>উচ্চতা—৬ ফিঃ ১১$\frac{১}{২}$ ইঃ |
| ব্রড জাম্প | ভাগ সিং ( সার্ভিসেস )<br>দূরত্ব—২৩ ফিঃ ৩$\frac{১}{৪}$ ইঃ | তাজিমা ম্যাসাজি ( জাপান )<br>দূরত্ব—২৩ ফিঃ ৫$\frac{১}{৪}$ ইঃ | জে. সি. ওয়েন্স ( ইউ. এস. এ. )<br>দূরত্ব—২৬ ফিঃ ৫$\frac{৩}{৮}$ ইঃ | জে. সি. ওয়েন্স ( ইউ. এস. এ. )<br>দূরত্ব—২৬ ফিঃ ৮$\frac{১}{৪}$ ইঃ |
| হপ, ষ্টেপ এ্যাণ্ড জাম্প | রেবেলো ( মহীশূর )<br>দূরত্ব—৫০ ফিঃ ২ ইঃ | ঘোশিও লিমিরু ( জাপান )<br>দূবত্ব—৪৯ ফিঃ ৯$\frac{১}{৪}$ ইঃ | এ. এফ. ডি. সিলভা ( ব্রেজিল )<br>দূবত্ব—৫৩ ফিঃ ২$\frac{১}{২}$ ইঃ | সিচারবেকভ ( রাশিয়া )<br>দূরত্ব— ৫৩ ফিঃ ২$\frac{৩}{৪}$ ইঃ |
| পোল ভল্ট | এস. জর্জ্জ ( সার্ভিসেস )<br>উচ্চতা—১২ ফিঃ ৩ ইঃ | সোয়াডা ভুনকিচি ( জাপান )<br>উচ্চতা—১৩ ফিঃ ৬ ইঃ | আর. রিচার্ডস ( ইউ. এস. এ. )<br>উচ্চতা—১৪ ফিঃ ১১$\frac{১}{৮}$ ইঃ | সি. ওয়ামেরডান ( ইউ. এস. এ. )<br>উচ্চতা—১৫ ফিঃ ৭$\frac{৩}{৪}$ ইঃ |
| সট্ পাট | পারদুমন সিং ( সার্ভিসেস )<br>দূরত্ব—৫৭ ফিঃ ১০$\frac{১}{৪}$ ইঃ | পারদুমন সিং ( ভারত )<br>দূরত্ব—৪৬ ফিঃ ৪$\frac{১}{২}$ ইঃ | ডব্লিউ. পি. ও'ব্রায়েন ( ইউ. এস. এ. )<br>দূরত্ব—৫৭ ফিঃ ১$\frac{৩}{৮}$ ইঃ | ডব্লিউ. পি. ও'ব্রায়েন ( ইউ. এস. এ. )<br>দূবত্ব—৫৯ ফিঃ ২$\frac{১}{৪}$ ইঃ |
| ডিসকাস ছোঁড়া | মাখন সিং ( সার্ভিসেন )<br>দূরত্ব—১৪৯ ফিঃ ৬$\frac{১}{২}$ ইঃ | পারদুমন সিং ( ভারত )<br>দূবত্ব—১৪২ ফিঃ ৩$\frac{১}{২}$ ইঃ | এস. ইনেস ( ইউ. এস. এ. )<br>দূরত্ব—১৮০ ফিঃ ৬$\frac{১}{২}$ ইঃ | এফ. ই. গর্ডন ( ইউ. এস. এ. )<br>দূরত্ব—১৯৪ ফিঃ ৬ ইঃ |
| বর্শা ছোঁড়া | পার্শা সিং ( পাতিয়ালা )<br>দূরত্ব—১৮৫ ফিঃ ৪$\frac{১}{২}$ ইঃ | মহম্মদ নাওয়াজ ( পাকিস্তান )<br>দূবত্ব—২১০ ফিঃ ১০$\frac{১}{২}$ ইঃ | সি. ইয়ং ( ইউ. এস. এ. )<br>দূরত্ব—২৪২ ফিঃ ৩ ইঃ | এফ. হেল্ড ( আমেরিকা )<br>দূবত্ব—২৬৩ ফিঃ ১০ ইঃ |
| হাতুড়ি ছোঁড়া | দেবীদয়াল ( সার্ভিসেস )<br>দূরত্ব—১৬২ ফিঃ ৫ ইঃ | কোজিমা যোশিও ( জাপান )<br>দূরত্ব—১৭৭ ফিঃ $\frac{৩}{৪}$ ইঃ | জে. আইজ্যারম্যাক ( হাঙ্গেরী )<br>দূরত্ব—১৯৭ ফিঃ ১১$\frac{৫}{৮}$ ইঃ | এম. আর. ফিনভনোসভ ( রাশিয়া )<br>দূরত্ব—২০৭ ফিঃ ৯$\frac{৩}{৪}$ ইঃ |

## ১৯২৮ খৃঃ থেকে ১৯৫২ খৃঃ পর্য্যন্ত অলিম্পিকে মহিলাদের ট্রাক ও ফিল্ডে বিজয়িনীদের তালিকা

| প্রতিযোগিতার নাম | ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ | ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ | ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ | ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ | ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০০ মিটার দৌড় | ই. রবিনসন ( ইউ. এস. এ. ) সময়—১২'২ সেঃ | এস. ওয়ালেসিউইজ ( পোল্যাণ্ড ) সময়—১১'৯ সেঃ | এইচ. এইচ. ষ্টিফেনস্ ( ইউ. এস. এ. ) সময়—১১'৫ সেঃ | ফ্যানি ব্লাঙ্কার্স কোয়েন ( নেদারল্যাণ্ড ) সময়—১১'৯ সেঃ | মার্জ্জারি জ্যাকসন ( অষ্ট্রেলিয়া ) সময়—১১'৫ সেঃ |
| ২০০ মিটার দৌড় | ... | ... | ... | ফ্যানি ব্লাঙ্কার্স কোয়েন ( নেদারল্যাণ্ড ) সময়—২৪'৪ সেঃ | মার্জ্জারি জ্যাকসন ( অষ্ট্রেলিয়া ) সময়—২৩'৭ সেঃ |
| ৪ × ১০০ মিটার রিলে | ক্যানাডা সময়—৪৮'৪ সেঃ | ইউ. এস. এ. সময়—৪৭ সেঃ | ইউ. এস. এ. সময়—৪৬'৯ সেঃ | ( নেদারল্যাণ্ড ) সময়—৪৭'৫ সেঃ | ইউ. এস. এ. সময়—৪৪'৯ সেঃ |
| ৮০ মিটার হার্ডলস | ... | এম. ডিড্রিকসন ( ইউ. এস. এ. ) সময়—১১'৭ সেঃ | টি. ভাল্লা ( ইটালী ) সময়—১১'৭ সেঃ | ফ্যানি ব্লাঙ্কার্স কোয়েন (নেদারল্যাণ্ড) ও এম. এ. জে. গার্ডনার ( গ্রেট বৃটেন ) সময়—১১'২ সেঃ | এস. ষ্ট্রিকল্যাণ্ড ( অষ্ট্রেলিয়া ) সময়—১০'৯ সেঃ |
| হাই জাম্প | ই. ক্যাথারউড ( ক্যানাডা ) উচ্চতা—৫ ফিঃ ৩ ইঃ | জে. শিলি ( ইউ. এস. এ. ) উচ্চতা—৫ ফিঃ ৫$\frac{১}{৪}$ ইঃ | আই. স্তাক ( হাঙ্গেরী ) উচ্চতা—৫ ফিঃ ৩ ইঃ | এ. কোচম্যান ( ইউ. এস. এ. ) ও ডি. জি. টেলার ( গ্রেট বৃটেন ) উচ্চতা—৫ ফিঃ ৬$\frac{১}{৮}$ ইঃ | ই. ব্রাণ্ড ( সাউথ আফ্রিকা ) উচ্চতা—৫ ফিঃ ৫$\frac{৩}{৪}$ ইঃ |
| লং জাম্প | ... | ... | ... | ভি. ও. গিরমাটি ( হাঙ্গেরী ) দুবত্ব—১৮ ফিঃ ৮$\frac{১}{৪}$ ইঃ | ওয়াই. উইলিয়ামস্ ( নিউজিল্যাণ্ড ) দূরত্ব—২০ ফিঃ ৫$\frac{৩}{৪}$ ইঃ |
| সট্ পাট | ... | ... | ... | এম. ও. এম. ওষ্টারমিয়ার ( ফ্রান্স ) দূরত্ব—৪৫ ফিঃ ১$\frac{১}{২}$ ইঃ | জি. জিবিনা ( ইউ. এস. এস. আর ) দূরত্ব—৫০ ফিঃ ১$\frac{১}{২}$ ইঃ |
| ডিসকাস ছোঁড়া | এম. কোনোপাকা ( পোল্যাণ্ড ) দূরত্ব—১২৯ ফিঃ ১১$\frac{৭}{৮}$ ইঃ | এল. কোপল্যাণ্ড ( ইউ. এস. এ. ) দূবত্ব—১৩৩ ফিঃ ২ ইঃ | জি. ম্যানারমিয়ার ( জার্ম্মানী ) দূরত্ব—১৫৬ ফিঃ ৩$\frac{৩}{১৬}$ ইঃ | এম. ও. এম. ওষ্টারমিয়ার ( ফ্রান্স ) দূরত্ব—১৩৭ ফিঃ ৬$\frac{১}{২}$ ইঃ | এন. রোমাসকোভা ( ইউ. এস. এস. আর. ) দূরত্ব—১৬৮ ফিঃ ৮$\frac{১}{২}$ ইঃ |
| বর্শা ছোঁড়া | ... | এম. ডিড্রিকসন ( ইউ. এস. এ. ) দূরত্ব—১৪৩ ফিঃ ৪ ইঃ | এইচ. এফ. ফ্লেস্কার ( জার্ম্মানী ) দূবত্ব—১৪৮ ফিঃ ২$\frac{৩}{৪}$ ইঃ | এইচ. বাউমা ( অষ্ট্রিয়া ) দূরত্ব—১৪৯ ফিঃ ৬ ইঃ | ডি. জ্যাটোপেকোভা ( চেকোশ্লোভাকিয়া ) দূরত্ব—১৬৫ ফিঃ ৭ ইঃ |

## Hindusthan Standard ( July 26, 1954 )

### A USEFUL VOLUME ON SPORTS

Sports literature in Indian languages is still very scanty. The public enthusiasm for the different games has tremendously increased in recent days but true knowledge which is at the root of all enjoyments has yet to be gained and mastered by our sincere but occasionally overzealous 'fans'.

A recently published book in Bengali under the title of "Kheladhulay Jnaner Katha" or "The treatise on knowledge in sports by Sri Khelowar" published by Indian Associated Publishing Co., Ltd. ( 93 Harrison Road, Calcutta ), is an ambitious effort to make up this deficiency in the sporting life. To cover almost all branches of modern games viz., Football, Cricket, Hockey, Badminton, Tennis, Tabletennis, Volleyball, Basketball, Swimming, Boxing, Wrestling, Cycling from their probable origin to the present development in a book of two hundred pages was by itself a difficult task and the author could not be expected to present them in minute details or in all their aspects. What really surprises one, however, is the clever brevity with which the author has marshalled his facts and figures and the homely simplicity with which he has dwelt his subjects for an average young reader. He has, indeed, rarely missed any information about all major International Tournament with special reference to India's performance and has also included in his book foreign tours by or to India. A list of the Olympic records in track and field events from 1896 to 1952 and another comparative list of the records set up in the Olympics and other world events including the Asian Games and National Championships attached at the end of the volume turn it almost as a "directory" in sports.

It is true, this relatively small book has been too much stuffed with 'facts' and a few tales and anecdotes here and there might have made it more interesting. But the author's seriousness of purpose is quite unmistakable and the publication is sure to be a forerunner of many more in future.

With an appropriate get-up representing various games with the Olympic torch and fairly illustrated the book is priced rather cheaply at Rs. 2-8.

## The Statesman ( July 1, 1954 )

### SPORTS COMPENDIUM

Amid a scarcity of sports books in Bengali the recent publication of Kheladhulay Jnaner Katha (Book of information on Sports and Games) by Khelowar fulfils a genuine demand by young folk in this age of sports-mindedness.

The book clearly outlines the history, development and the present national organisation of all major games played in India. The contents include football, cricket, hockey, tennis, boxing, wrestling, swimming, cycling, etc. Major tournaments in each department are specifically dealt with.

A separate chapter is devoted to the Olympic Games, which, in addition to other details, show a complete list of results in the major events since 1896. Indian, Bengal, Olympic and world athletic records are given in an appendix. Neatly printed and well illustrated the book has a pleasant make-up.

## Amrita Bazar Patrika (July 2, 1954)

### SPORTS BOOK IN BENGALI

Sports lovers will be happy at the publication of Kheladhulay Jnaner Katha by Sri Khelowar in Bengali. The book discusses in detail the origin and development of all major games of the world giving an inside picture of national and international organisations. Of special interest is the chapter of football. The history of the Olympics has been dealt with capably showing a complete list of the results in major events since 1896. Neatly printed and well illustrated the book removes a long-felt want of a sports book in Bengali.

## আনন্দবাজার পত্রিকা

২৮শে আষাঢ়, ১৩৬১ সাল

১১ই জুলাই, ১৯৫৪

**খেলাধুলায় জ্ঞানের কথা**—শ্রীখেলোয়াড় লিখিত 'খেলাধুলায় জ্ঞানের কথা' পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় খেলাধুলা পুস্তকের নিতান্ত অভাব। বিশেষ করিয়া বিভিন্ন খেলাধুলার জন্ম ইতিহাস এবং তাহার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। খেলাধুলায় জ্ঞানের কথায় ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস, টেবিল টেনিস, ভলিবল, বাস্কেটবল, সাঁতার, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, অলিম্পিক প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের জন্ম ইতিহাস এবং ক্রমবিকাশের কথা সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া লেখক ক্রীড়ারসিকদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠানগুলিব পরিচয়, বিশ্বের সমস্ত উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতার বিবরণ, আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের সফর এবং বৈদেশিক দলগুলির ভারত সফরের কথা সংক্ষেপে পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। এ্যাথলেটিকসের ট্রাক ও ফিল্ডের বিশ্ব রেকর্ড, এশিয়ান রেকর্ড ও ভারতীয় রেকর্ডের ক্রমোন্নতির সামগ্রিক তালিকা ( চার্ট ) পুস্তকখানির অন্যতম দ্রষ্টব্য বিষয়। এক কথায় 'খেলাধুলায় জ্ঞানের কথা' —বাঙ্গালা ভাষায় একখানি ক্রীড়াদর্পণ।

৭৪ খানি প্রয়োজনীয় ছবি সম্বলিত বাঁধাই পুস্তকের দাম করা হইয়াছে মাত্র আড়াই টাকা। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী পুস্তকখানির প্রকাশক। হস্তধৃত অলিম্পিক দীপ—বর্ত্তিকার আকর্ষণীয় ছবিটি প্রচ্ছদপটের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। ঝক্‌ঝকে সুন্দর ছাপা প্রশংসার দাবী রাখে।

## দেশ

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৬১

৩১শে জুলাই, ১৯৫৪

**খেলাধুলায় জ্ঞানের কথা**—শ্রীখেলোয়াড়, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য ২॥০।

শ্রীখেলোয়াড় এক উৎসাহী ক্রীড়া-সাংবাদিকের ছদ্মনাম। লেখক ইতিপূর্ব্বে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য 'জগৎজোড়া খেলার মেলা' লিখে প্রশংসাভাজন হয়েছেন। তাঁর নূতন রচনা 'খেলাধুলায় জ্ঞানের

কথা' বাংলা ভাষায় লিখিত এরূপ ক্রীড়াপুস্তকের বহুদিনের অভাব পূরণ করেছে। এতে সুন্দর এবং সহজ ভাষায় ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস, টেবিলটেনিস, ভলিবল, বাস্কেটবল, সাঁতার, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত খেলাধুলার জন্মকথা এবং তার ক্রমবিকাশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক এবং ভারতীয় ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচয় বিশ্বের সমস্ত প্রধান প্রতিযোগিতার পরিচালনবিধি এবং এপর্য্যন্ত যে সমস্ত বিদেশী খেলোয়াড়ের ভারতে অবির্ভাব ঘটেছে এবং ভারতের খেলোয়াড় বিদেশ ভ্রমণ করেছে তাদের তালিকাও স্থান পেয়েছে। এ্যাথলেটিকসের ট্রাক এবং ফিল্‌ড ইভেণ্টে রেকর্ডেব চার্ট পুস্তকখানিব অন্যতম আকর্ষণ। খেলাধুলাব নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও বইখানি পড়লে বিশ্বের খেলাধুলা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতে পারবেন। প্রচ্ছদপটে হস্তধৃত অলিম্পিক দীপবর্ত্তিকার ছবিটি বইখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি কবেছে। ছাপা প্রশংসাব দাবী রাখে।

## স্বাধীনতা

১২ই ভাদ্র ১৩৬১,

২৯শে আগষ্ট ১৯৫৪

**খেলাধুলায় জ্ঞানের কথা**—প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। দাম ২॥০ টাকা।

নানাবিধ খেলাধুলা এবং শারীরিক চর্চার মধ্য দিয়া মানুষের শবীর ও মানসিক উন্নতি সম্ভব। তাই আজ পৃথিবীর সকল দেশের মানুষই শিক্ষার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে খেলাধুলার প্রয়োজনীয়-তাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই কাজকে কার্য্যকরী রূপ দিবাব জন্য যেমন খেলাধুলার আইন কানুন জানা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন বিভিন্ন খেলার জন্ম ও ক্রমবিকাশের খতিয়ান জানা।

সাধারণভাবে এই দিক হইতে ক্রীড়ামোদীদের আগ্রহ মিটাইবার জন্য বাংলা ভাষায় বিশেষ কোন ভালো পুস্তক নাই বলিলেই চলে। এই দিক হইতে শ্রীখেলোয়াড তাঁহার এই পুস্তকে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস, টেবিল টেনিস, ভলিবল, বাস্কেট বল, সাঁতার, কুস্তি, সাইক্লিং ও অলিম্পিক খেলার সৃষ্টি হইতে ধীরে ধীরে কি ভাবে তার উন্নতি সাধন হইয়াছে সহজভাবে এই ইতিহাস তিনি এই পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। পুস্তকেব শেষ দিকে তিনি ১৮৯৬ সাল হইতে ১৯৫২ সাল অবধি অলিম্পিক ট্রাক ও ফিল্‌ডে বিজয়ীদের নামের তালিকা এবং ট্রাক ও ফিল্‌ডে ভারতের জাতীয় রেকর্ড, এশিয়ান রেকর্ড, অলিম্পিক রেকর্ড, এবং বিশ্ব রেকর্ডের তুলনামূলক তালিকা দিয়া পাঠকদের নিকট বইটির প্রয়োজনীয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

খেলাধুলার বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য শ্রীখেলোয়াড়ের এই বইটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের নিকট খুবই সমাদর লাভ করিবে আশা করি। আমরা এই বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

## যুগান্তর

২০শে আষাঢ়, ১৩৬১

৫ই জুলাই, ১৯৫৪

**খেলাধুলায় জ্ঞানের কথা**—শ্রীখেলোয়াড় লিখিত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। দাম দুই টাকা আট আনা

শুধু সুস্থ সবল দেহ গঠনের জন্য নয়, অবসর বিনোদনের জন্যেও খেলাধুলা মানুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ভারতে আজ ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, টেবিলটেনিস ব্যাডমিণ্টন, ভলিবল, বাস্কেটবল ইত্যাদি বিভিন্ন বিদেশী খেলা জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে। জ্ঞানপিপাসু ক্রীড়ারসিক স্বভাবতঃই ভারতে এইসব খেলাধুলার প্রবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশের কথা জানতে চান। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট বা কোন একটি বিশেষ খেলা সম্বন্ধে কিছু কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ভারতে সর্ব্বাধিক প্রচলিত খেলাধুলা সম্পর্কে প্রামাণিক ও তথ্যবহুল কোন পুস্তক বাংলা ভাষায় নাই বলিলেই চলে। লেখক এই একখানি গ্রন্থে জনপ্রিয় খেলাগুলি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া ক্রীড়ারসিকদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। লেখকের উদ্যম প্রশংসার্হ। নথিপত্রের অভাবে তথ্যসংগ্রহের জন্য লেখককে বিপুল পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বিভিন্ন বিভাগের চিত্রগুলি পুস্তকটিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। পুস্তকের শেষে এ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন রেকর্ড সন্নিবেশিত হওয়ায় রেফারেন্স বহি হিসাবে পুস্তকটি সমাদৃত হইবে। আর্টপেপারে ঝরঝরে ছাপা। বাঁধাই ভালো। ক্রীড়ারসিকদের মধ্যে পুস্তকটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

## দৈনিক বসুমতী

২০শে শ্রাবণ, ১৩৬১ সাল

৫ই আগষ্ট, ১৯৫৪

**খেলাধুলায় জ্ঞানের কথা**—শ্রীখেলোয়াড়ের উল্লিখিত সংগ্রহ-পুস্তকে বর্ত্তমানে সর্ব্বাধিক প্রচলিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ের খেলাধুলার বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। ৯৩ নং হ্যারিসন রোডের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত উপযোগী বহু চিত্র সমন্বিত এই পুস্তকের অবতরনিকাতে লেখক ভারতীয় খেলা-মহলে নির্ভরযোগ্য সূত্রের অভাবের কথা ন্যায়তঃই উল্লেখ করিয়াছেন। নামকরণ হইতে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, লেখক এই জ্ঞান সঞ্চয়নে খেলাধুলার চালু পদ্ধতি বা মানোন্নয়নোপযোগী ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন বিভাগীয় খেলাধুলার শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা, দেশ-বিদেশের কৃতি খেলোয়াড়দের এবং আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গের তাঁহার এই চয়নিক ভবিষ্যৎ অনুরাগীদের অনুসন্ধিৎসু মনে খোরাক যোগাইবার প্রামাণ্য নথি হিসাবে গণ্য হইতে পারে।